সত্য-স্রোত

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃপদম্ ।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃকৃপা ॥

শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়

দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ড্রারী এণ্ড
ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ
১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫

সত্য-স্রোত

প্রভুকান

জয় গুরু

উৎসর্গ

যাঁহার উৎসাহে শ্রীগুরুকৃপায় "সত্য-স্রোতের" এই অমূল্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলাম সেই পরমভক্ত, মহাসাধক, অভিন্ন-হৃদয় শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয় যদিচ শ্রীগুরুপদে লীন হইয়াছেন তাঁহারই স্মরণার্থে তাঁহাকে এই গ্রন্থখানি অর্পণ করিলাম। কিন্তু সেই অমর আত্মা আমাদের নিকট সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছেন। আমি জানি ও আমার বিশ্বাস তিনি সেই সুখময় "গুরুধাম" হইতে মহা আদরে, আনন্দের সহিত গ্রন্থখানি গ্রহণ করিবেন। জয় গুরু!

শ্রীশ্রীগুরুধাম
১৫নং সিমলাইপাড়া লেন,
পাইকপাড়া, কলিকাতা
দোল পূর্ণিমা
২৭শে ফাল্গুন, ১৩৫৮ সাল।

ভক্তদাসানুদাস
শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়

জয় গুরু

দানপত্র

এই "সত্য-স্রোত" স্বর্গীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়ের পুত্র পরম ভক্ত শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও যথেষ্ট সহায়তায় শ্রীগুরুকৃপায় প্রকাশিত হইল। আমি ইঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি ও সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি ও প্রার্থনা করি, যেন আমার তিরোভাবের পর ইনি উপযুক্ত পাত্র বিধায় এই "সত্য-স্রোতের" সেবা করিয়া ভক্ত ভ্রাতা ও ভগিনীদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। এই গ্রন্থখানি উক্ত শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথেরই সম্পত্তি রহিল ও ইহার সর্ব্ব ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল।

৺শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম ভাগবৎ কল্যাণীয় শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার প্রিয় পৌত্র পরমভক্ত শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ উভয়ে এই "সত্য-স্রোতের" পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখিয়া এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহাদের সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি।

এই গ্রন্থ স্বধর্ম্মের জনকে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। মূল্য লইয়া বিক্রয় হইবে না। ইহা সাধারণের জন্য নহে কারণ ইহা এই গুপ্ত ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ।

শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়

বিষয় সূচী

চিত্র সূচী

জয় গুরু

মুখবন্ধ

সেই একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মা নিরাকার ও নির্গুণ। বাক্যমনের অগোচর। তিনি যে কি বস্তু তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত। তিনি অনির্ব্বচনীয়। অনুভূতিস্বরূপ। তিনি দয়া না করিলে তাঁকে জানা যায় না। সৎগুরু কৃপা বহু ভাগ্যে লাভ হয় ও জীব সেই কৃপা লাভ করিলেই হৃদয়নাথের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হয়ে প্রেমানন্দে সদাই ভাসমান থাকে। ইহার একমাত্র উপায় শ্রীশ্রীগুরুদেবে ও শ্রীশ্রীনামব্রহ্মে ঐকান্তিক প্রেম ও আত্মনিবেদন। নির্গুণ ব্রহ্ম সময় সময় চঞ্চল হন অর্থাৎ নিজেকে বিকাশ করিবার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প হয়। ইহা যে কেন হয় তাহা মানবের ধারণার অতীত। তিনি জগৎ রচনা করিয়া সৃষ্টির উৎকর্ষ মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। এই সুন্দর সৃষ্ট-বস্তু মানবের সহিত তাঁহার সহবাস করিবার বাসনা হইল; কিন্তু তিনি নিরাকার, সুতরাং কি করিয়া সহবাস করেন? পরমাত্মা সহবাস করার জন্য "প্রেম" বলিয়া একটী বস্তু সৃষ্টি করিলেন। সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে প্রেমের স্রোত জগতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। "প্রেম" জগতে পরিভ্রমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বহির্মুখীন জীব প্রেমকে লইতে চাহে না। জীব ইন্দ্রিয়-সুখ চাহে। জীব দেহবুদ্ধিতে বিভোর হইয়া নিজের সত্ত্বা

ভুলিয়া গিয়া, বিষয়ে বদ্ধ হইয়া তাহার হৃদয়নাথকে ভুলিয়া যাওয়ায় কাহারও হৃদয়ে "প্রেম" স্থান পাইল না। কোটীতে কোন জীব শ্রীগুরুকৃপায় দেহ-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া যখন ষোল আনা চিত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করে, তখন "প্রেম" সেই হৃদয়ে সঞ্চারিত হন এবং সত্যস্বরূপ শ্রীগুরুরূপী পরমাত্মা, প্রেমের সংযোগে, সেই আত্মার সহিত রতি করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন ও উভয়ে উভয়ের হয়েন। ইহাই যুগল-মিলন, ইহাই শিব-শক্তি সম্মিলন, ইহাই আত্মারামের রমন, ইহাই কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ, ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ, ইহাকেই সঞ্চারী প্রেম কহে। পরমাত্মা শ্রীগুরুরূপে জগতে আসিয়া দয়া করিয়া এই মধুর লীলা করেন ও পরম সুখদ হইয়া জীবকে আনন্দ প্রদান করেন। জীব অন্তর্মুখীন হইয়া, আত্মহারা হইয়া পরম শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করেন এবং সদাই আনন্দসাগরে ভাসমান থাকেন। ইহাই বর্ত্তমান প্রেম, ইহাই অভিমানশূন্য গোপীপ্রেম। শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া এই "সত্য-স্রোতের" সাধন ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিবার প্রয়াশ পাইয়াছি। কিন্তু এই দুরূহ কার্য্যে কত দূর কৃতকার্য্য হইব জানিনা। শ্রীশ্রীভক্তগণ এই ভক্তদাসানুদাসের কোনরূপ অপরাধ হইলে মার্জ্জনা করিবেন। জয় গুরু!

কাঙ্গাল

শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়

"ত্রিগুণাতীতং ভাবাতীতং সৎগুরুং ত্বম নমামি।

সত্যের লক্ষণ

সত্যবাদী, সমভাব, ইন্দ্রিয় দমন।
অহঙ্কার পরিত্যাগ, ক্ষমা বিতরণ॥
সতত সকলে দয়া করয়ে যে জন।
এইসব হয় তবে সত্যের লক্ষণ॥
সত্যবাদী হ'য়ে সবে সত্যগুরু পায়।
সত্যের প্রভাবে তবে প্রেম পথে ধায়॥
গুরু ব্রহ্ম, গুরু ব্রহ্ম, সত্য ধর্ম্ম সার।
একমন হ'য়ে জপ নাম ব্রহ্ম তাঁর॥
প্রেম উদ্দীপন হ'লে আনন্দাশ্রু বহে।
পুলকে সে লোক, সদা সদানন্দে রহে॥
হাস্য, কম্প, দন্ত প্রতিঘাত আদি করে।
নানাবিধ ক্রমে প্রকাশ হয় বিস্তারে॥
চিত্তশুদ্ধি হ'লে প'রে হয় প্রেম বৃদ্ধি।
এসব লক্ষণে জানা যায় হওয়া সিদ্ধি॥
"শ্রীগুরু" সত্য জানি দৃঢ় কর চিত্ত।
নির্ম্মল হইবে মন, হইবে পবিত্র॥

প্রেমে হয়ে ভোর, **মানুষ সত্য গুরু** ভাবিবে।
পরম ঈশ্বর বলি, তাঁহারে ভজন করিবে ॥

ইন্দ্রিয় বশ হইলে, সত্য মানুষ হ'লে তবে সত্য গুরু লাভ হয়।

এই যে ধনধান্যপূর্ণ জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা প্রকৃত সত্য নহে। আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম দ্বারা প্রকৃতি বাহিরে ও অভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। স্নবর্ণময় অলঙ্কার ভিতরে বাহিরে যেরূপ স্নবর্ণ ছাড়া আর কিছুই সত্য নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম ছাড়া এই জাগতিক পদার্থেরও কোন অস্তিত্ব নাই। আত্মা ও ব্রহ্ম এক। অতএব সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করিয়া মুমুক্ষু সাধক জাগতিক সর্ব্ববিষয়ে অভিলাষ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে বা গুরুতে স্থির হইবে —ইহাই সত্য প্রতিষ্ঠা।

সত্য তত্ত্ব

জীব অপরাধী হইয়াই জগতে মায়ায় নীত হয়। সে অপরাধ হচ্ছে **ভগবৎ-বিস্মরণ।** সেই বিস্মরণ অর্থাৎ অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য আনন্দময় শ্রীগুরুরূপে জগতে দয়া করিয়া আগমন করেন ও জীবকে নামামৃত দান করেন। জীব মায়া-মুক্ত হইয়া আনন্দে ভাসমান হয় ও ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষায় উৎপীড়িত হয় না এবং সদাই শান্তি উপভোগ করে। সংসার শ্রেষ্ঠ আশ্রম। ইহাতে সংসারী ও অসংসারী উভয়ের মিলন, তবে যুক্তের হইলেই সে সংসার ধর্ম্মের ও শ্রীগুরুর ; অযুক্তের হইলেই ত্যাগের, ইহাই ভগবৎ ইচ্ছা। সন্ন্যাসে বিঘ্ন আছে কিন্তু যুক্তের সংসারে নিরপেক্ষ ধর্ম্ম ও শান্তিলাভ—ইহা গুরুর কৃপায় সহজ লভ্য। ভাব স্বভাবে পরিণত হবার নাম ধর্ম্ম। ইহা গুরুভক্তি সাপেক্ষ। এই অবস্থা লাভ হইলে বর্ত্তমান দেহ "ভাবের অঙ্গ, প্রেমের গঠন" হয়, মন গলিয়া যায়।

গুরুভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় হইলে এবং শ্রীগুরুতে ঐকান্তিক ভালবাসা ও নিষ্ঠা হইলে শিষ্য তখন গুরুময় জগৎ-সংসার দেখে। তখন বুঝিতে পারে যে, "শ্রীগুরুর জন্যই ধর্ম্ম,

শ্রীগুরুর জন্যই কর্ম্ম, শ্রীগুরুর জন্যই সংসার, শ্রীগুরুর জন্যই অসংসার (সন্ন্যাস), শ্রীগুরুর প্রয়োজনই তাহার প্রয়োজন, শ্রীগুরুর সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী, শ্রীগুরুর আনন্দে তাহার আনন্দ, শ্রীগুরুর **আজ্ঞা প্রতিপালনই** তাহার আহ্লাদ, প্রেম, ভাব, মহাভাব। অন্য ভগবানকে দেখে নাই। প্রেমময় সত্যস্বরূপ গুরুই সেই "নির্গুণ পরমাত্মা।" ইহাই মানুষভজন, ইহাই গুরুভজন। ইহাই বর্ত্তমান ধর্ম্ম, বর্ত্তমান প্রেম, **নগদ ধর্ম্ম,** পরকেলে ধর্ম্ম নহে। ইহাই বৃন্দাবনের বেদাতীত গোপীর ভজন। এই অনুভূতি গোপীদের ছিল। এটা **গুণহীন** ধর্ম্ম। **গুরু-আনুগত্য ধর্ম্ম।** ঐশ্বর্য্য নাই, কেবল মানুষভজন। যাহারা মজিয়াছে তাহারা "জীয়ন্তে মরা" অর্থাৎ দেহবুদ্ধি নাই। তাহারা সদা যুক্ত অবস্থায় থাকিয়া নির্গুণে বসতি করে। সদা গোপীভাবামৃত পান করে। গুরুরূপ সদা সর্ব্বদা চারিদিকে দর্শন করে। রসনায় সদাই নামামৃত পান করে। সংসার বা দেহধর্ম্ম অনাসক্তভাবে করিয়া যায়। তাহাদের কোনরূপ সংশয় নাই, কোনরূপ সংস্কার বা বাসনা নাই। ইন্দ্রিয়াদি—বিষয়াদি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, আত্ম-সমর্পণ করিয়া কেবল গুরুতে লীন হইয়া থাকে। **গোপিনীদের** মত না হইলে এ অবস্থা হয় না—এ অনুভূতি হয় না। দরদী হওয়া চাই। মানুষে যাহার এরূপ ভালবাসা বা প্রেম হইয়াছে সে সদাই সন্তোষ। সে লোক মান্য চাহে না, সে

অষ্টসিদ্ধি চাহে না, সে কেবল শ্রীগুরুচরণে শুদ্ধাভক্তি ও ভালবাসা চায়—সে শরণাগতি চাহে মাত্র—সে মুক্তি চাহে না —শ্রীগুরুর ইচ্ছাই তাহার ইচ্ছা। তাহার কোন প্রার্থনা নাই। সকলই তাঁহার প্রসাদ বলিয়া জানে। সে গুরু সুখে সুখী। শ্রীগুরু যাহা করান তাহাই করে, তিনি যেমন রাখেন তাহাতেই আনন্দ। সেই একমাত্র কর্ত্তা ছাড়া আর কিছুই জানে না। ইহাই আত্মনিবেদন—ইহাই আত্মসমর্পণ। সকলই মালিকের মর্জ্জি বলিয়া জানে। সে সর্ব্বদা ভাবসাগরে হাবুডুবু খায় ও আনন্দধামে বিচরণ করে। রাগানুগা ভক্ত রাগভক্তি দ্বারা এই বর্ত্তমান প্রেম আস্বাদন করে। তাহারা ভগবান জানে না, শ্রীগুরুকে ভালবাসিয়াই সুখী। শ্রীগুরুকে ছাড়িয়া মুহূর্ত্তমাত্র থাকে না। শ্রীগুরু যে বিধান করেন তাহাতেই তাহাদের আনন্দ। শ্রীগুরুর সুখে চলাফেরা করে। শ্রীগুরুর জন্য জীবন ধারণ। তাহারা সদাই সুখী—আনন্দে ভাসমান। সদাই দরদী-ভাব। গোপিনীদের ন্যায় শ্রীগুরু সুখে সুখী, আত্ম-সুখে সুখী নহে। সুখ, দুঃখ তাহারা সমভাবে প্রসাদ বলিয়া আনন্দের সহিত গ্রহণ করে। শ্রীগুরুর স্মৃতিই সুখ, বিস্মরণ দুঃখ। এই নিত্য সত্য-স্রোতের প্রবর্ত্তক মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যিনি প্রেম-অবতার রূপে, পতিতপাবন রূপে জগতে আসিয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিলেন ও জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, "জীব ভগবানের

ও ভগবানের জীব।” ভগবানে ও জীবে যে কত মধুর সম্বন্ধ, তাহা “বর্ত্তমান প্রেম” দ্বারা সাধিত হয়, ইহা জীবকে শিক্ষা দিলেন। জীব কৃতার্থ হইল। কিন্তু নিত্য পার্ষদ ছাড়া এভাব আর কেহ লইল না। মহাপ্রভু শুনিলেন যে অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়াছেন:—

“আউলকে বলিও বাউল।
হাটে না বিকায় চাউল॥”

বাউল অর্থাৎ দেহবুদ্ধিহীন সদা গুরুতে স্থিত এই অদ্বৈতাচার্য্যের হুঙ্কারে ও প্রার্থনায় শ্রীভগবান মানুষরূপে জীব তরাইতে নদীয়ায় গৌরাঙ্গ অবতার হয়েন ও প্রেম প্রচার জন্য ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা মহাভাবে থাকিতেন। যখন মহাপ্রভুর ৪৮ বৎসর বয়স তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আউলকে—অর্থাৎ আত্মহারা অবস্থায় সর্ব্বদা স্থিত—গৌরাঙ্গ প্রভুকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যে প্রেমের হাট বসাইয়া যাহা প্রচার করিতেছেন তাহা পূর্ণভাবে সকলে লইতে পারিল না অর্থাৎ হাটে আর চাউল বিকাইতেছে না। এই লীলা সংবরণ করিবার ইঙ্গিত পাইয়া মহাপ্রভু আউল থাউল হইলেন। তাহার কারণ, তিনি যে হাট বসাইলেন তাহাতে অদ্বৈত প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, স্বরূপ দামোদর, শিখিমাইতি ও তাহার ভগ্নী মাধবী, রামানন্দ প্রভৃতি নিত্য পার্ষদগণ ছাড়া আর কেহ খরিদ্দার জুটিল না। ঐ সব নিত্য সঙ্গী ছাড়া আর কেহ তাঁহাকে তেমনভাবে লইল না।

এই ভাবিতে ভাবিতে আউল থাউল হইলেন ও ভাবিলেন যে, "তবে কাহার জন্য আর থাকিব?" সকলে ব্রজের গোপীদের ন্যায় তাঁহাকে ভালবাসিল না। সকলে প্রণাম করিল, হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ভাবিল, সুখের জন্য সঙ্গ লইল কিন্তু তাঁহাকে কেহ নির্গুণভাবে চাহিল না, লইল না। তিনি সুখময়, সেই **সুখের আস্বাদেই** তাঁহাকে লইল, ভক্তি করিল, বিভোর হইল, প্রণাম করিল কিন্তু **ভালবাসিতে** পারিল না। ভালবাসিলে তাঁহাকে ব্রজের রাখালদের ন্যায় **সহজভাবে** তাঁহার সহিত আনুগত্য করিত। "**সহজভাবে**" কেহ ভালবাসিল না—ভজন করিল না। রাখালরূপে যাহা ঘটিয়াছে তাহা পণ্ডিতরূপে হইল না। তাহা হইলেই কেহ লইল না। লইল না বলিয়া প্রভু সন্ন্যাসী হইলেন, তবুও কেহ লইল না। প্রভুকে কেহ আনন্দ দিতে পারিল না, কেহ সেবা করিতে পারিল না। সে কারণ প্রভু অন্য লীলা করিবার জন্য গুপ্ত হইলেন। নিত্য মর্ম্মী পার্ষদেরা তাঁহার তিরোধান স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন:—

"অদ্যাপি নিত্য লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

প্রভু স্বজনকে বলিলেন যে, "সন্ন্যাস বেশ আর রাখিব না, কাঙ্গাল বেশ লইব। যে বেশ সংসারের তুচ্ছ, বিদ্যায় হীন, বর্ণে হীন, অর্থে হীন সেই বেশ লইব; তবে জীব আমাকে আপন করিতে

পারিবে, মান্য ভুলিতে পারিবে, হীন জ্ঞান করিতে পারিবে, ভৎ´সনা করিতে পারিবে, সমান হইতে পারিবে, হস্তজোড় করিতে ভুলিবে তবে তাহারা **সহজরূপে** ভালবাসিতে পারিবে (এ মহাভাবের কথা, গভীর ভাবসাগরের উপলব্ধি)।”

ইহার পর একদিন ভগবান শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ মন্দিরে আত্ম-গোপন করিলেন। কিছুকাল পরে ঠাকুর লোক সমক্ষে ফকির, কাঙ্গাল ও ভিখারী বেশে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া দেখা দিলেন।

এই ফকিরঠাকুর আত্ম গোপনের পর ভ্রমণ করিতে করিতে হুগলী ত্রিবেণীর ঘাটে পারে যাইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। সে উপস্থিতিতে গঙ্গার তরতর বেগ কমিল, ভাগীরথীর বিশাল কলেবর সঙ্কুচিত হইল, অমনি ঠাকুর পরপারে কুমারহট্ট গ্রামে অর্থাৎ হালিসহরে যাইবার জন্য পা দিলেন। ঘাটে নৌকার ভিতর বসিয়া ভক্ত **রামচন্দ্র পাটণী** তাহা দেখিয়াছিল। ভাগ্যবান পাটনী ইহা যোগবিভূতি মনে করিল না। সে এ বিভূতি চাহে না, সে দ্রুতপদে আসিয়া ভগবানের চরণে পড়িতে চাহে। সে ভগবানকে চাহে, সে বলিল “এতদিন তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। আজ তুমি সাম্‌নে, আমিও তোমার সাম্‌নে। আর

আমার কোন কাজ নাই। যতক্ষণ তোমায় সম্মুখে পাই নাই ততদিন আমার কাজ ছিল। আজ আমার কাজ শেষ হইল, ঠাকুর।” ফকিরঠাকুর বলিলেন, “স্পর্শ করিও না, এবারে নহে তৃতীয় জন্মে।” ভাগ্যবান পাটনী দুঃখ করিল না বা কিছু বলিল না। ঠাকুর চলিয়া গেলেন। এই পাটনী দ্বিতীয় জন্মে কালীভক্ত রামপ্রসাদ সেন ও তৃতীয় জন্মে কাঁচরাপাড়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া মহাবৈষ্ণব রামপ্রসাদ কবিরাজরূপে প্রেমসাধন করিয়া গুরুপদে লীন হন।

ফকিরঠাকুর হালিসহর হইতে কাঁচরাপাড়া অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যাহাকে সম্মুখে পাইতেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, “তুই কি আমার কিছু ধারিস্?” সকলে পাগল মনে করিত। কাঁচরাপাড়ার নিকট ঘোষপাড়া নিবাসী একজন সরল নিরীহ ব্যক্তি, নাম **“রামশরণ পাল”** একথা শুনিয়া বলিলেন; “বোধ হয় ধারি।” ফকিরঠাকুর বলিলেন, “তবে ধার শোধ দিয়া অন্যত্রে যাও।” রামশরণ সমস্ত দিন এই ভাবিতে ভাবিতে **আত্মহারা** হইলেন। ঠাকুর শেষে তাহাকে নিজের করিয়া লইলেন ও বলিলেন, “যাহা হৃদয়ে পাইয়াছ তাহা হৃদয়েই রাখিও। অন্তর করিও না, অন্তরে রাখিও।” এই রামশরণ পাল মহাশয়ের পুত্র মহাসাধক শ্রীযুত দুলালচাঁদ যিনি “লালশশী” নামে খ্যাত, তিনি এই নির্গুণ সত্য ধর্ম্ম বঙ্গে প্রচার করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ ঐশ্বর্য্য কামনা করায় ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। বৎসর বৎসর এই ঘোষপাড়ায় দোলের সময় মহামেলা হয়।

কাঁচরাপাড়ানিবাসী ৺কানাই ঘোষ মহাশয়ের বাল্যকাল হইতেই সন্ন্যাসীভাব। বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্রী গত হয়। পুত্র বিশ্বম্ভর বড়ই দুর্দ্দান্ত ও মদ্যপায়ী ছিল। তজ্জন্য সংসারে বিরক্ত হইয়া ফকিরী লইলেন। ১৫।২০ বৎসর পরে দেশে অর্থাৎ কাঁচরাপাড়ায় ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীফকিরঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের নয়নে নয়নে মিলন হইল। সে নয়ন বিনিময়ে উভয়েই উভয়কে চিনিয়া লইল। ফকির ঠাকুর একদিন বলিলেন "কানাই, সংসার করিতে হইবে, এবার সংসার রাখিয়া ধর্ম্ম। সংসার-ধর্ম্ম না রাখিলে জীব অগ্রসর হইতে পারে না ও ভগবৎ সেবা হয় না। যাহাতে জীব সহজে ভগবৎ-মুখ তাকাইতে পারে তাহাই করা চাহি। জীব ভগবৎ-মুখ না তাকাইয়া বর্ণশ্রেষ্ঠ, রূপে, গুণে, বিদ্যায়, সন্ন্যাসে, অলৌকিক ধর্ম্মে মুগ্ধ হয়; হইয়া ভাবে ভগবানকে ভালবাসিয়াছি। তাই নদীয়ায় চাউল বিকায় নাই। খরিদ্দার মিলে নাই। আর সে সন্ন্যাসবেশে ধর্ম্ম স্থাপন হইবে না।" ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "তোমার জন্যই ধর্ম্ম, তোমার জন্যই কর্ম্ম, তোমার জন্যই সংসার, তোমার জন্যই অসংসার অর্থাৎ সন্ন্যাস। তোমার প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন,

ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সুখ। তুমি যাহা বলিবে তাহাই হইবে।” ঘোষ মহাশয় আরও বলিলেন, “অন্য ভগবানকে দেখি নাই। তোমায় ছাড়া আমার ভগবান আর কে আছে? যাহারা তোমায় চিনিতে পারে নাই, ভালবাসিতে পারে নাই, তাহাদের ধর্ম্ম পরকেলে ছিল; কিন্তু আমাদের **ধর্ম্ম নগদ**—নগদ বলিয়াই আমরা এই হৃদয় মধ্যে সত্য বৃন্দাবন, সত্য মথুরা, সত্য দ্বারকা দেখি। নদীয়ায় মুক্তহস্ত হইয়া ঠকিয়াছ। এবার গুপ্তভাবে লীলা। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি জল যেখানেই থাকুক খুঁজিয়া লইবে ও জল খাইবে। তৃষ্ণা না থাকিলে জলের আদর কোথায়? হৃদয়ের জ্বালা ধরিলে তবে তোমায় লইতে শিখিবে, তোমায় ভালবাসিতে পারিবে।” ঘোষ মহাশয় শ্রীগুরু আজ্ঞায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন ও এক পুত্র হইল—তাঁহার নাম পরম সাধক শ্রীযুক্ত ৺কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়—তস্য পুত্র ৺রাজেন্দ্র ঘোষ—তস্য পুত্র ৺খগেন্দ্র ঘোষ। বর্ত্তমান বংশধর শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষ।

এইরূপে একদিন এ সংসারে “বাইশ ফকিরের” হাট বসিল অর্থাৎ ফকিরঠাকুরের ২২জন শিষ্য হইল। ইহাদের মধ্যে বিশ

জন অসংসারী এবং তুইজন মাত্র সংসারী ছিলেন। সকলেই রাগানুগা ভক্ত ও নির্গুণ সাধক ছিলেন। ইহারা বৈধী ভক্তির অধীন ছিলেন না। নির্গুণ না হইলে গুণহীন ধর্ম্ম-সাধন বা নাম-সাধন হয় না। নির্গুণ হইলে তবে নামে রুচি হয়। প্রতি **শ্বাসে শ্বাসে** নাম জপের ইচ্ছা হয়। ইহারা গুরুময় জগৎ দেখিতেন। গুরু ছাড়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতেন না। সদা গুরুরূপ নেহার করিতেন। ইহাদের এক মন ছিল। সর্ব্বদা "জয়গুরু" বলিতেন।

এই ফকিরঠাকুরকে "ভাবের মানুষ" বলিত কারণ সদাই ভাবে থাকিতেন, কেহ বা কাঙ্গালঠাকুর বলিত, কেহ বা ক্ষ্যাপাচাঁদ বলিত। তাঁহার ভাব সম্বন্ধে ও শিষ্য ২২ ফকির সম্বন্ধে তুইটী গান আছে, তাহা নিম্নে দিলাম :—

(১)

আউলে চাঁদ দোয়া গরু,
সঙ্গে বাইশ ফকির বাছুর তার।
বলবো কি লীলা চমৎকার,
মুখে **সত্য** বলে অনিবার॥

(২)

ভাবের মানুষ কোথা হ'তে এলো।
এর নাইক রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল॥
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটী মন,
জয় কর্ত্তা ব'লে, বাহু তুলি কল্লে প্রেমে ঢলাঢল।
সে মরা বাঁচায়, হারা দেওয়ায়, এর হুকুমে চলে উজান জল॥

এই বাইশজন শিষ্য আনন্দের হাট বসাইয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহারা শ্রীগুরু সহ একাঙ্গী ছিলেন। দরদীভাব। সকলের একটী মন। "এক মন হ'লে পরে তবে সে যেতে পারে গুরুচাঁদের দরবারে।" পাতঞ্জল বলেন যে "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।" ইহাদের শুদ্ধ চিত্তের কোন বৃত্তি (চাঞ্চল্য) ছিল না। সকলেই গুরুভাবাপন্ন। গুরুময় জগত-সংসার দেখিতেন ও তাঁহাদের রসনা নামরসে সদাই সিক্ত। ইহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। "শ্রীগুরু যাহা করাইতেছেন তাহাই করিতেছেন, শ্রীগুরু যাহা বলাইতেছেন তাহাই বলিতেছেন, শ্রীগুরু যাহা খাওয়াইতেছেন তাহাই খাইতেছেন, শ্রীগুরু সঙ্গে সদাই আছেন, শ্রীগুরু সঙ্গে সদাই চলাফেরা করিতেছেন, শ্রীগুরুস্মুখেই আছেন, শ্রীগুরু ছাড়া তিলার্দ্ধ নহেন।" এই ইহাঁদের ভাব। অর্থাৎ সদা গুরুতে স্থিত, ইহাকে ব্রাহ্মীস্থিত কহে। দেহাদি ইন্দ্রিয়

ও বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মে চিত্তমন সমর্পণ করিয়াছেন। ইহাই গীতার—"সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহাই শ্রীগুরুর কার্য্য ও প্রয়োজন বলিয়া জানেন। ইহাই চণ্ডীর "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।" তাঁহারা দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ অহং পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ **কর্ত্তৃত্ব** ত্যাগ করিয়া "সকলই গুরুর ইচ্ছা, সকলই কর্ত্তার ইচ্ছা বলিয়া জানেন ও এই বিশ্বাসে তাঁহাদের সর্ব্বসময়ে **সন্তোষ**।" তাঁহারা অন্য ভগবান জানেন না কারণ "নয়নে দেখিনি যারে কেমনে ভজিব তারে।" তাঁহাদের প্রেম, তাঁহাদের ভালবাসা নিষ্কাম। তাঁহারা কোন প্রতিদান চাহেন না। তিনি যেরূপ **রাখিবেন** তাঁহারা তাহাতেই সুখী। তাঁহাদের স্বভাব হচ্ছে "শ্রীগুরু বিনা কিছুই জানেন না। শ্রীগুরুকে ভালবাসাই হচ্ছে তাঁহাদের স্বভাব।" শ্রীগুরুর সুখে সুখী। শ্রীগুরু আজ্ঞা প্রতিপালনই তাঁহাদের একমাত্র সেবা। দেহ-বুদ্ধি অর্থাৎ অভিমান ত্যাগ না হ'লে সেবা হয় না—ইহাই গোপী ধর্ম্ম। ইহারা পরকাল জানেন না কারণ পরকালে কি হইবে শ্রীগুরুই জানেন। সর্ব্বসময়েই শরণাগতি। ইঁহাদের ভালবাসা সর্ব্বভূতে, কারণ **সর্ব্বভূতে শ্রীগুরুকে** দর্শন করেন একারণ সর্ব্বভূতে তাঁহাদের ভালবাসা। ইঁহারা সত্য পালন করিয়া, সত্যে বসতি করিয়া, সত্যকে লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা দেহরথে

শ্রীগুরুরূপী জগন্নাথকে দর্শন কবিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। “বথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।” শ্রীফকিরঠাকুর ও ২২ জন শিষ্য দয়া করিয়া মৃতকে জীবিত করিয়াছেন, মূককে বাচাল করিয়াছেন, পঙ্গুকে সচল করিযাছেন, ও বহু বহু পতিতকে প্রেমদান কবিয়া উদ্ধার করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও সেই প্রেমস্রোত শিষ্যানুক্রমে **গুপ্তভাবে** সঞ্চারিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ভাগ্যবান ভক্তসহ লীলা করিতেছেন। “তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি জলাশয়ের নিকট সন্ধান কবিয়া আসে কিন্তু জলাশয় কোথাও যান না।” তৃষিত ভাগ্যবান ভক্ত সন্ধান করিয়া, **গোলামী** করিয়া অর্থাৎ প্রাণের সহিত নিঃস্বার্থভাবে সেবা করিয়া ও ভালবাসিয়া মনের মানুষ চিনিয়া লয় ও আনন্দধামে বসতি কবে। সে সর্ব্বদা রসে ভাসে।

ভগবান অর্থাৎ শ্রীগুরু-দর্শনে কর্ম্মক্ষয় হইয়া যায়।

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥”

অর্থাৎ সৎগুরুরূপী ঈশ্বরকে দর্শন করিলে, হৃদয় মধ্যে অনুভূতি হইলে মানবের হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কারের বাঁধন কাটিয়া যায়, সকল সংশয় দূরে যায় অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি চলিয়া যায় এবং তাহার সমস্ত কর্ম্ম (সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান) অর্থাৎ সংস্কার ক্ষয় হইয়া যায়। তখন “আমি” থাকে না। সব “তুঁহু” হইয়া যায়।

সব "তেরা" হইয়া যায়। "তুমি বল, তুমি কর, তুমি খাও" ইত্যাদিতে পরিণত হয়। সবই "তুমিময়" প্রেম নয়নে দর্শন করে। **"To see Him, is to love Him, and to love Him to be free."** এই অবস্থা হ'লে জীব আর **ইন্দ্রিয়াদির দাস** থাকে না। তখন সে স্বাধীন—তখন সে বোধস্বরূপ, নিজের স্বরূপে অবস্থিত। শ্রীগুরুকে ভালবাসিয়াই মানুষ স্বাধীন। দুটি ভাব—**একটি তদীয়তাময়, আর একটী মদীয়তাময়।** এই ভাবই রাধাভাব। ইহার উপর আর ভাব ব্যক্ত করা যায় না। সকলই অনুভূতি—যাহার সঞ্চার হইয়াছে সেই জানে। মর্ম্মীকে মনের কথা বলা যায়। নচেৎ কইতে মানা। "না কহিবে ধর্ম্ম কথা যথা তথা, আপনারে আপনি হইবে সাবধান।" ঐহিকে রস পাবে না। "রসের মানুষ রসে ভাসে, উজান পথে করে আনাগোনা।" যে প্রেমিক সে ইহার ভাব পাবে, চেটুক পেটুক ভাব পাবে না। যাঁহারা এই সত্য ধর্ম্ম যাজন করেন তাঁহারা এইরূপ মহাভাবেই সদাই অবস্থিত। তাঁহাদের বহির্ভাগে কোনরূপ প্রকাশ পাওয়া যায় না। কারণ ইহা গুণহীন ধর্ম্ম—পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইঁহারা অহং ত্যাগ করিয়া অকর্ত্তা হইয়া নির্গুণে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহাদের সদাই সন্তোষ, সদাই গুরুভাবে পূর্ণ অন্তরে সদাই শ্বাসে শ্বাসে নাম চলিতেছে, সর্ব্বদা ভাবাবিষ্ট, সদা নয়নে গুরুরূপ **নেহার** করিতেছেন, গুরুর স্মৃতি সর্ব্ব বস্তুতে।

এই সত্য ধর্ম্মের মূল ভিত্তি **শ্রীগুরুতে** প্রগাঢ় **ভক্তি বা ভালবাসা ও বিশ্বাস।** নামে ঐকান্তিক নিষ্ঠা। ইহাতেই বস্তু মিলিবে ও মনের ময়লা যাবে। প্রেম সঞ্চার হবে। **প্রাণমন** ঐক্য করিয়া সাধন করিতে হয়।

এইরূপ সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া মহাপ্রভু (ফকিরঠাকুর) "বোয়াছে" নামক গ্রামে দেহরক্ষা করিলেন। আটজন শিষ্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা দেহ ও কান্থা পরারী গ্রামে আনিয়া সমাধি দেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের চাকদহ ষ্টেশন হইতে "পরারী গ্রামে" যাইতে হয়। ২নং উমেশ দত্ত লেন কলিকাতানিবাসী ৺শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর দাস মহাশয় তথাকার সমাধি মন্দিরটী সংস্কার করিয়াছেন। বহু লোক ৺দোলের সময় তথায় দর্শন করিতে যান। মন্দিরের সংলগ্ন একটী কূপ আছে। তাহার জল পান করিলে সর্ব্ব রোগ ভাল হয়।

যে ২২ ফকির লইয়া শ্রীশ্রীফকিরঠাকুর আনন্দের হাট বসাইয়াছিলেন, ফকিরঠাকুরের তিরোধানের পর উক্ত ২২ ফকিরের মধ্যে অসংসারী ২০ জন ফকির বঙ্গের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থানে এই নির্গুণ ধর্ম্ম গুপ্তভাবে প্রচার করিয়া বহু শিষ্য করেন। ইঁহারা ক্রমশঃ কোথায় কোথায় দেহ রাখেন বা গুপ্ত হন প্রকাশ নাই। উক্ত **বাইশ ফকিরের** নাম যথা:—

কাঁচরাপাড়ানিবাসী— (১) শ্রীযুক্ত কানাই ঘোষ।

জগদীশপুরনিবাসী— (২) বেচু ঘোষ
(৩) শিশুরাম
(৪) শঙ্কর
(৫) রামশরণ পাল
(৬) নিতাই
(৭) হরি
(৮) পাঁচকড়ি
(৯) নিধিরাম

জশড়ানিবাসী— (১০) বড় রামনাথ দাস
(১১) আন্দিরাম
(১২) নয়ান
(১৩) লক্ষ্মীকান্ত
(১৪) দেদোকৃষ্ণ
(১৫) গোদাকৃষ্ণ
(১৬) বিশু দাস
(১৭) কিনু
(১৮) কিনু গোবিন্দ
(১৯) হটু ঘোষ
(২০) মনোহর দাস

দুধকুমারনিবাসী— (২১) শ্যাম
(২২) ভীমরায়

এই ২২ জনার হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা ছিল না। সদা মিষ্ট ভাষা ছিল কারণ গুরুময় জগৎ দেখিতেন। সকলেই প্রিয় ছিল। জাগতিক সর্ব্ব কার্য্যই শ্রীগুরুর **ইচ্ছা** ও প্রসাদ বলিয়া জানিতেন। তাঁহাদের কোন কামনা ছিল না। একমাত্র শ্রীগুরুই সর্ব্ব-কামনা। শ্রীগুরুর **সংসার**—তাঁহারই এই দেহ—তিনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই বিধান করিবেন। সুতরাং একমাত্র শ্রীগুরু চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা ছিল না। যাহাই করিতেন তাহা **ব্যবহারিক ভাবে। অনাসক্ত ভাবেই** সর্ব্ব কার্য্য করিতেন। বিষয় বুদ্ধি ছিল না। **নাম**-জপ সর্ব্বদা মনে মনে ও শ্বাসে শ্বাসে হইতেছে, অন্য বিষয় ভাবিবার সময় নাই এবং আসক্তিও নাই। ইহাদের তীর্থাদি সমস্তই **মানুষ গুরু**। শ্রীগুরুই চিন্তা, ধ্যান, কর্ম্ম এবং তাঁহার জন্যই জীবনধারণ। ইঁহারা জীয়ন্তেমরা, শ্রীগুরুই **মুখ্য** বস্তু ও সাংসারিক কার্য্য ব্যবহারিক ভাবে করিতেন। সংসারে আসক্তি বহির্ভাগে দেখাইতেছেন কিন্তু মনে মনে জানেন সংসার অনিত্য—একমাত্র **নিত্য বস্তু** শ্রীগুরু ও তাঁহার নাম। সাংসারিক বিপদ আপদে বা দেহের কষ্টে তাঁহারা আকৃষ্ট হইতেন না। দেহ **কষ্ট বা রোগ** দেহেরধর্ম্ম—আত্মার

ধর্ম্ম নয়। এই সত্যধর্ম্ম যাঁহারাই যাজন করেন তাঁহারা সকলেই এই ভাব পোষণ করেন। ইঁহারা সকলেই **গুপ্ত সাধক** ছিলেন।

পুণ্যধাম কাঁচরাপাড়া নিবাসী ৺কানাই ঘোষ মহাশয় এই নির্গুণ ধর্ম্ম গুপ্তভাবে প্রচার করেন। এই গুণহীন ধর্ম্মের গ্রাহক বড়ই কম কারণ সকলেই গুণকর্ম্ম চাহে। দেহসুখ ও সংসারের উন্নতি, মঙ্গল চাহে। যাঁহারা গোপীভাবাপন্ন, যাঁহারা শ্রীভগবানকে চাহেন, শ্রীভগবানকে ভালবাসিয়াই যাঁহারা কৃতার্থ হন, যাঁহারা নিত্য সিদ্ধপুরুষ, শ্রীগুরুকে সেই সত্যস্বরূপ, প্রেমময়, দয়াময় ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করেন তাঁহারাই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এ ধর্ম্মে সকলেই গুরুভাবাপন্ন ও গুরুর সহিত অভিন্ন-হৃদয়, সেজন্য "গুরুর মধ্যে একাচার, লোকের মধ্যে লোকাচার।" ইঁহারা সাধন্‌ ভজন গুপ্তভাবে ভগবজ্জনসহ করেন। যেমন মহাপ্রভু "বহিরঙ্গ সহ করিতেন নাম সঙ্কীর্ত্তন, অন্তরঙ্গ সহ করিতেন প্রেম আস্বাদন।" শ্রীগুরুর সহিত **"নিত্য আনুগত্য"** করিতেন ও নামরসে ও রূপরসে সদা গরগর থকিতেন। শ্রীগুরুরূপ চারিদিকে এমন কি শয়নে-স্বপনে দর্শন করিতেন।

নাম নামীতে কোন তফাৎ নাই। নাম স্মরণে সঞ্চার হইয়া নানারূপ হাস্য, কম্প, ক্রন্দন, হুঙ্কার প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের উদয় হয়। ইহারা সত্যের আশ্রয় লওয়ায় "বাকসিদ্ধ"। ইহারা "শ্রীগুরুর তেজে তেজীয়ান, শ্রীগুরুর **বলে বলীয়ান**, শ্রীগুরুর মহিমায় মহীয়ান, শ্রীগুরুর গরবে গরীয়ান।" শ্রীগুরুর ইচ্ছাই ইঁহাদের ইচ্ছা এবং ইঁহাদের ইচ্ছাও শ্রীগুরুর ইচ্ছা। "আত্ম নিবেদন" না করিলে "হৃদি বৃন্দাবনে" প্রবেশ নিষেধ। ইঁহাদের হৃদয়ে বৃন্দাবন প্রভৃতি সর্ব্ব-তীর্থ বিরাজ করে। ইঁহাদের "দেহ রক্ষা" কালে শ্রীগুরু দর্শন দেন ও সঙ্গে লইয়া যান। এই নির্গুণ ভক্তরা সদাই নিবৃত্তি মার্গে বাস করেন। ইঁহাদের নিষেধ যথা,—মিথ্যা কথা বলা, পরদার গমন, মদ্যপান, মাংস এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পঞ্চ আজ্ঞা আছে যথা—ভয়, ভক্তি, সেবা, বিশ্বাস ও আনুকুল্য। এই দশ আজ্ঞা সকলে পালন করেন। ইঁহাদের দেহবুদ্ধি বা ঘটবুদ্ধি নাই। ইঁহাদের দেহও শ্রীগুরুর। শ্রীগুরু ইঁহাদের দেহে বাস করেন। সুতরাং এই দেহ ভাগ্যবতী তনু বা ব্রহ্মতনু হইয়া যায় ("যিনি ব্রহ্মবিদ্ তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহার বাণী বেদ")। ইঁহাদের গুরুধর্ম্ম, বেদ বিধির অতীত কারণ ইঁহারা "বিধির" অতীত। বৈধীর ভিতর নাই। সদাই **রাগমার্গে** অবস্থিত। ইঁহারা গুরু ছাড়া, জগৎকর্ত্তা ছাড়া কিছুই জানেন না। দেবদেবী, তীর্থ প্রভৃতি কিছুই জানেন না।

সকলে তাঁর স্থিতি দর্শন করিয়া আনন্দ পান। ইহারা কোন ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতর বাস করেন না, **সর্ব্ব-সংস্কার দূর হইয়া** যাওয়ায় পরমানন্দে সর্ব্বদা বাস করেন। হিংসা, দ্বেষ বা ঘটবুদ্ধি নাই। ইহাঁদের গুরুতে **বিশ্বাস** ও ভক্তি ভালবাসা অতুলনীয়। যতই গুরুভাব বৃদ্ধি পায় ততই সাধনায় অগ্রসর হন। চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তনির্ম্মল না হ'লে "রসময়ের" প্রাণনাথের দর্শন পাওয়া যায় না। "সমর্থা যৌবন বিনা না হয় গাঢ় রতিরসরাজে।" "অধর চাঁদকে যায় না ধরা, বাঁধা যায় খালি ভক্তি ডোরে।" তাঁকে ধরবার জন্য হৃদকমলে "প্রেমের ফাঁদ" পাতিতে হয়। এই গুণহীন ধর্ম্মপ্রয়াসী ভক্তেরা সদা প্রেমে গরগর হইয়া প্রাণ-নাথের সহিত আনন্দ করেন। হৃদয়নাথকে "শ্রীগুরুকে" স্থূলতঃ **সেবা** করিয়া কৃতার্থ হন। ইহাই বর্ত্তমান ধর্ম্ম। গুরু সাক্ষাতে ধ্যান ধারণা নাই। দর্শন করিয়া, সেবা করিয়া, তাঁহার কথামৃত পান করিয়া, তাঁহাকে খাওয়াইয়া, তাঁহাকে নানারূপে আস্বাদন করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হন। আনন্দ পান। ইহাই **মানুষ ভজন**।

গোপিনীরা ইহাই করিয়া সুখী হইতেন। সর্ব্ব **ইন্দ্রিয়ের দ্বারা** তাঁহাকে আস্বাদন করিতেন। তাঁহাকে ক্ষণেক না দেখিলে বিরহ উপস্থিত হয়—ভক্তেরা রাগমার্গে অর্থাৎ শুদ্ধ ভালবাসা লইয়া শ্রীগুরুর সহিত, প্রাণকান্তের সহিত নানারূপ লীলা করিতেন। নানারূপ অনুভূতি (লেখনীতে প্রকাশ যায় না) যে প্রত্যক্ষ

করিয়াছে, যে সম্ভোগ করিয়াছে সেই জানে—যে করে নাই তাহাকে বুঝান যায় না। ক্লীবকে এ সম্ভোগ বুঝান যায় না। তাই বলিতেছিলাম এই **গুণহীন** ধর্ম্মের গ্রাহক খুব কম হইলেন এবং সাধনা গুপ্তভাবে চলিতে লাগিল। "এ গোলামীর জিনিষ গোলামীতে পাওয়া যায়।" "অমূল্য জিনিষ ছিনাইয়া না লইলে দেওয়া যায় না।" যাঁহারা "জীয়ন্তে মরা" হইলেন তাঁহারাই এই ধর্ম্ম কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাই ঘোষ মহাশয় হইতে লাভ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কানাই ঘোষ মহাশয়ের প্রধান পার্ষদ ছিলেন মহাসাধক, মহাপ্রেমিক হালিসহরনিবাসী শ্রীশ্রীরামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইনি "মুখুয্যে মহাশয়" নামে খ্যাত ছিলেন। ইনি শ্রীহর্ষ বংশ সম্ভূত। ফুলিয়া মুখটী, ভরদ্বাজ গোত্র ও সিরাচার্য্যের সন্তান ছিলেন। ইহাঁর প্রপিতামহ ৺রুদ্রেন্দ্রদেব তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিবাস ছিল বরিশাল জেলার বাকলা পরগণার অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ গ্রামে। ইনি মহা পণ্ডিত ও তেজস্কর নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি নদীয়া জেলার রাজধানী কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় কৃষ্ণনগরে আসিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ বালকগণকে সংস্কৃত ও শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন ও সকলে বিনা ব্যয়ে ঐ টোলে

আহারাদি করিতেন ও থাকিতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। একদিন রাজা তাঁহাকে বলেন যে, "আপনার সহিত আমার একদিন অন্নাহার করিতে ইচ্ছা হয়।" তাহাতে তিনি বলেন যে, "মহারাজ, আপনার সহিত আমার কোনরূপ আত্মীয়তা না থাকায় কেমন করিয়া আপনার সহিত অন্নাহার করি?" তখনকার সময়ে সামাজিক বন্ধন এমন ছিল যে আত্মীয়তা না থাকিলে অন্নাহার চলিত না। কিন্তু মহাগুণী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একজন গরীব মহাপণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত আহার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এই নির্লোভী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ অম্লান বদনে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহাই ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণের তেজ। রাজা ক্ষুণ্ণ হইলেন। কালচক্রে একটী বিবাহ উপলক্ষে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত দূর আত্মীয়তা স্থাপন হইল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আভিজাত্য ভুলিয়া গিয়া দেওয়ানকে মহাকুলীন ও মহাসাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ রুদ্রেন্দ্রদেবকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইলেন। রুদ্রেন্দ্রদেবের চতুষ্পাঠীর একটী ব্রাহ্মণ ছাত্র এই সংবাদ জানিতে পারিয়া দেওয়ান আসিবার অগ্রেই দৌড়াইয়া গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ সংবাদ নিবেদন করেন। রুদ্রেন্দ্রদেব বলেন যে "যখন রাজার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন হইয়াছে তখন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খাইতে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে, তবে বাপু শুন, এখানে তুমি ছাড়া

কেহ উপস্থিত নাই, সে কারণ তুমি ও সূর্য্যনারায়ণ সাক্ষী থাকিলেন, আমি অদ্য হইতে চিরদিনের জন্য অন্ন ত্যাগ করিলাম, কেবল ফল আহার করিয়া থাকিব।” তখনকার দিনে নিমন্ত্রণে “অন্নাহারই” প্রশস্ত ছিল। এমন সময় রাজার দেওয়ান উপস্থিত হইয়া বিবাহসূত্রে আত্মীয়তা ও নিমন্ত্রণের কথা রুদ্রেন্দ্রদেবকে অবগত করায়, রুদ্রেন্দ্রদেব মহাশয় বলেন যে, “যখন আত্মীয়তা স্থাপন হইয়াছে তখন অবশ্য রাজার সহিত আহার করিতে আপত্তি নাই ও নিমন্ত্রণে যাইব; তবে কথা হইতেছে যে, আমি এইমাত্র এই ব্রাহ্মণের ও সূর্য্যদেবের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে অদ্য হইতে অন্ন ত্যাগ করিলাম, আমি ফল খাইয়া থাকিব।” ইহা শুনিয়া দেওয়ান চলিয়া গিয়া রাজাকে ঐ কথা জ্ঞাপন করায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। তেজস্বী ব্রাহ্মণ রুদ্রেন্দ্রদেব ইহার পর ২০ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। কিন্তু ফল ব্যতীত অন্য কিছু আহার করেন নাই। তিনি ঋষিতুল্য তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাস্ত্রে বলে, “যিনি ব্রহ্মবিদ তিনি ব্রহ্ম। তাঁর বাণী বেদ।” ইনি ব্রহ্মবিদ ছিলেন।

৺রামনারায়ণ মুখুয্যে মহাশয়ের পিতামহ ৺ব্রজবল্লভ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। এই ব্রজবল্লভও মহাধার্ম্মিক ও সাত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাঁর পত্নীর নাম ছিল “ক্ষেমঙ্করী দেবী”। ইনি

শান্তিপুরের ভাগীরথী তীরে স্বামীর মৃত্যুর পর "সহমরণে" দেহত্যাগ করেন। চিতায় উঠিবার অগ্রে সকলকে যাহা ছিল বিতরণ করিয়া দেন। কিন্তু চিতায় আরোহণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীগুরুদেবকে নিজের নাকের সোনার নথ খুলিয়া দান করেন ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন আর সমগ্র জনতাকে বলেন যে, "কর্ত্তা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তোমাদের ঢাক বাজাইতে হইবে না বা কোন কার্য্য করিতে হইবে না। আমি চিতা হইতে নড়িব না বা কোন চীৎকার করিব না।" এই বলিয়া তিনি চিতার চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া ও প্রণাম করিয়া জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া "কর্ত্তার" দুটী চরণ জড়াইয়া ধরিয়া চরণে মাথা রাখিয়া বসিয়া থাকেন ও সেই অবস্থায় ভস্ম হইয়া যান—কোনরূপ নড়ন চড়ন বা চীৎকার করেন নাই। সমগ্র জনতা চিতাভস্ম লইয়া কৃতার্থ হন।

৺রামনারায়ণ মুখুয্যে মহাশয়ের পিতার নাম ছিল ৺কালিদাস মুখোপাধ্যায়। ইনিও মহাপণ্ডিত ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

উলা গ্রামে ৺রামনারায়ণ মুখুয্যে মহাশয় একটি তালপাতায় ছাওয়া কুটীরের ভিতর রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর

সামান্য বৃষ্টি হয়। প্রাতে দেখা যায় তালপাতায় চন্দনবৃষ্টি হইয়াছে। চন্দনের দাগ ও গন্ধ চালের উপর ছিল। ৺রামনারায়ণ মুখুয্যে মহাশয়ের উলায় বাস ছিল, কিন্তু উলাতে যখন অত্যন্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বহু লোক মরিয়া যায় তখন মুখুয্যে মহাশয় উলা ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে পুণ্যভূমি কুমারহট্ট অর্থাৎ হালিসহর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। গঙ্গাতীরেই বাড়ী ও আশ্রম তৈয়ারী করেন। ইহাঁর আশ্রমটি "মুখুয্যে মহাশয়ের আটচালা" নামে খ্যাত। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ী কোনটী?" তখন তাহার উত্তর ছিল, "যেখানে দেখিবে **দেওয়ালে মাটি নাই, চালে খড় নাই** কিন্তু বহু লোক খাইতেছে বা বহু এঁটো পাতা পড়িয়া আছে, সেইটী জানিবে মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ী।" ইহার অর্থ মুখুয্যে মহাশয় নির্গুণ পুরুষ ছিলেন,—বাড়ী ঘরের উপর কোন দৃষ্টি বা আসক্তি ছিল না কিন্তু "জীবে দয়া" যথেষ্ট ছিল। তিনি মহা সাধক ও পণ্ডিত লোক ছিলেন, কিন্তু অর্থের অভাব ছিল; তথাপি প্রত্যহ বহু লোক অতিথি, কাঙ্গাল, গরীব আদি এবেলা ওবেলা অন্নাহার করিত। শ্রীগুরুর কৃপায় চলিয়া যাইত। ভগবানের উপর এত নির্ভর ছিল যে, কোন লোক আসিয়া ফিরিয়া যাইত না। তিনি মিষ্টভাষী ও ক্রোধশূন্য ছিলেন। তিনি "গুণকার্য্য" ভালবাসিতেন না। নির্লোভী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

একবার মুখুয্যে মশায়কে বর্দ্ধমানের মহারাজা মহতাব চাঁদ

পত্রবাহক দ্বারা পত্র পাঠান। তাহাতে মহারাজ লেখেন যে, তিনি মুখুয্যে মহাশয়কে দর্শন করিতে চাহেন, অতএব তিনি তাঁহার আসিবার জন্য কি বন্দোবস্ত করিবেন তাহা জানিতে চাহেন। ইহার উত্তরে মখুয্যে মশায় লেখেন, "মহারাজ, তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি জলাশয়ের নিকট আসে, না জলাশয় তৃষ্ণাতুরের নিকট অগ্রসর হইয়া যায়? আপনি পণ্ডিত লোক, এই প্রশ্ন সমাধান করিয়া আমায় ক্ষমা করিবেন।" মহারাজ ক্ষুণ্ণ হয়েন কিন্তু আর কোন পত্র লেখেন নাই। মুখুযে; মশায় কিরূপ নির্লোভ ছিলেন তাহা উক্ত ব্যাপারেই জানা যায়। ইচ্ছা করিলেই তিনি এই সূত্রে মহারাজকে পার্ষদ করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা অনায়াসে ত্যাগ করিলেন। ইহাই নির্গুণ পুরুষের ও এই "গুণহীন ধর্ম্মের" লক্ষণ।

মুখুয্যে মশায়ের গুপ্ত সাধন, ভজন নির্জন গঙ্গাতীরে "আটচালা" নামক আশ্রমেই চলিত ও পার্ষদেরা ঐ আশ্রমেই গোপন ভাবে আসা যাওয়া করিতেন। সৎগুরুকে কেহ প্রকাশ করে না। "ধর্ম্ম গোপয়েৎ মাতৃজ্জারবৎ।" এ অমূল্য ধন অতি যতনে, অতি আদরে রক্ষা করিতে হয়। "**গোপন পিরীতি** ব্যক্ত করিতে নাই।" যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা সকলেই গুরুভাবাপন্ন ছিলেন। মুখুয্যে মশাইয়ের সাধ্বী স্ত্রীর নাম ছিল "উমাসুন্দরী দেবী।" তিনি স্বামীর নিকট দীক্ষা লইয়া সাধন ভজনে অদ্বিতীয়

হইয়াছিলেন। তাঁহার সেবাধর্ম্ম ছিল। যত অতিথি, পার্ষদ ইত্যাদি আসিতেন তিনি বিধবা ননদ "রঘুমনি" সহ সকাল হইতে বৈকাল অবধি ও সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত হাসিমুখে রন্ধনাদি করিয়া খাওয়াইয়া সাধু সেবা করিতেন। "রঘুমনি" বিনা মশলায় জল দিয়া রাঁধিলেও মিষ্ট হইত অর্থাৎ ঠাকুরের কৃপায় তাঁহার হাতের রান্না এত ভাল ছিল।

মুখুয্যে মশাইয়ের বসতবাড়ীতে একদিন সকল পার্ষদেরা মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেছেন ও মুখুয্যে মশাই স্বয়ং পরিবেশন করিতেছেন। এমন সময়ে সকলে দেখেন যে, মধ্যখানে একজন নামাবলী মাথায় জড়ান তেজস্কর ব্রাহ্মণ আহার করিতেছেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে চিনেন না। পার্ষদেরা মুখুয্যে মশাইকে ঈশারা করিলেন। মুখুয্যে মশাই ঈশারায় চুপ করিতে বলিলেন। আহারের পর সকলে উঠিলেন, কিন্তু পার্ষদেরা ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে আচমন করিবার পর উক্ত অপরিচিত ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করিবেন। আচমন করিবার পর উক্ত ব্রাহ্মণকে আর দেখা গেল না। তখন সকলে মুখুয্যে মশাইকে উক্ত ব্রাহ্মণের পরিচয়ের জন্য ধরিলেন। মুখুয্যে মশাই হাসিয়া বলিলেন, "অশ্বত্থামা আসিয়া খাইয়া গেলেন।" এইরূপে মহাপুরুষগণ নির্গুণ প্রেমিক সাধকের প্রসাদ পাইবার জন্য ও সঙ্গ করিবার জন্য আসেন। ইহা যে বিশ্বাসী সেই বিশ্বাস করিবে। "চেটুক পেটুক" ভাব পাবে না।

মুখুয্যে মশাই একদা আটচালায় বসিয়া আছেন, তাঁহার নিত্য পারিষদ হালিসহর কালিকাতলা নিবাসী ৺রূপচাঁদ গাঙ্গুলী মহাশয় তথায় উপস্থিত আছেন। তখন অপরাহ্ন। দুইজন শৈব সন্ন্যাসী আটচালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও মুখুয্যে মশাইয়ের নিকট মহাদেবের গুণকীর্ত্তন করিতে থাকেন ও মুখুয্যে মশাইকে শৈব ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলেন। মুখুয্যে মশাইকে শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায়, মুখুয্যে মশাই বলেন যে, "তিনি শাস্ত্র কিছুই জানেন না সুতরাং কি উত্তর দিবেন।" উক্ত সন্ন্যাসী দুইজন মুখুয্যে মশাইকে পুনঃ পুনঃ শৈব ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলায়, রূপ গাঙ্গুলী মহাশয় ক্রোধান্বিত হইয়া বলেন যে, "তোমাদের কাশীর বিশ্বনাথের মাথার উপর চারিখানি বেদ রাখিয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া ডিঙ্গি মারিয়া তোমরা যাহা না দর্শন করিতে পার তাহা আমরা শ্রীগুরু কৃপায় বসিয়া বসিয়া দর্শন করি।" ইহাতে মুখুয্যে মশাই রূপ গাঙ্গুলীর উপর বিরক্ত হইয়া বলেন যে, "রূপ, এরূপ কথা বলিতে নাই।" সন্ন্যাসীরাও ক্রোধ করিয়া বলেন যে "ভয়ানক আস্পর্দ্ধার কথা—বেদের উপর, বিশ্বনাথের মাথার উপর পা!" এই শুনিয়া রূপ গাঙ্গুলী ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলেন, "এইনে তোর বিশ্বনাথ।" এই বলিয়া মাটিতে সজোরে একটা লাথি মারেন। পদাঘাতে মাটি হইতে "বিশ্বনাথ" ফুটিয়া উঠেন। সন্ন্যাসী দুজন এই দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

এই **গুণকর্ম্মের** জন্য মুখুয্যে মশাই রূপ গাঙ্গুলীকে তিরস্কার করেন ও বলেন যে, "আর এসব গুণকর্ম্ম করিও না—**এ করিলে পতন** হয়।" রূপ গাঙ্গুলী বলেন যে, "শিষ্যের সাম্‌নে গুরুর অপমান কি করিয়া সহ্য করি? আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। উক্ত সন্ন্যাসী দুজন মূর্চ্ছান্তে মুখুয্যে মশাইকে প্রণাম করিয়া আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যান।

এই ৺রূপ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পৌত্র নিতাই গাঙ্গুলী মহাশয় কলিকাতা ১১১নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে বাটী তৈয়ার করিয়া বাস করিতেন। এখন দেহ রাখিয়াছেন। নিতাই গাঙ্গুলী মহাশয় স্বধর্ম্মের লোক। অতি পবিত্র আত্মা ও বিনা বিচারে স্বধর্ম্মের লোকের উপকার করিতেন। ইহাই এই ধর্ম্মের বৈশিষ্ট ও পরস্পরের অভিন্ন ভাব। ভগবজ্জন ও ভগবজ্জনে দেখা হইলে যেন মনে হয় পরস্পরে কোন অমূল্য বস্তু পাইল ও সংসার ভুলিয়া গেল। গুরুর কথায় তন্ময় হইল। ইনি এই প্রকৃতির সাধক ছিলেন।

আর একদিন দিনেরবেলায় দুইজন সাধক "আটচালায়" মুখুয্যে মশাইয়ের নিকট আসেন ও মুখুয্যে মশাইকে অত্যন্ত অনুরোধ করেন যে তাঁহাদের দীক্ষা দিতে হইবে। মুখুয্যে মশাই জিদ এড়াইতে না পারিয়া উহাদের বলেন যে, "সম্মুখে একটু তফাতে যে বট বৃক্ষ আছে উহার নিকট হইতে একবার ফিরিয়া আসিলেই দীক্ষা দিবেন।" এই শুনিয়া তাহারা দুইজনে বটবৃক্ষের

তলায় যান ও তথায় তাঁহারা কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যান। মুখুয্যে মশাইয়ের নিত্য পার্ষদ ৺ঈশান ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুখুয্যে মশাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ দুইজন লোক কেন চলিয়া গেলেন ও বটতলায় কি দর্শন করিলেন?" মুখুয্যে মশাই কিছু প্রকাশ করিলেন না—কেবলমাত্র বলিলেন যে, "উহারা ঠকাইয়া দীক্ষা লইতে আসিয়াছিল। বোধ হয় কোনরূপ বিভীষিকা দর্শন করিয়া সতর্ক হইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।"

মুখুয্যে মশাই কাঁচরাপাড়ার শ্রীযুক্ত কানাই ঘোষ মহাশয়ের অতি প্রিয় ও প্রধান পারিষদ ছিলেন।

ঘোষ মহাশয়ের একটী প্রিয় শিষ্য ছিলেন তাঁহার নাম ছিল "মানিক ময়রা।" এই "মানিক" প্রকৃতই মানিক ছিলেন। তিনি গুরুময় জগৎ দেখিতেন। তাঁহাকে অনেকে পাগল বলিত, কারণ দেহবুদ্ধি না থাকায় পাগলবৎ মনে হইত। একদিন মানিক ঘোষ মহাশয়ের নিকট আসিয়া পিছন ফিরিয়া বসিলেন। অন্যান্য পার্ষদেরা এই দেখিয়া হাসিলেন। ঘোষ মহাশয়ের ইহা সহ্য হইল না তাই মানিককে বলিলেন যে, "মানিক, তুমি আমার দিকে কেন

পিছন ফিরিয়া বসিলে?" মানিক উত্তর করিল, "আমি তোমার সাম্‌নেইত বসিয়াছি। তুমিত আমার সাম্‌নে আছ। যখন বলিতেছ, আমি পিছন ফিরিয়া বসিয়াছি, তখন তোমার হুকুমে ফিরিয়া বসিলাম; কিন্তু আমিত তোমাকে সম্মুখে দেখিতেছি।" এই শুনিয়া সকলে লজ্জিত হইলেন। মানিক শ্রীগুরুকে সর্ব্ব সময়ে সাম্‌নে দেখিত। পিছন সম্মুখ জ্ঞান ছিল না।

মানিকের পুত্রের নাম ছিল "রামানন্দ"। এই রামানন্দ যখন শিশু তখন তাহার মৃত্যু হয় ও তাহাকে তুলসী তলায় নামান হয়। মানিক দৌড়াইয়া আসিয়া কর্ত্তা ঘোষ মহাশয়কে জানাইল যে, "রামানন্দ কথা কহিতেছে না, তাহাকে তুলসী তলায় নামান হইয়াছে।" এই শুনিয়া কর্ত্তা মুখুয্যে মশাইকে বলিলেন যে, "যাও দেখি, রামানন্দকে একবার ডাকিয়া দেখত?" এই হুকুম পাইয়া মুখুয্যে মশাই তুলসী তলায় আসিয়া রামানন্দকে ডাকেন। রামানন্দ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসে ও বলে যে, "বড় ক্ষিধে পেয়েছে।" তিনি ডাকিবার হুকুম পাইয়াছিলেন মাত্র। সে কারণ "কর্ত্তাকে" জিজ্ঞাসা করিয়া রামানন্দকে খাওয়ান হয়। সত্য সাধন করিলে, সত্য মানুষ হইলে তাঁহার হুকুমে মরা মানুষ বাঁচে, অসাধ্য সাধন হয়। ইহার মূলে গুরুতে একান্ত ভক্তি ও বিশ্বাস এবং নামে রুচি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা চাহি। যে কায়মন-বাক্যে গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন করে সেই নিত্যযুক্ত—সদা গুরুতে

স্থিত। সে সুখসাগরে সদাই ভাসমান। "সে আঁধার কোনে চাঁদ গেলে, মুখে নাই তার কথা।" "সে যে রসে ভাসে, প্রেমে ডোবে, করে উজান পথে আনাগোনা।"

এই মানিকের এমন গুরুগত প্রাণ ছিল যে একদিন বর্ষাকালে রাত্রিতে ঘোষ মহাশয়, মানিকের পাগলামিতে অন্যান্য পার্ষদেরা বিরক্ত বোধ করায়, মানিককে বলেন যে, "মানিক, ঘর হইতে চলিয়া যাও।" এই আজ্ঞা শুনিয়া ঘরের ভিতর হইতে মানিক বাহির হইয়া যায়। সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতেছে। সাধন ভজনের পর শিষ্যেরা সব চলিয়া যান। অনেক রাত্রে কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বলেন যে, "কে আছিস্ রে, তামাক দে।" খানিক পরে মানিক আসিয়া তামাক দিল। কর্ত্তা বলিলেন, "মানিক, তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু আবার কোথা হইতে আসিলে ?" মানিক বলিলেন, "তুমি ঘর হ'তে যেতে বলেছিলে, সেজন্য ঘর হতে চলিয়া গিয়া ছাঁচতলায় ছিলাম।" এই শুনিয়া কর্ত্তা বলেন যে, "আহা, সমস্ত রাত্রি জলে ভিজিয়াছ।" "আমি না থাকিলে তোমায় কে তামাক দিত," এই বলিয়া মানিক হাসিল। এ ভালবাসার, দরদী ভাবের তুলনা হয় না।

মানিকের মত শিষ্য দুর্লভ। সে গুরু ছাড়া কিছুই জানিত না। গুরুই তাহার পরম সুখ, গুরু-সেবাই তাহার পরম আনন্দ

ছিল। শ্রীগুরুতে নিত্যযুক্ত ছিলেন। কোন কোন শিষ্য তাহাকে পাগল মনে করিত কারণ সকলে রাগমার্গে অবস্থিত ছিলেন না। মানিক কর্ত্তাকে "তুমি" বলিয়া ডাকিতেন। মানিকের সহজ ভাব। প্রিয় শিষ্য মানিককে উপযুক্ত দেখিয়া ঘোষ মহাশয় তাহাকে একদিন বলেন যে, "মানিক, তুমি এইবার "নাম" দিতে পার।" ইহার পর মানিক গঙ্গাস্নান করিতে যান। তখন গঙ্গায় ভাঁটা পড়িয়াছে। একটা বড় নৌকা ভাঁটার জন্য জল সরিয়া যাওয়ায় তীরে কাদার উপর বসিয়া গিয়াছে ও ১৯।২০ জন মাঝি ও মাল্লা বহু ঠেলাঠেলি করিয়া নৌকা নড়াইতে বা ভাসাইতে পারিতেছে না। এই দেখিয়া মানিকের দয়া হইল। কর্ত্তা "নাম" দিবার হুকুম দিয়াছেন। মানিক আসিয়া কোনরূপে বিচার না করিয়া তাহাদের "নাম" দিলেন ও বলিলেন যে, "এইবার নাম স্মরণ করিয়া নৌকা টান।" তাহারা ঐরূপ করিতেই নৌকা হড় হড় করিয়া কাদার উপর চলিয়া আসিয়া জলে পড়িল ও তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। মানিক তাহাদের লইয়া কাছিদড়ি সহ কর্ত্তার কাছে উপস্থিত করিলেন ও সমস্ত বলিলেন। কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন যে, "এইরূপে কি নাম দিতে বলিয়াছি?" মানিক বলিলেন যে, "তুমিত হুকুম দিয়াছ কিন্তু কি করি, উহাদের নৌকা যে ভাসে না, তাই নাম দিলাম।" কাঁচরাপাড়ার ঠাকুরবাড়ীতে এখনও ঐ মাঝিমাল্লাদের নৌকার সেই কাছি আছে। বহু

ভাগ্যে ঐরূপ বিশ্বাসী ভক্ত জগতে আসেন ও জগৎ উদ্ধার করেন।

মানিক যেখানে থাকিতেন সেখানে একদিন রাত্রে আগুণ লাগে। সেখানকার সমস্ত বাড়ী পুড়িয়া যায় কিন্তু মানিকের বাড়ী তাহাদের মধ্যখানে থাকা সত্ত্বেও পুড়িয়া যায় নাই। তাঁহার অসাধারণ গুরু ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল এবং গুরু পদে আত্মসমর্পণ ছিল—সে কারণ ঘর পুড়িল না। গুরু-শক্তি রক্ষা করিল।

একদিন একটী লোক বাহিরে চীৎকার করিতেছিল। কর্ত্তা মানিককে দেখিতে বলিলেন। মানিক বাহিরে গিয়া দেখিল যে লোকটী মাটিতে পড়িয়া চীৎকার করিতেছে। মানিক তাহার পিঠে একটি লাথি মারিয়া বলিল যে, "শুধু শুধু চীৎকার করিস্ না।" লোকটি উঠিয়া বসিল ও বলিল যে, "বাবা, আমায় বাঁচালে। আমার শূলবেদনা ধরিয়াছিল। তোমার পদস্পর্শে শূল বেদনা আরাম হইল।"

মানিকের অদ্বিতীয় গুরুভক্তি ছিল। সর্ব্বদা নাম শ্বাসে শ্বাসে জপ করিতেন। দেহ ভাগবতী তনু ছিল। মানিকের এরূপ কত অলৌকিক কার্য্য আছে যাহা লিপিবদ্ধ না থাকায় জানিবার উপায় নাই।

এই কাঁচরাপাড়া ঠাকুরবাড়ীর এমনি মহিমা, যে যাহা ভক্তি এবং বিশ্বাসের সহিত মানত করে তাহা পূর্ণ হয়। অসাধ্য রোগ ভাল হয়।

সিদ্ধপুরুষ শ্রীশ্রীসত্যঠাকুর

একটী বামুনদাদা বলিয়া ভক্ত ছিলেন। তিনি আউলিয়া ছিলেন। সদা হাস্যমুখ, সর্ব্বদা ভগবদ্ সেবা করিতেন। গুরুগত প্রাণ ছিল।

মহাসাধক মুখুয্যে মশাইয়ের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত মুখুয্যে মশাই যখন সাধনায় বসিতেন তখন ভক্তরা দেখিতেন যে, তাঁহার অঙ্গ প্রেমে গলিয়া গিয়াছে। সত্যই তাঁহার ভাবের অঙ্গ প্রেমে গলিয়া মাংসপিণ্ডে পরিণত হইত। হাড় সব নরম হইয়া যাইত। শ্রীমুখ "চকাবকা" হইয়া ছোট দেখাইত। সমাধি হইতে যখন উঠিতেন তখন আবার ভাগবতী তনু পূর্ব্বাবস্থা ধারণ করিত। পার্ষদের যাহারা তাঁহার সহিত বৈঠকে বসিতেন তাঁহারা মুখুয্যে মশাইকে বলিয়াছিলেন যে, ঐরূপ অবস্থা তাহাদেরও কিরূপে হয় তাহা শিক্ষা দেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, ভাব বৃদ্ধি হ'তে হ'তে ঐরূপ ক্রমশঃ হবে। একেবারে হয় না।

এই বলিয়া একটি গল্প বলেন:—

এক বাদসা ছিলেন। তিনি প্রত্যহ অতি সুস্বাদু পোলাও খাইতেন। অল্প খাইয়া সমস্ত পোলাও ফেলিয়া দিতে বলিতেন—

কাহাকেও ঐ পোলাও দিতেন না। একদিন তাঁহার শিশুপুত্র আবদার ধরিল যে সে ঐ পোলাও খাইবে। বাদসা কথা কহিলেন না, তখন বেগম চটিয়া গিয়া বলিলেন যে, "তুমি নিজে প্রত্যহ খাও, কিন্তু এমন স্বভাব যে কাহাকেও না দিয়া অবশিষ্ট পোলাও সব ফেলাইয়া দাও। ছেলেটাকে অল্প দিলে তোমার কি কোন লোকসান হয়? বড় লোভী তুমি—একলা খাইয়া কি আনন্দ পাও?" এই শুনিয়া বাদসা বলেন যে, "বেগম, ছেলেকে দিতে আপত্তি নাই তবে সে সহ্য করিতে পারিবে না।" বেগমের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে বাদসা বলিলেন যে, "আচ্ছা, উহাকে এক চামচ দাও—" এবং একজন হাকিমকে ডাকিতে হুকুম দিলেন। ছেলে এক চামচ পোলাও খাইল কিন্তু সহ্য করিতে পারিল না। তাহার পেট ফুলিয়া উঠিল ও বাহ্যে করিতে আরম্ভ করিল। প্রাণ যাওয়ার মত হইল তখন হাকিম সাহেব নানা ঔষধ দিয়া ছেলেকে সুস্থ করিল।

এই গল্প বলিয়া তিনি বলিলেন যে, বৈঠক করিতে করিতে ভাব বৃদ্ধি হইলে শ্রীগুরু কৃপায় ক্রমশঃ ঐ অবস্থা হইবে। জোর করিয়া হয় না। আমি এক প্লেট খাইতে পারি, কিন্তু তোমরা এখন এক চামচের বেশী সহ্য করিতে পারিবে না। সকলই সাধন সাপেক্ষ।

ঘোষ মহাশয় দেহরক্ষা করিবার পর, তাঁহার পত্নী, পুত্র কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় কিম্বা কন্যা পদ্ম যাঁহাদের নাম দিতেন তাঁহাদের আদেশ করিতেন যে, "যাও, হালিসহরের মুখুযো মহাশয়ের নিকট। তিনি সাধন দিবেন।" তাঁহারা নাম শ্রবণ করিয়া মুখুয্যে মশাইয়ের নিকট সাধন লইতেন ও সঞ্চার প্রত্যক্ষ করিতেন। কাঁচরাপাড়ানিবাসী মহাযোগী শ্রীশ্রীনবীন রায় মহাশয় ঐরূপ আদেশ পাইয়া মুখুয্যে মশাইয়ের নিকট গিয়া সাধন লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

২২জন ফকিরের মধ্যে ২০জন অসংসারী ছিলেন। তাঁহারা ফকিরঠাকুরের তিরোধানের পর, আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় একে একে গুপ্ত হইলেন। একজন ফকির চাক্‌দহর নিকট বিরুই গ্রামে "মদনমোহন" বিগ্রহে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর হইয়া রহিলেন। বড়ই রহস্যময় কথা। বৃন্দাবনে কত ভক্ত এইরূপ ভাবে বিগ্রহ হইয়া, বট বৃক্ষাদি হইয়া নামানন্দে লীলা করিতেছেন। যিনি বিশ্বাসী, প্রেমিক ভক্ত তিনি ইহার মর্ম্ম বুঝিবেন। মুখুয্যে মশাই ইহা জানিতেন। একদিন মুখুয্যে মশাই কোন কার্য্যোপলক্ষে মদনপুর গিয়াছিলেন। হাঁটাপথে হালিসহর আসিবার সময় বীরুই গ্রামে আসিয়া রাত্রি হইয়া গেল। তখন ভাবিলেন যে বীরুইয়ের "মদনমোহন" ত "স্বধর্ম্মের জন," তবে "মদনমোহনের"

নিকট অতিথি হই না কেন? এই বিবেচনা করিয়া মদনমোহন মন্দিরে মুখুয্যে মশাই যখন উপস্থিত হইলেন তখন মদনমোহনের ভোগ হইয়া গিয়াছে ও মন্দির বন্ধ করিয়া সেবাইত চলিয়া যাইতেছেন। অতিথি দেখিয়া সেবাইত বলিলেন যে, "ঠাকুর, এখন আর প্রসাদ পাবে না। ভোগ হইয়া গিয়াছে ও মন্দির বন্ধ হইয়াছে।" মুখুয্যে মশাই বলিলেন যে, "আহারের দরকার নাই। এই মন্দিরের বারান্দায় রাত্রি কাটাইয়া প্রাতে চলিয়া যাইব।" মুখুয্যে মশাইয়ের বিশ্বাস যে, যখন "মদনমোহন" আমাদের ঠাকুরের জন তখন নিশ্চয় তিনি তাঁহাকে খাওয়াইবেন, অভুক্ত রাখিবেন না। মুখুয্যে মশাই এই চিন্তা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। খানিক রাত্রে একজন সুন্দর পুরুষ আসিয়া মুখুয্যে মশাইকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "ঠাকুর, অভুক্ত থাকিতে আছে কি? উঠে পড়ুন প্রসাদ পাবেন।" মুখুয্যে মশাই নিদ্রা হইতে উঠিয়া আর কিছু না বলিয়া মনে মনে হাসিয়া গরম গরম "খই-দুধ-মিছরী" সহ প্রসাদ পাইলেন। মদনমোহনের "খই-দুধ-মিছরী" সহ ভোগ হইয়া থাকে। মুখুয্যে মশাই আবার নিদ্রা গেলেন ও প্রাতে হালিসহর রওনা হইলেন। এ ধর্ম্মের নিয়ম "সকলে প্রীতি ও জীবে দয়া।" বিশেষ "ভগবৎ জনের সেবা পরম ধর্ম্ম।"

২২ ফকিরের এক ফকির কাঁচরাপাড়ায় "কৃষ্ণরাইজী" ঠাকুরে প্রবিষ্ট হইয়া বিগ্রহরূপে আছেন।

অন্যান্য ফকিরদের বিষয় জানা যায় না। তবে মুখুয্যে মশাইয়ের নিকট হালিসহরের আটচালায় একজন ফকির কখনও কখনও আসিতেন। তিনি উলঙ্গ থাকিতেন। মুখুয্যে মশাই নিজে একটী কাপড় পরাইয়া দিতেন। তিনি মুখুয্যে মশাই ছাড়া আর কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। তিনি মহাসাধক ছিলেন ও সর্ব্বদা প্রেমে গরগর থাকিতেন, কিন্তু লোকে না বুঝিয়া তাঁহাকে "ক্ষ্যাপা" বলিত। তিনি লোকসমাজে থাকিতেন না। মুখুয্যে মশাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তাঁহার সঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু কোথায় থাকিতেন কেহ জানিত না। হাওড়া জেলায় বালির নিকট গঙ্গার উপর এক চড়ায় থাকিতেন বলিয়া শোনা যায়। মুখুয্যে মশাইয়ের সহিত সাধন বা বৈঠক করিতেন।

মুখুয্যে মশাই দেহ রাখিবার পর, একদা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় হাওড়া সালিখা হইতে প্রাতে ৯।১০টার সময় কলিকাতার অফিসে যাইতেছিলেন। সালিখার পথিমধ্যে একটা ভিড় দেখিয়া ভিড়ের মধ্যে গিয়া দেখেন যে "একটী পাগল নাচিতেছে ও ছেলেরা সব হাততালি দিতেছে।" পাগলের সহিত মুখোমুখী হওয়ায় হঠাৎ পাগল দাঁড়াইয়া গেলেন ও কৃষ্ণসখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মুখুয্যে মহাশয়ের পুত্র না?

কর্ত্তা কেমন আছেন ?” তাহাতে তিনি বলেন যে, “বাবা দেহ রাখিয়াছেন।” এই শুনিয়া পাগল “উঃ” বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়া অল্পক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া গেলেন। কৃষ্ণসখা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি এই মহাপুরুষকে আর জীবনে দেখেন নাই। ইনি কোন গুপ্ত ফকির ছিলেন। ইহাঁরা রাগমার্গের সাধক।

মুখুয্যে মশাই বলিতেন, “সে ঘরের উল্টা চাবি কলে কৌশলে খুলতে পারলে অমূল্য নিধি কতই পাবি।” যাঁহারা সাধনা করেন, যাঁহাদের সঞ্চার হইয়াছে তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম বুঝিবেন।

মুখুয্যে মশাইয়ের পার্ষদ এবং বন্ধু ছিলেন হালিসহরের শ্রীগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়। ইহারই পুত্র ছিলেন গণিত-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ প্রফেসর ৺বিপিন বিহারী গুপ্ত। এই গোবিন্দ গুপ্ত হুগলী কলেজের হেড পণ্ডিত ছিলেন। হুগলী কলেজে পুণ্যধাম বালীনিবাসী ৺বেনী বাড়ুয্যে মহাশয় প্রফেসর ছিলেন। একদিন বেনীবাবু কলেজে গীতা পড়িতেছিলেন। গোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়

উহা দেখিয়া বলেন, "বাড়ুয্যে মশাই, গীতা কিরূপ পড়িতেছেন?" তাহাতে বেনীবাবু বলেন, "শ্রীধর স্বামীর ভাষ্যই বেশ প্রাঞ্জল অনুভব করিতেছি।" গুপ্ত মহাশয় এই শুনিয়া বলেন, "আপনার পড়া কিরূপ হচ্ছে, জানেন? একজন ক্লীব ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দরের বিহার পড়িয়া হাসিতেছে। কিন্তু একজন গৃহী তাহাকে হাসিতে দেখিয়া বলিল যে, 'ভাই,. তুমিত ক্লীব, বিহার জান না তবে কেন হাসিতেছ? বরং আমি গৃহী, বিহার জানি, আমি হাসিতে পারি।' এই শুনিয়া ক্লীব দুঃখিত হইল।" বেনীবাবু অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। এই ঈসারা পাইয়া তিনি গীতা রাখিয়া দিলেন ও বলিলেন যে, "গুপ্ত মহাশয়, ইহার উপায় আছে কি?" গুপ্ত মহাশয় বলিলেন, "নিশ্চয় উপায় আছে।" বেনীবাবু আর দেরী করিলেন না, কারণ "সময় হইয়াছে, আর কি দেরী করা চলে?" গুপ্ত মহাশয় হালিসহরে সেই দিন মুখুয্যে মশাইয়ের নিকট তাঁহাকে লইয়া গেলেন। বেনীবাবু মুখুয্যে মশাইয়ের আশ্রিত হইয়া নবজীবন লাভ করিলেন ও আত্মা পরমাত্মার মিলন হইবার পর গীতার প্রকৃত অর্থ বুঝিলেন। এই বেনীবাবু পরে হাইকোর্টে বিখ্যাত উকিল হইয়াছিলেন ও বাঁচিয়া থাকিলে হাইকোর্টের জজ হইতেন। জজ দ্বারিক মিত্র তাঁহার নিকট জুনিয়র উকিল ছিলেন।

হালিসহরনিবাসী ৺রমেশ গুপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

তিনি যখন ৭।৮ মাসের শিশু তখন খেলা করিতে করিতে উঠানে গিয়া একটী জীয়ন্ত কই মাছ তথায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া খাইবার বস্তু মনে করিয়া জীয়ন্ত কই মাছটী মুখে পুরিয়া দেওয়ায় কই মাছটী গলার ভিতর গিয়া আটকাইয়া যায় কারণ কই মাছ তার কান্‌কো ফুলাইয়া উঠায় গলায় আটকাইয়া যায় ও কই মাছকে বাহির করিতে পারা যায় না। ইহাকে ইংরাজীতে ডাক্তারেরা Fish Strangulation বলে। ইহাতে ছেলে বাঁচে না। তখন হালিসহরে বিশেষ ডাক্তার ছিল না। ছেলেটী মুখ হাঁ করিয়া কাঁদিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কোন উপায় না পাইয়া ছেলেকে লইয়া তাহার ঠাকুমা আটচালায় মুখুয্যে মশাইয়ের নিকট লইয়া আসিল। মুখুয্যে মশাইয়ের হাতে পায়ে ধরায় তিনি বলিলেন যে, "ডাক্তারের নিকট লইয়া যাও—আমার ত ক্ষমতা নাই।" কিন্তু শিশুর ঠাকুমা অনেক কান্নাকাটি করায় তখন মুখুয্যে মশাই বলেন, "গুণকর্ম্ম করিতে নাই। তোমরা বাপু আর এখানে আসিও না।" কিন্তু ছেলেটার অবস্থা খারাপ দেখিয়া তখন বাধ্য হইয়া শিশুর কানে মহাশক্তিসম্পন্ন নাম দেওয়া মাত্র মৎস্যটী জীবিত অবস্থায় গলার ভিতর গিয়া মলদ্বার দিয়া নির্গত হইল ও শিশুটী বাঁচিয়া গেল। এই শিশুশিষ্য কালে নামের প্রভাবে বিদ্বান হইল ও হাকিম হইল, কিন্তু যে নামের শক্তিতে জীবন পাইল সে ধর্ম্মে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য

হইল না। এই গুণহীন ধর্ম্মের প্রকাশ নাই। যাহার আগ্রহ আছে সেই সন্ধান করিয়া অমূল্য বস্তু পায়।

মুখুয্যে মশাইয়ের পার্ষদের মধ্যে একজন "কুচীল" নামে মুসলমান সাধক ছিলেন। তিনি মহাবৈষ্ণব যবন হরিদাসের ন্যায় ছিলেন। সকলকে সম্মান করিতেন। তিনি যখনই হালিসহর বাটীতে আসিতেন তখনই লাউ বা যাহা হউক একটী ফল হাতে করিয়া উপস্থিত হইতেন ও তাহাতে সাধুসেবা বা গুরুসেবা হইত। বড়ই ভক্তিমান শিষ্য ছিলেন।

মুখুয্যে মশাই একদিন রাত্রি ৩টার সময় বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছেন। নিত্য পার্ষদ ৺ঈশান ভট্টাচার্য্য মহাশয় তথায় আছেন। হঠাৎ দুইটী মুসলমান দরবেশ আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু আহার করিব।" মুখুয্যে মশাই এই শুনিয়া ঘরের ভিতর গিয়া কিছুই পাইলেন না। হাঁড়িতে দুটী ভিজা ভাত ছিল। সেই ভাত লবণ সহ থালাতে করিয়া লইয়া আসিলেন। তাঁহারা দাঁড়াইয়া ভিজা ভাত খাইয়া চলিয়া গেলেন। ৺ঈশান ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা

কে ?" মুখুয্যে মশাই পরিচয় দিলেন না, কেবল বলিলেন, "উঁহারা খাইতে চাহিলেন, ঘরে যাহা ছিল তাই দিলাম।" এইরূপ অনেক মহাপুরুষ সাধককে পরীক্ষা করিতে এবং সময় সময় প্রসাদ পাইতে আসিতেন।

মুখুয্যে মশাইয়ের কত অলৌকিক কার্য্য ছিল তাহা সমস্ত আমার জানাও নাই ও লিখিবারও শক্তি নাই। কারণ তিনি গুণকর্ম্ম নিষেধ করিতেন ও কিছুই প্রকাশ করিতেন না। তিনি নির্গুণ পুরুষ ছিলেন। অহং ছিল না। এটী গুণহীন ধর্ম্ম।

মুখুয্যে মশাই ৬২ বৎসর বয়সে শিবচতুর্দ্দশীর পূর্ব্ব দিনে দেহ রাখেন। গঙ্গাতীরস্থ "আটচালা" নামক আশ্রমে উন্মুক্ত স্থানে শয়ন করিয়া দিবাভাগে দেহ রক্ষা করেন। গোবিন্দ গুপ্ত প্রভৃতি শিষ্যেরা সব উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মুখুয্যে মশাই বলেন যে গঙ্গায় অন্তর্জলী করিতে হইবে না। শিষ্যরা বলেন, "ঠাকুর, আমরা কি করিয়া বুঝিব আপনি দেহ রাখিলেন ?" মুখুয্যে মশাই বলেন, "আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলেই বুঝিতে পারিবে।" সকলে একদৃষ্টে শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলেন যে, মুখুয্যে মশাইয়ের শ্রীমুখ হইতে একটি অপার্থিব জ্যোতি বাহির হইতেছে। সেই জ্যোতি ক্রমশঃ আকাশের দিকে উঠিয়া বহু দূরে গিয়া মিলাইয়া গেল। তখন

উঁহারা বুঝিলেন যে মহাপুরুষ দেহরক্ষা করিলেন। ইহার পর উঁহারা সকলে সেই ভাগবতী তনু চন্দন কাষ্ঠ ও ঘৃত সহ গঙ্গা তীরে দাহ করিলেন। ভাগিরথী সেই পূত ভস্ম বক্ষে ধারণ করিয়া পবিত্র হইলেন ও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। পূত ভস্ম হালিসহরবাসী সমস্ত লোক মুঠা মুঠা করিয়া মস্তকোপরি লইয়া গিয়া তুলসীমঞ্চ স্থাপন করেন। ভক্ত শিষ্যরা ঐ পূত ভস্ম দ্বারা আটচালায় একটি তুলসীমঞ্চ স্থাপন করেন। কালে ঐ পবিত্র তুলসীমঞ্চ এবং সেই বটবৃক্ষ গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন। আটচালার সিড়ির সাম্নে এখনও কাহারও কঠিন ও দুরারোগ্য ব্যাধি হইলে লোকেরা রোগীকে মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়াইয়া লইয়া যায়। কেহ কেহ মাটি লইয়া যায়। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু।" যাহার বিশ্বাস আছে তাহার আশা পূর্ণ হয়।

মুখুয্যে মশাইয়ের পত্নী তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে নাম পান। তিনি ৮৫ বৎসর বয়সে ৺কাশীধামে দেহ রাখেন। তাঁহার গুরুতে প্রগাঢ় ভক্তি ও নামে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল। পূজা করিয়া ইষ্টের ধ্যান করিতে করিতে দেহ রাখেন। অপূর্ব্ব দেহত্যাগ! ইহাঁর নাম ছিল "উমাসুন্দরী দেবী"। সে কারণ হালিসহর বাটীর নাম "উমাধাম"। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার

পুত্র হরিগোপালকে কাশীধাম হইতে লেখেন যে "নাত বৌয়ের গর্ভে একটী পুত্র আসিতেছে। তাহার নাম "তুলসীচরণ" রাখিবে ও তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিবে। ইহা কর্ত্তার হুকুম।" তাঁহার স্বপ্ন সত্য হইল। তুলসীচরণ জগতে আসিল ও তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হইল।

একবার রাজা রামমোহন রায় মুখুয্যে মশাইকে দর্শন করিতে আসেন ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গে বলেন, "মন্ত্র বা নাম লইবার অথবা গুরু আশ্রিত হইবার কি প্রয়োজন?" তাহাতে মুখুয্যে মশাই একটী সুন্দর গল্প বলেন :—

কোন দেশে একটী ধনী লোক ছিলেন। তিনি বাড়ী ঘর সদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। একদিন শুনিলেন যে নারিকেলের ঝাঁটায় বাড়ীঘর অতি সুন্দর পরিষ্কার হয়। কিন্তু সে দেশে নারিকেল গাছ জন্মায় না; সে কারণ নারিকেলের ঝাঁটা প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি বহু ব্যয় করিয়া বহুদূর হইতে নারিকেল চারা আনাইয়া বাড়ীতে রোপণ করিলেন। ৫।৬ বৎসর পরে নারিকেল গাছ বড় হইলে তিনি আনন্দ সহকারে পাতা কাটাইয়া

তাহা হইতে নারিকেলের ঝাঁটা তৈয়ার করিলেন। তৎপর বাড়ীর উঠানাদি ঐ ঝাঁটায় ঝাঁট দেওয়াইয়া অতি চমৎকার পরিষ্কার হইয়াছে ও কোন স্থানে ধুলাদি নাই দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কারণ এতদিন পরে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। কিন্তু ইহার পর তিনি কাঁদিতে বসিলেন। এই দেখিয়া প্রতিবাসীরা আসিল ও বলিল যে এতকাল পরে আপনার আশা পূর্ণ হইল, তবে কাঁদিবার কারণ কি? তাহাতে তিনি বলিলেন, "আশা ত পূর্ণ হইল, ঘর সুন্দর পরিষ্কার হইল কিন্তু মনে আনন্দ পাইতেছি না। এখন মনে হচ্ছে যে এমন সুন্দর পরিষ্কার ঘরে বসাই কাহাকে? বসাবার পাত্র পাইতেছি না।" Christ বলেন, "Thou art Temple of God." কিন্তু মন্দিরে নামরূপী শ্রীগুরুকে প্রতিষ্ঠা না করিলে জীবের আনন্দ হয় না। "গুরু-আনুগত্য" না করিলে আনন্দ বা তৃপ্তি পায় না। নিজেকে অপূর্ণ মনে করে। এই জন্য গুরু দরকার। "আমি সাকার, সে নিরাকার, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।" মুখুয্যে মশাই বলিতেন যে, "গুণ টেনে নদীর কিনারা দিয়া যাওয়া যায়, নদী পার হওয়া যায় না—নির্গুণ হইয়া পাড়ি দিতে হয়। কৌশল চাই। সেজন্য গুরু-আনুগত্য দরকার।" এই শুনিয়া রাজা রামমোহন সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যান।

মুখুয্যে মশাইয়ের বহু গুপ্ত শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা নির্গুণ সাধক ও গুরুগত প্রাণ ছিলেন। তাঁহারা সকলে "পূর গৃহস্থ, চূর ফকির" ছিলেন; অর্থাৎ মনে মনে চূর্ণ ফকির ছিলেন কিন্তু বহির্ভাগে

পূরমাত্রায় গৃহস্থালী করিতেন। অন্তরে জানিতেন যে শ্রীগুরুই একমাত্র বস্তু, আর সমস্তই অবস্তু। এইভাবে সংসার করিতেন। সুখ, দুঃখ, বিপদ-আপদে কিছুমাত্র ব্যথিত হইতেন না। কারণ সকলই গুরুর ইচ্ছা—গুরুর প্রসাদ। গুরু বিশ্বাস প্রগাঢ়, সদাই গুরুতে আত্ম-সমর্পণ। গুরুরূপ সদাই দর্শন করিতেছেন, এবং শ্বাসে শ্বাসে নাম চলিতেছে। মোটের উপর তাঁহারা গুরু ছাড়া কিছুই জানিতেন না।

মুখুয্যে মশাইয়ের এক গুরুভাই ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল শ্রীযুক্ত নবকিশোর গুপ্ত মহাশয়, সাকিম হালিসহর। এই নবকিশোর গুপ্ত মহাশয় পরে কলিকাতায় উল্টাডিঙ্গীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার "হাসির দল" ছিল। তিনি সাধক ছিলেন কিন্তু তিনি গুরু বর্ত্তমান থাকা সত্বেও তারিনী ও সারদা নামে দুটি শিষ্য করেন। গুরুর বিনা অনুমতিতে দীক্ষা দেন। ইহার সমর্থনে গুপ্ত মহাশয় বলিতেন যে, "দই খেয়ে ভাঁড় ফেলে দাও।" অর্থাৎ "নাম" শ্রবণের পর আর গুরুর দরকার নাই। এই বাক্য তিনি প্রচার করায় ও নিজের প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী হওয়ায় মুখুয্যে মশাই তাঁহার পার্ষদদিগকে ঐ দলের সহিত মিশিতে নিষেধ

করেন। কারণ এই ধর্ম্মে শ্রীগুরুতে প্রগাঢ় ভক্তি না হইলে নাম-ব্রহ্মে রুচি হয় না ও সঞ্চারও হয় না। "অভেদ আত্মা নাম নামীন।" শ্রীগুরু রূপ স্মরণে হৃদয় গলিয়া যায় ও প্রেমের উদয় হয়। "সে ভাবের মানুষ ভাবে উদয় হয়।" অহং ভাবে তাঁকে ধরা যায় না। "আমি ম'লে তাঁর মনে হয় হরিষ।" অহং থাকিতে হয় না। প্রকৃতির অধীন না হইয়া জীয়ন্তে মরা হইয়া শ্রীগুরুপদে সদা লাগিয়া থাকিতে হয়। শ্রীচৈতন্যদেব গান গাহিতেন, যথা—"মনহুঁ সদা লাগুরে শ্রীগুরুপদ পঙ্কজে।" সদা নাম সহ শ্রীগুরুপদ ধ্যান করিতে করিতে মহাভাবের উদয় হয়। যাহার এভাব হইয়াছে সে সদা গুরুতে লীন হইয়া থাকে ও গুরুময় জগৎ সংসার দেখে। ইহা বড়ই আনন্দের অবস্থা। ইহাই বর্ত্তমান প্রেম।

এ ধর্ম্মের সাধনা আরম্ভ "আত্ম-নিবেদন" হইতে অর্থাৎ "মধুর" প্রেম হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং নাম শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ "আত্মসমর্পণ" মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উহার মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া দেহবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া জীয়ন্তে মরা হইয়া শ্রীগুরুর হইতে হইবে। শ্রীগুরুর ভাবে সর্ব্বদা ভাবিত হইতে হইবে। তবেই প্রেমের সঞ্চার হইবে ও স্ফূরণ হইবে। যে বুঝিয়াছে, ঐ ভাব ধারণ করিয়াছে সে আর নিজেতে নাই। সে একাঙ্গী হইয়া সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্মে মজিয়া আছে। যে মজিয়াছে সেই ইহার

মর্ম্ম জানে। গুরু ছাড়া কিছুই জানে না। গুরুরই হইয়া গিয়াছে। ইহাই অচিন্ত্য ভেদাভেদ—মধুর তত্ত্ব। আলগোছে সাংসারিক কার্য্য করিয়া যাইতেছে। সকলই তাঁহারই ইচ্ছা বা মর্জ্জি বলিয়া জানে। সদাই সন্তোষ। সন্তোষ শরীরের নাম কারণ শরীর। সর্ব্বভূতে ও চারিদিকেই শ্রীগুরুকে দর্শন করে। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিত। সহজ মানুষের ইহাই লক্ষণ। "শ্রীগুরুই সত্য" জানে। সর্ব্ব জীবে তাহার ভালবাসা হইয়াছে অর্থাৎ সমদর্শীন। সর্ব্বজীবে ভালবাসার নাম দয়া। অন্যের আনন্দে আনন্দ অনুভব করার নাম অহিংসা। এই সব জ্ঞান সংস্কারহীন না হলে হয় না। যখন "ভাব স্বভাবে" পরিণত হয় তখন ঐ সকল ভাব আপনিই প্রস্ফুটিত হয় ও গুরুতে জীব স্থিত হয়। ইহাকে তদীয়তা মদীয়তা ভাব বলে। তখন জীব গুরুময় জগৎ সর্ব্বদা দর্শন করে ও নামানন্দে ভাসমান থাকে।

মুখুয্যে মশাইয়ের শ্রীযুক্ত জগৎ সেন মহাশয় নামে একজন মহাসাধক প্রেমিক শিষ্য ছিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। শিষ্যগণ মধ্যে দুইজনার নাম উল্লেখযোগ্য :—

যথা,— (১) শ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়।

(২) শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় পরে "সন্তবাবাজী" নামে খ্যাত হয়েন।

ইহাঁরা প্রতিষ্ঠা মানসে সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া সম্প্রদায়-কর্ত্তা হয়েন। তবে সৎগুরুকে প্রকাশ না করিয়া অন্য মহাপুরুষের নাম করিয়াছেন। কিন্তু শিষ্যদের এই ধর্ম্মেরই সাধন দিয়াছেন। একই বস্তু প্রকারান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন।

জগৎ সেন মহাশয়ের আর একটী প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ইনি সম্প্রতি ১৯৫০ সালে ৯৪ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে শ্রীগুরুপদে লীন হইয়াছেন। তাঁহার নাম ছিল ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়, সাং কলিকাতা, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট। ইনি কলিকাতায় National Medical College স্থাপন করেন। ইনি মহাপ্রেমিক, যোগীপুরুষ, সত্যবাদী, পবিত্র ও সর্ব্বজনপ্রিয় মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন। তাঁহার ভালবাসা পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

বর্ত্তমানে মুখুয্যে মশাইয়ের শিষ্যগণ মধ্যেই এই সত্য স্রোত চলিতেছে। মুখুয্যে মশাইয়ের শিষ্যগণ মধ্যে পাঁচজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন, যথা :—

(১) বালী নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ গাঙ্গুলী মহাশয়— মহাপ্রেমিক ও এই ধর্ম্মের সিদ্ধ পুরুষ।

(২) কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নবীন রায় মহাশয়—
মহাযোগী ও মহাসাধক।

(৩) বালী নিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবতী বাড়ুয্যে মহাশয়—
মহাজ্ঞানী ও মহাসাধক।

(৪) কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত জগৎ সেন মহাশয়—
মহাপ্রেমিক ও মহাসাধক।

(৫) বালী নিবাসী শ্রীযুক্ত বেনী বাড়ুয্যে মহাশয়—
মহাপ্রেমিক ও পরমভক্ত।

ইহাঁরা মহাসাধক ছিলেন। ইহাঁদের গুরুভক্তি অতুলনীয়। সদা গুরুতে ও নামে লীন থাকিতেন। গুরু ছাড়া কিছু জানিতেন না। দেহ বুদ্ধি ছিল না। নিত্য যুক্ত অবস্থা। লেখনীতে ইহাঁদের বিষয় প্রকাশ করা যায় না, তবুও সংক্ষিপ্তভাবে কিঞ্চিৎ লিখিব।

শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ গাঙ্গুলী মহাশয় মুখুয্যে মশাইয়ের অতি প্রিয় প্রেমিক শিষ্য ছিলেন। ইহাঁর নিবাস পুণ্যধাম বালীগ্রামে

ছিল। সাধন সম্বন্ধে বলিতেন যে, "কম বয়সে সাধন না নিলে অর্থাৎ Soilএ moisture (মাটিতে রস) না থাকিলে বীজ Sprout (অঙ্কুরিত) করে না, অর্থাৎ সঞ্চার হয় না। নিষেধ বিধি বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করা চাহি।" ইহাঁর ৩০ বৎসর বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হয়। আর বিবাহ করেন নাই। মুখুয্যে মশাই ইহাঁকে ভীষ্ম বলিতেন। গুরু আজ্ঞা জীয়ন্তে মরা হইয়া প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বেকার Senior Scholar ছিলেন ও অত্যন্ত বিদ্বান ছিলেন। Simla Foreign Departmentএ Head Translator ছিলেন। তিনি আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত জানিতেন। তিনি Queen's Proclamation দিল্লীতে Prince-দের পড়িয়া শুনান। তাঁহার মাসিক বেতন ছিল চারিশত টাকা। অফিসের একজন কেরানীর কোন দোষে চাকরী যায়। কেরানী তাঁহার নিকট আপিলের দরখাস্ত লিখাইয়া দরখাস্তটী উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট পাঠায়। দরখাস্তে ডিপার্টমেণ্টের অনেক অকাট্য দোষ দেখান হইয়াছিল। ঐ সব খবর বড় কর্ম্মচারী ছাড়া আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। সে কারণ উপর হইতে অফিসে ঐ বিষয়ে তদন্তের জন্য দরখাস্ত ফিরিয়া আসে। অফিসের বড় সাহেব দরখাস্ত পড়িয়া বুঝিতে পারেন যে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় ছাড়া এইরূপ ইংরাজী কেহ লিখিতে পারে না। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়কে বড়সাহেব ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই

দরখাস্ত তিনি লিখিয়া দিয়াছেন কি না। তাহাতে তিনি বলেন যে, “হাঁ, আমি লিখিয়া দিয়াছি।” সাহেব বলেন যে, “আপনি অফিসের নানা Secrecy যাহা অন্যের জানার উপায় নাই তাহা কেন লিখিয়াছেন?” তাহাতে তিনি বলেন যে, এসব না দেখাইলে সে লোকটি চাকরী পায় না ও তাহার উপকার হয় না। সাহেব বলেন যে, “আপনি দরখাস্ত লেখা স্বীকার করিবেন না। স্বীকার করিলে আপনার চাকরী যাইতে পারে।” উহাতে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় বলেন যে, “দেখুন, চাকরী গেলে যাহোক একটা চাকরী পাওয়া যাবে, কিন্তু সত্য ভঙ্গ করিলে সত্য আর ফেরৎ আসিবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে মিথ্যা বলিব না। সুতরাং কি করিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব?” সাহেব তাঁহাকে চিনিতেন ও তাঁহার সততা ও মহত্ত্বের জন্য তাঁহাকে সম্মান করিতেন। সাহেব বলিলেন যে, “আপনি বিবেচনা করুন, বড় চাকরী করিতেছেন—পরে হাজার টাকার চেয়ে বেশী বেতন হইতে পারে।” তিন দিন পরে সাহেব যখন লিখিত জবাব চাহিলেন তখন শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় অম্লান বদনে লিখিয়া দিলেন যে তিনি ঐ দরখাস্ত মুসাবিদা করিয়া দিয়াছেন। এই স্বীকারোক্তির জন্য তাঁহার চাকরী গেল ও সিমলা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। ইহাঁকে বালীতে সকলে সত্যের জন্য “যুধিষ্ঠির” বলিতেন। “বালীর যুধিষ্ঠির” বলিলেই উহাঁকে বুঝাইত এবং এখনও অবধি লোকে তাহাই বলে।

চরিত্র দ্বারা মানুষ দেবতা হয়। লোকে "বালীর দেবতা" বলিত ও এখনও তাই বলে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ ধর্ম্মে যাঁহারা আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহারা সদাই "সত্যে" অবস্থিত। মিথ্যা কথা বা মিথ্যা চিন্তা করেন না। পর দার গমন বা পর দার চিন্তা করেন না। মদ্য মাংস খান না এবং কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন না। ইহাদের দ্বেষ হিংসা নাই। সর্ব্ব জীবে দয়া বর্ত্তমান, সদাই সন্তোষ। ইহাঁরা গুরুময় জগত দেখেন ও অনাসক্তভাবে সংসার ধর্ম্ম করেন। এক গুরুই সত্য, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া আনন্দে থাকেন। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় এই শ্রেণীর উচ্চ সাধক ছিলেন। শ্রীগুরু চিন্তা ছাড়া অন্য কোন কার্য্য ছিল না। যাহাই করিতেন তাহা ব্যবহারিক ভাবে। কম বাক্য বলিতেন। অতি দয়ালু ছিলেন ও সর্ব্বদা হাসিমুখ। পরদুঃখে অত্যন্ত কাতর হইতেন। আদর্শ চরিত্র ছিল—যাহাকে দেবচরিত্র বলে।

উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখুয্যে মহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তাঁহার পাতের প্রসাদ খাইতেন। তিনি ভারতবর্ষে ও তিব্বতে যাবতীয় সাধুসঙ্গ করিয়াছিলেন ও সাধুপ্রভৃতিকে দান করিয়া তাঁহার আন্দাজ ১০।১২ লক্ষ টাকা দেনা হয়। পরে ঐ দেনা তিনি পরিশোধ করেন। তিনি অতি ভক্তিমান ও পবিত্র লোক ছিলেন। আত্মপ্রশংসা শুনিতেন না।

তাঁহার কাছে দানের জন্য কেহ আসিলে রিক্তহস্তে ফিরিত না। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "বহু সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গ করিলাম ও বহু সম্প্রদায় ঘুরিলাম কিন্তু একটা মানুষ দেখিলাম না।" তাহাতে একজন মন্তব্য করেন, "কেন, বালীর গাঙ্গুলী মশাই?" ইহাতে তিনি হাসিয়া বলেন, "গাঙ্গুলী মহাশয়ত মানুষ নন, মানুষের উপর—দেবতা। আমি মানুষের কথা বলিতেছিলাম, দেবতার কথা ত বলি নাই।" শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখুয্যে অত্যন্ত Critic ছিলেন কিন্তু তিনি ঐরূপ চমৎকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় সম্বন্ধে আজও সেই কথা সকলে বলে। মানুষ চরিত্রে "দেবতা হয়, অবতার হয়, নির্গুণ ব্রহ্ম হয়, সচল জগন্নাথ হয়।" শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় সর্ব্বদা নির্গুণে বসতি করিতেন। এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "দেখ, এটা **গুণহীন ধর্ম্ম**—গোপিনীদের মত না হ'লে এর অনুভূতি হয় না।"

শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় সিমলা হইতে আসিয়া কিছুদিন পরে তাঁহার ধর্ম্ম-বন্ধু শ্রীযুক্ত ভগবতী বাড়ুয্যে মহাশয়ের সাহায্যে Official Assignee and Trustee অফিসে একটি চাকরী পান ও তথা হইতে বৃদ্ধ বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার দেবচরিত্রের জন্য অফিসের বড় সাহেব অবধি তাঁহাকে দেবতার

ন্যায় সম্ভ্রম ও সম্মান করিতেন। তাঁহার সঙ্গগুণে আমি দেখিয়াছি যে অফিসের বাবু হইতে চাপরাশী অবধি সকলেই বিনীত ও সকলেই মিষ্টভাষী। তিনি যখন সিঁড়ি দিয়া দোতলা হইতে নীচে নামিতেন তখন সকলে এত সম্মান করিত যে তিনি নীচে নামিলে তবে সিঁড়িতে সকলে পা দিত। আমি আরও দেখিয়াছি, যখন তিনি রাস্তা দিয়া হাওড়া ষ্টেসনে বাড়ী যাইবার জন্য আস্তে আস্তে যাইতেন, তখন অনেক ভদ্রলোক দূর হইতে হাত উঠাইয়া প্রণাম করিতেছেন। অথচ তিনি ইহা জানেন না। উহারা জানিত যে 'সচল জগন্নাথ' যাইতেছেন। এই মহাপুরুষকে কেহ কখনও রাগ করিতে দেখে নাই বা কটু কথা বলিতে শুনে নাই। সকলকে ভালবাসিতেন—কাহারও নিন্দা করিতে কেহ শুনে নাই। সমদর্শীন ও অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন।

শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়ের বিবেক এত ছিল যে তিনি যখন চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন তখন অফিসের বড় সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহার কোন উপযুক্ত পুত্রাদি থাকিলে তিনি তাহাকে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় বলেন যে, তাঁহার লেখাপড়া জানা উপযুক্ত দুটী নাতি আছে, কিন্তু তিনি তাহাদের জন্য সুপারিশ কবিতে পারেন না; কারণ তাঁহার কার্য্যের সহিত

টাকাকড়ির সম্বন্ধ আছে। নাতিরা যদিচ সচ্চরিত্র তথাপি এই কার্য্যে তিনি Safely recommend করিতে পারেন নাই। তিনি সুপারিশ করিলেই একজনার চাকরী হইত, কিন্তু তিনি সুপারিশ না করায় চাকরী হইল না। সংসারে অভাব ছিল কিন্তু এমন মহান চরিত্র যে সুপারিশ করিলেন না। ইহার জন্য নাতিরা ক্ষুন্ন হইলেন। তথাপি তিনি বিচলিত হইলেন না। ইহা দেবচরিত্র ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? ইনি সত্য মানুষ ছিলেন। এক ভক্ত বলিয়াছিলেন যে, "ইঁহার জন্য উপরে 'সত্যকৃষ্ণলোক' তৈয়ার হইতেছে।"

·

শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় বলিতেন যে, "এই স্রোতের নিষেধ-বিধি ও আজ্ঞাগুলি প্রতিপালন করিলে লোকে **Perfect Gentleman** বলিবে এবং ইহাই ধর্ম্মপালন জানিবে। সাধন ভজন না করিতে পার অন্ততঃপক্ষে Perfect Gentleman হইয়া সংসারে অবস্থান করিয়া সংসারকে আনন্দপূর্ণ কর।"

·

তাঁহার গুরুভক্তি এতই প্রবল ছিল ও গুরুতে এত আসক্তি ছিল যে তিনি হালিসহর বাটিতে আসিয়া যখন অন্নপ্রসাদ পাইতেন তখন যতই অন্নব্যঞ্জনাদি থাকুক না কেন তাহার এক কণা ফেলিয়া রাখিতেন না। কুমড়া ডাঁটা প্রভৃতি চিবাইয়া সমস্ত

খাইয়া ফেলিতেন। নেহাৎ যেটি চিবাইয়া আর খাওয়া যাইত না তাহা ফেলিতেন।

একদিন শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়, ভগবতী বাড়ুয্যে মহাশয় ও বেনী বাড়ুয্যে মহাশয় বালীধাম হইতে নৌকাযোগে শীতকালে হালিসহরে শ্রীগুরু দর্শন করিবার জন্য রওনা হইয়াছেন। পথি-মধ্যে পরস্পরে বলাবলি করিতেছেন যে আটচালায় গিয়া সাধন ভজনের পর রাত্রে যদি ইলিশমাছ ভাজা সহ খিচুড়ী খাইতে পাওয়া যায় ত বড়ই আনন্দ হয়। আর ইলিশমাছ সহ একটু কাসুন্দির অম্বল হয় ত আরোই ভাল হয়। এই কথা হওয়ার পর সকলে হাসিলেন, কারণ সে সময় ইলিশমাছ পাওয়া যায় না। অতঃপর তাঁহারা হালিসহরে আটচালায় পৌঁছিলেন। সাধন ভজনের পর রাত্রে যখন খাইতে বসিলেন তখন দেখেন যে তাঁহাদের পাতে খিচুড়ী পরিবেশন হইল, তারপর ভাজা ইলিশমাছ আসিল, ও তৎপরে কাসুন্দি দিয়া ইলিশমাছের অম্বল আসিল। তখন তাঁহারা মহা আশ্চর্য্য হইলেন ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া মুখুয্যে মশাইকে বলিলেন যে, "ঠাকুর, আমরা নৌকায় এইরূপ খাওয়া সম্বন্ধে বলাবলি করিতেছিলাম, কিন্তু কি করিয়া এইরূপ হইল এবং ইহা ইলিশমাছের সময় নয়, তবুও কি করিয়া ইলিশমাছ আসিল?" তাহাতে শ্রীশ্রীমুখুয্যে মশাই বলেন যে,

"তোমাদের যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন খিচুড়ীত হবেই, আর অসময় হইলেও ইলিশমাছ ডাঙ্গায় লাফাইয়া এখানে আসিবে।" একদিন এইরূপ আনন্দই গিয়াছে। আজ কোথায় সেই আনন্দের হাট! আজ শ্যাম বিনা বৃন্দাবনে সে আনন্দ নাই। "তোমা ছাড়া হ'য়ে থাকি, তাতে আনন্দ ত পাই না।" সেই দিনের অপেক্ষায় বসিয়া আছি। সদাই মনে হয় "গুরু পার কর এবে এই ভাঙ্গা তরণীখানি।"

শ্রীশ্রীগাঙ্গুলী মহাশয়ের "নামে" এতই আসক্তি ছিল যে এক মুহূর্ত্তও তিনি নাম ছাড়া থাকিতেন না। এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলি, ভক্তেরা আনন্দ পাইবেন। একবার একটি বিবাহ উপলক্ষে বরযাত্রী হইয়া শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় ও ভগবতী বাড়ুয্যে মহাশয় কলিকাতায় আসেন। সঙ্গে অনেক বালীর যুবক আসেন। যে বাড়ীতে বিবাহ হয় সে বাড়ীটি বৃহৎ। বিবাহ সভায় বসিয়া আদর আপ্যায়িত গল্প গুজব হইতেছে। বরকর্ত্তা শ্রীযুক্ত ভগবতীবাবু বসিয়া গল্পাদি করিতেছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় তথায় নাই। যুবকেরা স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য আর একটি ঘরে গিয়া বসিয়াছেন। ঐ ঘরে কিন্তু আলো ছিল না, তবে বসিবার জন্য সতরঞ্চি পাতা ছিল ও তামাকাদি ছিল। একটা মালসায় আগুন ছিল। তখনকার দিনে বিড়ি সিগারেটের চলন

ছিল না ও ছোকরারা গুরুজনের সম্মুখে তামাকাদি খাইত না বা রহস্যাদি করিত না। বালীর যুবকেরা সেই ঘরে গিয়া প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল এবং কোণে কে বসিয়া আছে দেখিয়া তাহাকে তামাক সাজিতে বলিল। তাহারা অন্ধকারে ভাবিল যে তামাক সাজিবার জন্য তামাকের কাছে বোধ হয় একটা লোক বসিয়া আছে। ঐ লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে তামাক সাজিয়া কলিকাটি হুকাসহ একটি যুবককে দিল, কিন্তু তামাক সাজা অভ্যাস নাই কাজেই তামাক ভাল সাজা হয় নাই। তখন যুবক কলিকা ফেরৎ দিয়া বলিল যে, "ভাল করিয়া তামাক সাজ।" পুনরায় তামাক ভাল করিয়া সাজিয়া যুবককে দিলেন, কিন্তু সেবারও যুবক খাইয়া দেখিলেন ভাল করিয়া সাজা হয় নাই। তখন যুবকেরা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা লোক রাখিয়াছে, কে হে তুমি?" এই বলিয়া একজনা তাহার দেশলাই জ্বালিয়া দেখে যে, "বালীর শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়!" যেই দেখা অমনি যত যুবক যে যেদিকে পারে হুড়মুড় করিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। বরকর্ত্তা ভগবতীবাবু বরযাত্রীরা পালায় কেন দেখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন ও তাহাদের নিকট ব্যাপার জানিয়া ঐ অন্ধকার ঘরে গিয়া শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়কে লইয়া আসিলেন ও বলিলেন যে, "খুড়ো, ওখানে কেন ছিলে? আর তামাক সাজিবার কি দরকার ছিল?" তাহাতে শ্রীযুক্ত

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন যে, "তাতে আর কি হইয়াছে, উহারা না জানিয়া তামাক চাহিয়াছিল তাই সাজিয়া দিয়াছিলাম।" এত নামে রুচি ও আনন্দ যে মহাপুরুষ বরযাত্রে গিয়াও **নির্জ্জনে "নাম"** করিতেছেন। তাঁহার এইরূপ সর্ব্ব সমক্ষে নিঃশব্দে সাধন ভজন হইত। মান অপমান সমজ্ঞান ছিল।

শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় অতি গোপনে দান করিতেন। ভিখারীদের অতি মিষ্ট কথার সহিত ভিক্ষা দিতেন। তাহাদের বলিতেন যে, "ভিক্ষা নিবে, বা খাইয়া যাবে?" প্রতিবাসীদের ভিতর কাহারও অসুখ হইলে বড়ই ভাবিত হইতেন ও সর্ব্বদা খবর লইতেন। লোকে বলিত যে তিনি "বালীর জাগ্রত ঠাকুর।" এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলি। একদিন একটি বুড়ী বেলুড় হইতে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়ের আশ্রমে একটি মুটে সহ আসিয়া একটা বড় সিধা তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল। ঐ ডালায় সরু চাউল, ময়দা, ঘি প্রভৃতি দ্রব্য আছে। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় অবাক্ হইয়া বলিলেন যে, "কেন মা, এসব আনিয়াছ? আমি ত লইব না।" তাহাতে সে কাঁদিয়া বলে যে, "ঠাকুর, আমি তোমায় মানিয়াছিলাম। লইতেই হইবে। আমার ছেলের ব্যায়রাম কিছুতেই সারে না, কোন ডাক্তার আরাম করিতে পারিল না, তখন তুমি বালীর 'জাগ্রত দেবতা' বলিয়া তাই তোমায় মানিলাম।

১
২
৩
৪
৫
৬

ছেলে সারিয়া গেল। সেইজন্য মানত আনিয়াছি। তোমাকে নিতে হইবে। না লইলে আমি এখান হইতে যাইব না—মাথা কুটিব।” গাঙ্গুলী মহাশয় “নারায়ণ, নারায়ণ”, বলিয়া বলিলেন যে, “ওসব কথা বলিতে নাই৲ তিনি দয়াময়—পুত্রকে আরাম করিয়াছেন। তা বাপু, না শুন ত সিধা রাখিয়া যাও কিন্তু ওরূপ কার্য্য আর করিও না।” ঐ সিধা তিনি স্পর্শ করিলেন না। ঐ স্থানেই রহিল। যত ভিখারী আসিল তাহাদের দিয়া দিলেন। তিনি এই কার্য্যে দুঃখিত হইয়াছিলেন। আদর্শ চরিত্রের দ্বারা লোকে জাগ্রত দেবতা হয়, ঠাকুর হয়।

বহুদূর হইতে সাধু ও বৈষ্ণব লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। এমন কি অনেকে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার পাতে প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইতেন।

একদিন সকালে ৯টার গাড়ীতে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় বালী হইতে অফিসে যাইবেন বলিয়া বালী রেল ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। গাড়ী আসিতে দেরী আছে দেখিয়া অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময় একটি পরিচিত লোক যাহার নাম ধাম জানেন না তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, “আমার ব্যাগটি রাখুন, আমি এখুনিই আস্‌ছি।” শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, “দেরী

করিবেন না, আমি এখুনিই গাড়ীতে যাবো।" সেই লোকটি দেরী হইবে না বলিয়া চলিয়া গেল। ট্রেন আসিল—চলিয়া গেল, কিন্তু সেই লোকটি আসিল না। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় সেই ব্যাগ লইয়া সমস্ত দিন বসিয়া রহিলেন। সেই লোকটি তাঁহার বাড়ীও চেনে না সে কারণ তিনি বাড়ীও যাইতে পারিলেন না। সন্ধ্যার আগে সেই লোকটা আসিয়া উপস্থিত হইল ও তাঁহাকে ব্যাগ লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "মশাই, দেরী হইয়া গিয়াছে, ক্ষমা করিবেন।" এই বলিয়া ব্যাগ লইয়া চলিয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল যে ব্যাগটি আর পাইবে না কিন্তু তাঁহাকে ব্যাগ লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও ক্ষমা ভিক্ষা করিল। ওদিকে ভগবতীবাবু অফিসে খুড়োকে না দেখিয়া ভয়ানক চিন্তিত হইলেন; কারণ শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় কখনও অফিস কামাই করিতেন না। ভয়ানক কর্ত্তব্যকর্ম্মশীল ছিলেন। ভগবতীবাবু অফিসের ফেরৎ বালী ষ্টেসনে আসিয়া দেখেন যে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় ষ্টেসন হইতে বাড়ী রওনা হইয়াছেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় তখন তিনি সব ইতিহাস বলায় ভগবতীবাবু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় কখনও কাহাকেও কোনরূপ আদেশ বা ফাইফরমাস করিতেন না। কখনও আশীর্ব্বাদ করিতেন না

—খালি উপরে তাকাইতেন। বালীর শ্রীযুক্ত মনমোহন মুখুয্যে তাঁহাকে বড়ই ভক্তি করিতেন। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, "দাদামহাশয়, একটু আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার একটা ভাল চাকরী হয়।" শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় ইহা শুনিয়া হাসিতেন। মনমোহন বাবুকে তিনি ভাল বাসিতেন। মনমোহন বাবু ওকালতি পাশ করিয়া বসিয়াছিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার আশীর্ব্বাদে শ্রীযুক্ত মনমোহনের Legislative Departmentএ চাকরী হইল। তিনি Legislative Departmentএ Secretary হইয়াছিলেন এবং রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন ও পেন্সন লইয়া কলিকাতায় বাড়ী করিয়া বাস করিতেছেন। মহাপুরুষের কৃপায় কি না হয়। তবে আশীর্ব্বাদ ও দয়া লইতে জানা চাই। "অধিকারী" হইলেই সব পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় এই ধর্ম্মের সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। সাধক শ্রীযুক্ত নবীন রায় মহাশয়ের সহিত অভিন্ন-হৃদয় ছিলেন। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় তাঁহার পার্ষদগণকে বলিয়াছিলেন যে, "তোমরা আমাকে মহাপুরুষ বল কিন্তু তোমাদের একদিন মহাপুরুষ দর্শন করাইব।" ইহার পর শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের অনুরোধে একদিন শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় সান্‌কিভাঙ্গায় শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের আশ্রমে আসিয়া সকলকে দর্শন দিয়া ভক্তগণকে পবিত্র করেন।

আমি শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়ের Official Assignee and Trustee of Bengal নামক অফিসে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছি যে টিফিনের সময় সকলে নীচে নামিয়া গিয়াছেন কিন্তু শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় চেয়ারের উপর শ্রীচরণ তুলিয়া বসিয়া আছেন ও নিঃশব্দে নাম স্মরণ করিতেছেন—মহাযোগী মূর্ত্তি—ধ্যানে বসিয়া আছেন। তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তি আর দেখিব না।

একদিন তাঁহার জ্বর হইয়াছিল। যন্ত্রণা হ'লে বলিতেন যে, "কি হবে গা!" আমি বলিলাম, "বড় কষ্ট হচ্ছে কি?" তাহাতে হাসিয়া বলিলেন "এটা দেহের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নয়।" সব বিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয়ের দয়ার শরীর ছিল। কেহ কোথা হইতে আসিলে বুঝিতেন যে জল তৃষ্ণা পাইয়াছে। তাহাদের একটা সন্দেশ ও জল না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। এই সেবাধর্ম্ম তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এই ব্রত দেহরক্ষা সময়েও পালন করিয়াছেন। এরূপ আর দেখিব না। এসব স্মরণ করিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। কি যে আদর ছিল তাহা বলিতে পারি না। দর্শন করিতে গেলে কি করিবেন যে তাহা ঠিক পাইতেন না। এইরূপ সকলকে করিতেন। পশুপক্ষীর উপরও এই ভাব ছিল। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় যে কি বস্তু ছিলেন তাহা তিনিই জানেন। আমি ক্ষুদ্র কীটানুকীট

—কিছুই জানি না, আর জানিবার স্পর্দ্ধাও নাই। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে, এটি গুণহীন ধর্ম্ম—গোপী ধর্ম্ম। গোপী না হ'লে উপলব্ধি হয় না। "আত্মহারা" অবস্থাই গোপী ধর্ম্ম।

তাঁহার শ্রীমুখ হইতে মুখুয্যে মশাই সম্বন্ধে গুটিকতক কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে দিলাম।

সাধন ভজন সম্বন্ধে মুখুয্যে মশাই বলিতেন যে, "গোলামীর চিজ (বস্তু) গোলামীতে পাওয়া যায়।" অর্থাৎ সাধন বস্তু গুরু সেবার দ্বারা পাওয়া যায়। "অহংতে" পাওয়া যায় না। মুখুয্যে মশাই এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছিলেন। যথা—এক বাদ্‌শা ছিলেন। তিনি শুনিলেন যে তাঁহার রাজত্বে 'কেমায়াগীর' (Alchemist) আছে। তাহাদের মধ্যে যে রসায়ন বিদ্যার দ্বারা প্রকৃত স্বর্ণ তৈয়ার করিতে পারে তাহার কাছে ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিবার বাদ্‌শার ইচ্ছা হইল। মন্ত্রীকে বলিলেন যে, সন্ধান করিয়া যে প্রধান কেমায়াগীর তাহাকে লইয়া আইস। মন্ত্রী মুস্কিলে পড়িলেন, কারণ, এই বিদ্যা কেমায়াগীরেরা কাহাকেও শিখায় না ও অতি গোপনভাবে এই কার্য্য করে। ইহাদের

একটা স্বভাব আছে। ইহারা এই রসায়ণ ক্রিয়া দ্বারা স্বাস্থ্য খারাপ হয় বলিয়া অত্যন্ত পান খায়। পান খাইলে নাকি রসায়ন ক্রিয়ার ধোঁয়ায় দেহের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। কেহ কেমায়াগীর বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। মন্ত্রী এক কৌশল করিল। সহরময় প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে কেহ পান বিক্রয় করিবে তাহাকে শূলে দেওয়া হইবে। যে আসল কেমায়াগীর সে অত্যন্ত পান খায় কিন্তু ৭।৮ দিন পান কিনিতে না পারিয়া ও পান না খাইয়া বড়ই কষ্ট হওয়ায় সে গোপনে এক জানাশোনা পানওয়ালার নিকট গিয়া আলাপ করিতে করিতে হাতে গোপনে একটি স্বর্ণ আস্রফি দিয়া চুপি চুপি বলিল, "ভাই একদোনা পান দাও।" সেখানে যে গোপনে গোয়েন্দা পুলিশ বসিয়া আছে তাহা সে জানে না। পুলিশ গোপনে উহা দেখিয়া উহাকে গ্রেপ্তার করিয়া মন্ত্রীর নিকট লইয়া গেল। মন্ত্রী উক্ত কেমায়াগীরকে বাদ্শার কাছে লইয়া গেলেন। কিন্তু সে যে কেমায়াগীর, ঐ বিদ্যা জানে ইহা কিছুতেই স্বীকার করিল না। বাদ্শা শূলে দিবার ভয় দেখাইলেন এবং ঐ বিদ্যা শিখাইয়া দিলে তাহাকে জায়গীর দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তথাপি সে ব্যক্তি কিছুই স্বীকার করিল না। আত্ম গোপন করিল। বাদ্শা তাহাকে কল্য শূলে দিবার হুকুম দিয়া গারদে রাখিতে বলিলেন। গারদে জানালা ছিল না। গারদের উপরদিকে ঘুলঘুলি ছিল

মাত্র। উক্ত ব্যক্তি সমস্ত দিন কিছুই আহার পাইল না। শেষ রাত্রে ঝাড়ুদার মেথর ছাদের উপর ঝাঁট দিতে দিতে গারদের ঘুলঘুলির নিকট আসিয়া বলিল, "এভাই, আমি গরীব ছোট জাত, কোথায় কোন উপকার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কাল তোমায় শূলে দেওয়া হবে শুনিয়া মনে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। যাহা হউক সমস্ত দিন রাত উপবাস করিয়া আছ, আমি তোমার জন্য একটু সরবৎ ও তু দোনা পান আনিয়াছি, খাইয়া ঠাণ্ডা হও। আমার এই রকম করা স্বভাব জানিও।" এই শুনিয়া কেমায়াগীর বলিল, "বলিস্ কি ভাই, তু দোনা পান আনিয়াছিস্। আগে আমায় পান দে, তারপর সরবৎ খাবো।" ঐ মেথর ঝাড়ুদার তাহাকে পান ও সরবৎ খাওয়াইল। কেমায়াগীর সাহেব তু দোনা পান খাইয়া বড়ই খুসী হইল। তখন মেথরকে বলিলেন, "দেখ ভাই, শূলে গেলে আর আমার কোন আপশোষ নাই। তুই আমাকে পান খাওয়াইয়া যা সুখী করিয়াছিস্ তাহা ভুলিতে পারিব না। আমি আসল কেমায়াগীর। তোকে আমি সোণা তৈয়ার করা শিখাইয়া দিয়া সাগরেদ রাখিয়া যাবো, কিন্তু তুই প্রতিজ্ঞা কর এই বিদ্যা কাহাকেও শিখাইবি না।" ঝাড়ুদার ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করার পর উক্ত কেমায়াগীর উহাকে ঘুলঘুলির ভিতর হইতে ঐ বিদ্যা গোপনে শিখাইয়া দিল। ঝাড়ুদার তাহাকে গুরু স্বীকার করিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে

বাদসার নিকট পুনরায় কেমায়াগীরকে মন্ত্রী উপস্থিত করিল। বাদসা উহাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু কেমায়াগীর কিছুই স্বীকার করিল না। বাদসা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শূলে দিবার জন্য লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। প্রহরী অর্দ্ধপথ লইয়া যাইবার পর পুনরায় মন্ত্রী তাহাকে ফিরাইয়া আনেন কিন্তু তথাপি সে যে কেমায়াগীর ইহা বলিতে বা ঐ বিদ্যা শিখাইতে অস্বীকার করিল। তখন বাদসা মন্ত্রীকে সবাইয়া দিয়া কেমায়াগীরকে বলিলেন, "কাল রাত্রে তুমি ঝাড়ুদারকে ঐ বিদ্যা শিখাইয়া দিয়াছ মনে নাই?" তাহাতে উক্ত ব্যক্তি বলিল যে ঐ সব মিথ্যা কথা। তখন বাদসা বলিলেন, "আমার মুখ ভাল করিয়া দেখ দেখি।" কেমায়াগীর বাদসার মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া বুঝিল যে বাদ্‌সাই ঝাড়ুদার সাজিয়া গত রাত্রে তাহাকে পান সরবৎ খাওয়াইয়া খুসী করিয়া বিদ্যা আদায় করিয়াছে। কেমায়াগীর সাহেব দুঃখিত হইলেন না, হাসিয়া বলিলেন "ঠিক হুয়া, বাদ্‌সাইসে নাহি মিলা, গোলামীকা চিজ গোলামীসে মিলা। যবতক্ বাদ্‌সা থা নাহি মিলা, যব গোলামী কিয়া তব মিলা।" দেহবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া গুরুতে মরিয়া না থাকিলে আত্মহারা না হইলে সাধন বস্তু লাভ হয় না। গুরুর অনুগত হওয়া চাই।

আর একটি মুখুয্যে মশাইয়ের গল্প মনে পড়িল। তিনি বলিতেন যে ধর্ম্ম কার্য্যের বাহ্যিক অনুষ্ঠানসকল "বিড়াল বাঁধার মত" হইয়াছে। গল্পটি এই—একজন বড়মানুষ ছিলেন। তাঁহার বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত। কাজ কর্ম্মের সময় বাড়ীর বিড়ালটাকে যদি কিছু খায় বলিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। কিছু দিন পর কর্ত্তার মৃত্যু হইল। বিড়ালটা কর্ত্তার মৃত্যুর অল্প দিন আগে মরিয়া যায়। ছেলেরা খুব ধুমধাম করিয়া কর্ত্তার শ্রাদ্ধের আয়োজন করিল। শ্রাদ্ধের সময় ছেলেরা কোনরূপ ত্রুটি হইয়াছে কিনা সকলকে দেখিতে বলিলেন। সকলে দেখিল যে কোন ত্রুটিই হয় নাই। কেবল একটি ত্রুটী হইয়াছে—কর্ত্তা কাজের সময় একটি বিড়াল বাঁধিয়া রাখিতেন, তাহা বাঁধা হয় নাই। তখন ছেলেরা বলিলেন, "ঠিক তো।" কিন্তু কি কারণে কর্ত্তা বিড়াল বাঁধিতেন তাহা কেহই জানিত না। ছেলেদের আদেশে একটা বিড়াল ধরিয়া আনিয়া কাজ না হওয়া অবধি বাঁধিয়া রাখা হইল ও কাজের পর বিড়ালটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই 'বিড়াল বাধার' মত কোন কারণ অনুসন্ধান না করিয়া বাহ্যিক অনেক অনুষ্ঠান মিছামিছি করা হয় ও সেই সব অনুষ্ঠান কালে বিধি হইয়া দাঁড়ায়।

মুখুয্যে মশাই গৃহীদের তিনটি নিষেধ করিতেন, যথা—

(১) পোড়ান (বাজি পোড়ান, ইহাতে প্রায় বিপদ হয়);

(২) উড়ান (ঘুড়ি উড়ান, বৃথা সময় যায় ও বড় নেশা);
(৩) ধরান (ছিপে বঁড়সী দ্বারা মাছ ধরা, বড়ই নিষ্ঠুরের কার্য্য।)

বালীর শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় জুতা পায়ে দিতেন না। বিনা জুতায় কলিকাতার অফিসে যাইতেন। তাঁহার অফিসে পেন্সন প্রথা ছিল না। কিন্তু সাহেব তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করিতেন যে তাঁহার জন্য পেন্সন্ মঞ্জুর করাইয়াছিলেন। সত্য বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে তাঁহাকে কখনও বিচ্যুত হইতে কেহ দেখে নাই। একদিন তিনি বৈকালে গঙ্গার ধারে গিয়াছেন তথায় একটি অপরিচিত লোককে কতকগুলি তক্তা নৌকা হইতে নামাইতে দেখিলেন। ঐ ব্যক্তি তক্তাগুলি তীরে নামাইয়া শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়কে বলিলেন, "তক্তাগুলি দেখিবেন—আমি এখুনি আস্‌ছি।" সে ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি আসিল না। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়, কি করেন, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া গঙ্গাতীরে তক্তা চৌকি দিলেন। পরদিন সে ব্যক্তি প্রাতে আসিয়া দেখে যে তিনি তক্তার নিকট বসিয়া আছেন। সে ব্যক্তি মহা লজ্জিত হইয়া ক্ষমা চাহে। তখন শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় বাড়ী আসেন। তিনি এরূপ সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। এ পবিত্র আত্মার বিষয় আমি কি জানি যে লিখিব?

তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে মুখুয্যে মশাই বলিতেন—

(১) এক গুরু সব মাই।
(২) এক গঙ্গা সব খাই।
(৩) সব ঘড়ি ঘরকি, এক ঘড়ি হরকি।
(৪) কলে কৌশলে খুল্‌তে পারলে,
অমূল্য নিধি কতই পাবি।

শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় বালীধামের তাঁহার দরদী ও মর্ম্মী গুরুভাই শ্রীযুক্ত ভগবতী বাড়ুয্যে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বাড়ুয্যে মহাশয়ের অনুরোধে রোগশয্যায় নাম শ্রবণ করান। এ পুত্রটীর তখন ১৮।১৯ বৎসর বয়স ছিল। পুত্রটী নামগ্রহণের তিন দিন পরে শ্রীগুরুর সম্মুখে দেহরক্ষা করেন। এরূপ ভাগ্য বিরল। মাকে কাঁদিতে দেখিয়া পুত্রটী বলেন যে, "মা কাঁদিও না। আজ আমার কত ভাগ্য, ঠাকুরের সাম্‌নে দেহরক্ষা করিয়া সেই আনন্দধামে যাইতেছি। এ কেবল কাপড় ছাড়া মাত্র।"

মুখুয্যে মশাই বলিতেন যে, "পুত্র ও শিষ্য দুই ভাল জিনিষ, কিন্তু শিষ্য পুত্র অপেক্ষাও উত্তম পদার্থ কারণ পুত্রের উৎপত্তি কুৎসিৎ স্থান হইতে আর শিষ্যের উৎপত্তি গুরুর শ্রীমুখ হইতে, সেই জন্য শিষ্যই শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র।" গুরু ও শিষ্য এক দেহ ও এক আত্মা।

মুখুয্যে মশাই বলিতেন, "বুজরুকি অর্থাৎ গুণকর্ম্ম করিতে নাই। সংসার তাঁহার, সুতরাং সংসারের জন্য প্রার্থনা করিবে না, অন্যের জন্য ঠাকুরকে জানাতে পার।" একবার তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণসখার (বয়স ১৩ বৎসর) পেটে অত্যন্ত বেদনা ধরায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। মুখুয্যে মশাই তথায় উপস্থিত আছেন। এমন সময় তাঁহার পরম বন্ধু ও প্রিয় শিষ্য গোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় মুখুয্যে মশাইকে দর্শন করিতে আসিলেন। তিনি কৃষ্ণসখার যন্ত্রণা দেখিয়া মুখুয্যে মশাইকে বলেন, "মনে করিলেই ত উহার যন্ত্রণাটা লাঘব করিতে পার, তা নয়, চুপ করিয়া দেখিতেছ।" মুখুয্যে মশাই হাসিলেন ও বলিলেন, "ও সব করিতে নাই।" তখন গোবিন্দ গুপ্ত দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণসখাকে বলিলেন, "চিৎ হইয়া শোও।" চিৎ হইয়া শুইলে গুপ্ত মহাশয় কৃষ্ণসখার নাভির উপর নিজ পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলী স্পর্শ করাইয়া কৃষ্ণসখাকে বলিলেন, "বল্‌ ভাল হইয়া গিয়াছে।" কৃষ্ণসখা বলিলেন, "ভাল হইয়া গিয়াছে।" গুপ্ত মহাশয় কৃষ্ণসখাকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। কৃষ্ণসখা উঠিবামাত্র ঐ যন্ত্রণা আরাম হইয়া গেল।

এই গোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় সম্বন্ধে একটী গল্প বলি। ইহার পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত যিনি বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ছিলেন ও পরে কটক Ravenshaw Collegeএর অধ্যক্ষ হয়েন। এই

বিপিন গুপ্ত মহাশয় যখন ক্ষুদ্র শিশু, তখন বাড়ীর পিছনে খিড়কির পুকুরে খেলা করিতে করিতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া ডুবিয়া যান, কিন্তু কতকগুলি পোষা হাঁস ঐ পুকুরে সাঁতার কাটিতেছিল। তাহারা ঐ শিশুটিকে সকলে মিলিয়া মাথায় করিয়া ভাসাইয়া রাখিয়া দেয়—ডুবিতে দেয় না। এই দেখিয়া একজন প্রতিবেশী যিনি পুকুরঘাটে আসেন তিনি শিশু বিপিন গুপ্তকে ইহাদের নিকট হইতে টানিয়া জীবিত অবস্থায় উপরে তোলেন। এই ঘটনা অনেকে দেখেন। গুপ্ত মহাশয়ের শ্রীগুরুতে অসাধারণ বিশ্বাস ছিল। গুরুময় জগৎ দেখিতেন। গোপীভাব ছিল—ইঁহার এত গুরু বিশ্বাস ছিল যে, "কল্যকার জন্য ভাবনা ছিল না।" সংসার গুরুর জানিতেন। "ফকিরি নহেত সামান্য, হতে হবে দীন দৈন্য।"

হালিসহরের লোকেরা মুখুয্যে মশাইকে এত মান্য ও শ্রদ্ধা করিতেন যে যাহার বাগানে কোন নূতন জিনিষ হইত বা বাজারে কোন ভাল দ্রব্য আসিত তাহা মুখুয্যে মশাইকে না দিয়া কেহ খাইত না।

শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ গাঙ্গুলী মহাশয় ১৩১৫ সালে রাত্রি ১০॥টার সময় ৺দুর্গাপূজার পর কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে ৩০শে আশ্বিন তারিখে

রাখীবন্ধনের দিন যখন চারিদিকে হরিধ্বনি হইতেছে তখন ৪।৫ দিনের জ্বর ভোগ করিয়া তাঁহার ভাগবতী তনুখানি রক্ষা করেন। সজ্ঞানে যুক্ত অবস্থায় দেহরক্ষা করেন ও ভিতর ভিতর অনবরত নাম স্মরণ করিতেছেন দেখা যায়। দেহরক্ষার পূর্ব্বেও জীবে দয়া দৃষ্ট হইয়াছে। যে দেখিতে গিয়াছে তাহাকেই আদর করিয়াছেন। এ হতভাগ্য শেষ দর্শন করিতে যায়। মহাপুরুষ অধমকে দেখিয়া বলেন, "ঘরে যাও", অর্থাৎ অনেক দূর হইতে আসিতেছি সে কারণে জল খাইতে যাইতে বলিলেন। দেহরক্ষার আগে "এ দয়া কে করিতে পারে?" তাঁহার বিশ্বপ্রেম ছিল। সকলই অলৌকিক ছিল। প্রেমেগড়া তনু ছিল। পশুপক্ষী তাহাকে ভালবাসিত। মহাশ্মশান বালীর 'পাঠক ঘাটায়' পবিত্র দেহ দাহ করা হয়। বালী ও উত্তরপাড়া হইতে অসংখ্য লোক দর্শন করিতে আসেন। সকলে চিতা স্পর্শ করিয়া ধন্য হন। দেহে অগ্নি সংযোগ হইলে মস্তক হইতে একটি উজ্জ্বল লালবর্ণ জ্যোতি অনেকক্ষণ ধরিয়া বহির্গত হইয়াছিল। ইনি ৮৫ বৎসর বয়সে দেহ রাখেন।

শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়ের একটি প্রিয় পারিষদ ও ভক্ত ছিল, নাম শ্রীঅক্ষয় কুমার দে। ইনি নিত্য পারিষদ ছিলেন। ইনি তাঁহার নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন। ইহাঁকে গাঙ্গুলী মহাশয় বড়ই ভালবাসিতেন। ইহাঁর ভক্তি ও সেবা অতুলনীয় ছিল। গাঙ্গুলী

মহাশয় যে সিঁড়ি দিয়া ঘরে উঠিতেন, ইনি সে সিঁড়ি ব্যবহার করিতেন না। অলক্ষ্যে সেবা করিতেন। গাঙ্গুলী মহাশয়ের অসুখ সময়ে অক্ষয় যে কি সেবা করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। শেষ অবধি অক্ষয় সেবা করিয়্যছিল। অক্ষয় সেবায় সিদ্ধ ছিল। অক্ষয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, "একদিন অক্ষয় ভাগবৎ পড়িতেছেন। গাঙ্গুলী মহাশয় তখন পিঁড়িতে বসিয়া আছেন ও মনে মনে নামে যুক্ত আছেন। পড়ার জন্য গাঙ্গুলী মহাশয়ের নামে ব্যাঘাত হইতেছে, সে কারণ গাঙ্গুলী মহাশয় কিছুক্ষণ পরে অক্ষয়কে বলিলেন, 'অক্ষয় চুপি চুপি পড়।' গাঙ্গুলী মহাশয়েব এরূপভাবে দিবারাত্রি নাম চলিত।" বহিরঙ্গ শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে ভাগবৎ তিনি না শুনিয়া নামে যুক্ত থাকিতেন। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় কখনও কাহারও সাহায্য লইতেন না। তাঁহার গোপন দান ছিল। কেহ দানের জন্য যাইলে ফিরিয়া আসিত না। এই মহাভাগ্যবান অক্ষয় দেহ রাখিয়াছেন ও গুরুপদে লীন হইয়াছেন। ইনি সেবায় সিদ্ধ ছিলেন।

শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় অনাসক্ত ভাবে সংসার করিতে বলিতেন। যেমন বাজীকবে হাঁড়ি মাথায় করিয়া বাঁশবাজী করিয়া নীচে নামিয়া আসিল. হাঁড়ি পড়িল না কিন্তু তাহার লক্ষ্য ছিল হাঁড়ির উপর, অথচ বাঁশের খেলা করিয়াছে। এই বাঁশবাজীর

ন্যায় সংসার করিবে। লক্ষ্য নামের প্রতি ও শ্রীগুরুর প্রতি সর্ব্বদা রাখিবে। মনে মনে জানিবে শ্রীগুরুই সত্য আর সব ব্যবহারিক। নামই মুখ্য বস্তু। বহির্ভাগে পূর গৃহস্থ কিন্তু মনে মনে চূর ফকির হইবে।

শ্রীযুক্ত মুখুয্যে মহাশয়ের হালিসহর নিবাসী ৺ব্রজনাথ চাটুজ্যে মহাশয় নামক একজন মহাতেজস্বী শিষ্য ছিলেন। ইনি নাম লইবার পর সন্ন্যাসী হইয়া যান। কলিকাতার মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি মহর্ষির নিকট সময়ে সময়ে থাকিতেন। একদিন মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "চাটুয্যে মহাশয়, ঈশ্বর দর্শন কতদিনে হয়?" তাহাতে চাটুয্যে মহাশয় বলেন, "যদি তাঁর দয়া হয় ত **এক লহমায়** দর্শন হয়, নচেৎ কোটি কল্পেও দর্শন হয় না।" একদিন বৈশাখ মাসে অত্যন্ত গরম। মহর্ষি বলেন, "চাটুয্যে মহাশয়, এত গরম, কিন্তু আপনিত যোগী পুরুষ, ঠাণ্ডা করিয়া দেন ত দেখি।" চাটুয্যে মহাশয় হাসিলেন। তখন সন্ধ্যা বেলা। খানিক পরে পাথুরিয়াহাটায় একটা মেঘ উঠিয়া খুব এক পশলা

বৃষ্টি হইয়া গেল ও মহর্ষিকে ঠাণ্ডা বাতাসের জন্য শাল গায়ে দিতে হইল। এই বৃষ্টি কেবলমাত্র পাথুরিয়াহাটায় হইয়াছিল। মহর্ষি এই দেখিয়া স্তম্ভিত হয়েন। মহর্ষি তাঁহাকে গুরুর মত শ্রদ্ধা করিতেন।

এই চাটুয্যে মহাশয় একদিন প্রখর রৌদ্রে দ্বিপ্রহর বেলায় একটা মাঠ পার হইয়া কোন গ্রামে যাইতেছিলেন। সঙ্গে একটী লোক ছিল। রৌদ্রে অত্যন্ত কষ্ট হওয়ায় হুঙ্কার দেন ও সূর্য্যের দিকে তাকান। তারপরই একটী মেঘ দেখা গেল ও সূর্য্য ঢাকা পড়িয়া গেলেন। যতক্ষণ না অন্য গ্রামে পৌছিলেন ততক্ষণ মেঘটী ছিল। চাটুয্যে মহাশয়ের আর কষ্ট হইল না। সঙ্গের লোকটি এই কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই চাটুয্যে মহাশয় হালিসহরে দেহ রাখেন। ইঁহার সাত দিন নাড়ি ছিল না। অথচ তক্তাপোষের উপর বেশ বসিয়া আছেন ও তামাক খাইতেছেন এবং সকলের সহিত কথা কহিতেছেন। সাতদিন পরে প্রাতে গৃহিনীকে বলিলেন, "তোমরা খাইয়া লও, আজ আমি দেহ রাখিব।" বেলা প্রায় ৯।১০টার সময় পুত্রকে বলিলেন যে, "আমাকে তক্তাপোষ সহ গঙ্গাতীরে সিদ্ধেশ্বরীতলায় লইয়া চল।" সকলে গঙ্গাতীরে লইয়া যান। বহুলোক দেখিতে আসে। তক্তাপোষে বসিয়া "গুরু গুরু" বলিয়া দেহ রক্ষা করেন। দেহ রাখিবার আগে পুত্রকে বলেন, "আমায়

ধর এইবার।” এই স্রোতের ভক্তগণের মৃত্যু অর্থাৎ “দেহরক্ষা” এইরূপ সহজভাবেই হয়।

মুখুয্যে মশাই বলিতেন যে এ ধর্ম্মে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের অন্নকষ্ট নাই ও অপঘাত মৃত্যু নাই। তিনি বিবাহিত না হইলে নাম দিতেন না। কারণ ফকিরঠাকুর বলিয়াছিলেন, “এবার সংসার রাখিয়া ধর্ম্ম।” সংসার না থাকিলে ভগবজ্জনের সেবা হয় না। সকলেই সরল বিশ্বাসী ছিলেন ও সদাই হাসিমুখ। অসন্তোষ ছিল না। গুরুভাইদের মধ্যে কামিনী কাঞ্চনের সম্পর্ক ছিল না।

মুখুয্যে মশাইয়ের বালীনিবাসী শ্রীগুরুগত প্রাণ প্রিয় শিষ্য ভগবতী বাড়ুয্যে মহাশয় বলিতেন, “মৃত্যু হ’বার পর কি হইবে জানিবার কোন দরকার নাই। কারণ আমাদের এই জন্মইত সব প্রাপ্তি হইল। তাঁহাকে শ্রীগুরু রূপে বর্ত্তমান জন্মেই পাইলাম সুতরাং পরজন্ম ভাবিবার দরকার নাই।” জন্ম আর হবে না কারণ গুরুতে সদা যুক্ত। শ্রীযুক্ত ভগবতী বাড়ুয্যে মহাশয় বলিতেন, “ঠাকুরের জনকে রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা বলিতে দোষ নাই, কারণ আনুগত্য চাই।” ইঁহার যখন সঞ্চার হইত তখন গায়ের লোমগুলি সব দাঁড়াইয়া উঠিত। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইঁহার ও শ্রীযুক্ত

গাঙ্গুলী মহাশয়ের সঙ্গ করিতে বালীতে ইঁহার বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে আসিতেন ও আহার করিয়া যাইতেন।

কাঁচরাপাড়ার ঠাকুর বাড়ীকে ভক্তেরা "বড় বাড়ী" বলিতেন। কোন ঠাকুরের জন বড় বাড়ীতে ঢুকিবার সময় একটী সাঙ্কেতিক বাক্য ব্যবহার করিতেন, যথা,—"পিসীমা আমি অমুক।" তাহা হইলেই বুঝা গেল ঠাকুরের জন আসিতেছেন। এই পিসীমার নাম ছিল "পদ্ম"। ইনি ৺কানাই ঘোষ মহাশয়ের কন্যা ছিলেন। ইনি সাধন ভজনে চূড়ান্ত ছিলেন। ইঁহার সেবাই ছিল পরম ধর্ম্ম। রাত্রি ২টা অবধি বহু লোকের রান্না রাঁধিতেন ও পরিবেশন করিতেন। বড় বড় হাঁড়ি অনেকগুলি এক সঙ্গে চাপাইতেন। ভাতের ফ্যান রাস্তা অবধি যাইত। একজন "বামন দাদা" বলিয়া সাধক ছিলেন। তাঁহার খুব সঞ্চার হইত। ইনি মেয়েদের মত কথা কহিতেন ও তাঁহার মাথায় বড় বড় চুল ছিল। ইনিও রাঁধিতেন ও ভগবজ্জন শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিবেশন করিতেন। এ বাড়ীতে ৺দোলের সময় কলাইয়ের ডাল ও উচ্ছে দিয়া সজিনা ডাটা সহ চাঁপানোটে শাকের তরকারী অতি চমৎকার রান্না হইত। এখনও সেইরূপ রান্না হয়।

৺ঘোষ মহাশয়ের পুত্র কৃষ্ণঘোষ মহাশয়ের দেহ রক্ষার পর কাঁচড়াপাড়ার মহাসাধক ও যোগী পুরুষ শ্রীযুক্ত নবীন রায় মহাশয়ের উপর উক্ত বড় বাড়ীর ৺দোলের ভার পড়িল। তিনি অনুমতি অনুযায়ী দোলের খরচ ঠাকুরের জন হইতে সংগ্রহ করিয়া দোলের সময় সেবাব্রত কার্য্য সম্পাদন করিতেন অর্থাৎ যে সকল ভক্ত, সাধু, বৈষ্ণব, কাঙ্গাল প্রভৃতি দোলের সময় ঐ বাড়ীতে আসিতেন তাঁহাদের অন্নসেবা করাইতেন। হাজার হাজার লোক আসিতেন ও পরিতোষ সহকারে প্রসাদ পাইতেন। কাঁচরাপাড়া ঠাকুর বাড়ীতে মহাপ্রভু ফকির বেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "দোলের দিনে আমি বৃন্দাবনে থাকিব না, নবদ্বীপে থাকিব না, নীলাচলে থাকিব না, এইখানেই উপস্থিত থাকিব।" যাঁহারা এই সত্য ধর্ম্ম সত্য দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ইহার অনুভূতি পাইবেন। এখনও পর্য্যন্ত সমস্ত ভক্তরা মহাপ্রসাদ জ্ঞানে অন্ন গ্রহণ করেন। কেহ পাতে কিছুই রাখেন না। কিছু অবশিষ্ট থাকিলে ভক্তিপূর্ব্বক বাঁধিয়া মাথায় করিয়া লইয়া যান। সকলের এমন কি বহিরঙ্গ লোকের বিশ্বাস যে, এই প্রসাদ খাইলে সর্ব্বরোগ ও ভবরোগ ভাল হইবে। এ কারণ ৺দোলের সময় বহু লোক দূরদেশ হইতে প্রসাদ পাইবার জন্য আসেন। ঘোষপাড়ায় যে সকল ভক্ত ও যাত্রী দোলের সময় যান তাঁহারা পথিমধ্যে এইখানে প্রসাদ পাইয়া গিয়া থাকেন। হালিসহরের

মুখুয্যে মশাই টাকার বদলে একগাড়ী সজনে ডাঁটা ও তরিতরকারী পাঠাইয়া দিতেন ও বলিতেন যে, "ঠাকুরকে জানাইয়াছি যেন সেবা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হউক ও ভক্তেরা সাহায্য করুক।" তাঁহার টাকা দিবার ক্ষমতা ছিল না। এই সেবাব্রত কার্য্য ভগবজ্জনের সাহায্যে আজ অবধি সমভাবে চলিতেছে। এখানে সেবাকার্য্যের জন্য লক্ষ টাকা দিলেও সামান্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভগবজ্জনেরা মনে করেন। ঠাকুরের হুকুমে এই সেবাকার্য্য কাঁচড়াপাড়া ঠাকুরবাড়ীতে আজ অবধি চলিতেছে। ৺কৃষ্ণ ঘোষের পুত্র রাজেন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপযুক্ত হইয়া শ্রীনবীন রায় মহাশয় হইতে সদাব্রত ভার গ্রহণ করেন।

এই মহাসাধক ও যোগীপুরুষ শ্রীযুক্ত নবীন রায় মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু পুণ্য কথা লিখিব। তাঁহার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, তবে অল্পদিন মহাভাগ্যবলে তাঁহার সঙ্গ করিয়াছিলাম, সেই সময়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা জ্ঞাত হইয়াছিলাম তাহাই বর্ণনা করিব। তাঁহার ভক্তগণ ইহাতে অবশ্য আনন্দ পাইবেন আশা করি। আমার সাধ্য কি সমস্ত লিখিতে পারি। ইনি আমার শিক্ষাগুরু ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নবীন মুন্সি মহাশয় "রায় মহাশয়" বলিয়াই খ্যাত। ইঁহার নিবাস ছিল কাঁচড়াপাড়া গ্রামে। ইনি শিবচতুর্দ্দশীর দিন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আজানুলম্বিত বাহু ও দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন। ইনি E. I. Railwayর Chief Clerk ছিলেন। ইনি ই, আই, রেলওয়ের বহু উন্নতিসাধন করিয়াছেন! বড় চাকরি ছিল। উপরের সাহেবেরা ইঁহাকে সততার জন্য বড়ই খাতির করিতেন। ইনি দয়াপরবশ হইয়া বহু লোকের চাকরি দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন। অনেক ভগবজ্জনকেও চাকরি দিয়াছেন। ইনি যখন ইংরাজী ১৮৫৩ সালে চাকরি হইতে অবসর লয়েন তখন সকল সাহেব ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা একটী সভা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া একটী ছাপান অভিনন্দন পত্র তাঁহাকে দেন। উক্ত ছাপান পত্রের মধ্যে এক স্থানে লেখা আছে, যথা— "......You were content and not ambitious......" তাঁহারা তাঁহাকে একটী স্বর্ণ ঘড়ি স্বর্ণ চেন সহ উপহার দেন।

ইনি চাকরী হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া ভবানীচরণ দত্ত লেনে বাড়ী তৈয়ারী করিয়া বাস করেন। উঁহার একমাত্র পুত্রের নাম ছিল "হারাধন"। হারাণ বলিয়া ডাকিতেন। উক্ত পুত্র ২২ বৎসর বয়সে M. A. পরীক্ষায় Honoursএর সহিত খুব ভাল করিয়া পাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত পুত্রের গুণে সন্তুষ্ট হইয়া নিজ

Metropolitan Institutionএ তাহাকে প্রফেসারী পদে ৩০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উক্ত হারাধন ১৭ দিন প্রফেসারী করিয়া একাদনের জ্বরে দুর্ভাগ্যবশতঃ দেহত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার পড়ান পদ্ধতিতে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও দেবোপম চরিত্রে এত মোহিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোক করিয়াছিলেন। এই পুত্রের মৃত্যুতে রায় মহাশয় বাহ্যিক কোন শোক করেন নাই—স্থিরভাবে সৎকারাদি সব কার্য্য করেন। উহাঁর পারিষদেরা বড়ই ব্যথিত হইয়া দিনকতক উঁহার নিকট আসেন নাই, কিন্তু রায় মহাশয় নিজে সকলের বাড়ীতে গিয়া ডাকিয়া লইয়া আসেন। এইরূপ মনের দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মহাপুরুষ ছিলেন।

ইঁহার স্ত্রী বড় লোকের মেয়ে ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর কখনও বাপের বাড়ী যান নাই। আদর্শ স্ত্রী ছিলেন। স্বামী সেবা ও ভগবজ্জনের জন্য রন্ধনাদি করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল এবং ইহাতেই তাঁহার আনন্দ ছিল। তিনি কোথাও নিমন্ত্রণ যাইতেন না কারণ রায় মহাশয় কোথাও নিমন্ত্রণে যাইতেন না। রায় মহাশয়ের এক ভক্তিমতী কন্যা ছিল, নাম "কিরণ"। কিরণ এই স্রোতের সকলকে জানিতেন ও ধরণ ধারণ ও পদ্ধতি সব জানিতেন কিন্তু তিনি ধর্ম্মগ্রহণ করেন নাই। ৺দোলের সময়ের সেবাব্রত জন্য যে যাহা দিত তাহা কিরণ গ্রহণ করিয়া

রায় মহাশয়কে দিতেন। রায় মহাশয় সমস্ত সংগ্রহ করিয়া কাঁচরাপাড়ার ঠাকুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতেন। ঠাকুরের জন কেহ গেলে, না জানা থাকিলেও, কিরণ অভ্যর্থনা করিয়া জল খাওয়াইতেন।

রায় মহাশয় চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর প্রতিজ্ঞা করেন যে—(১) ধার করিবেন না; (২) যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া কিছু দেয় ত লইবেন, কিন্তু চুরির পয়সা লইবেন না; (৩) মিথ্যা কার্য্য করিবেন না—সব সত্যভাব: (৪) কাগজ কলম ধরিবেন না এবং কাহাকেও পত্র লিখিবেন না; (৫) ভগবৎ কথা ছাড়া অন্য কথা বলিবেন না বা শুনিবেন না। (৬) টাকা হাতে করিবেন না; (৭) সংসারের কোন কার্য্য করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞাগুলি দেহরক্ষা করা অবধি প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা কহিলে বড়ই আনন্দিত হইতেন।

রায় মহাশয় মাথায় বিষ্ণু তৈল মাখিতেন। আহার করিয়া ডাবের জল খাইতেন। জল খাইতেন না। দুধ ক্ষীর করিয়া খাইতেন। ঘি একপোয়া প্রত্যহ খাইতেন। রাত্রে লুচি ও বেদানা খাইতেন। প্রাতে দুই মাইল হাঁটিয়া আসিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন। বৈকালেও আবার গোলদিঘীর চারিদিকে বেড়াইতেন।

মহাসাধক
শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

আমি উঁহার সঙ্গে গোলদিঘীতে বেড়াইতাম ও শ্রীমুখের মধুর উপদেশ ও বাণী শুনিতাম। তিনি প্রায়ই বলিতেন "তাঁর মর্জ্জি" অর্থাৎ শ্রীগুরুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।

"রায় মহাশয় ৺কানাই ঘোষ মহাশয়ের পত্নীর নিকট হইতে নাম শ্রবণ করেন। ঘোষ মহাশয়ের পত্নীকে ভক্তেরা "মা" বলিতেন। নাম দিবার পর মা বলিয়া দেন যে, "হালিসহরে মুখুয্যে মশাইয়ের নিকট গিয়া সাধন লও।" এই শুনিয়া রায় মহাশয় মাকে বলেন যে মুখুয্যে মশাইয়ের বাড়ী হালিসহরের কোন্ স্থানে। তাহাতে মা উত্তর দেন, "যেখানে দেখিবে চালে খড় নাই, দেয়ালে মাটি নাই কিন্তু অনেক লোক খাইতেছে বা এঁটো পাতা পড়িয়া আছে, সেই বাড়ী জানিবে মুখুয্যে মশাইয়ের।" এই শুনিয়া রায় মহাশয় সন্ধান করিয়া হালিসহরে মুখুয্যে মশাইয়ের বাড়ীতে আসেন। তখন মুখুয্যে মশাই বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপে নামাবলী গায়ে বসিয়া আছেন। রায় মহাশয়কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কোথা হইতে আসিতেছ?" রায় মহাশয় কাঁচরাপাড়া বাড়ী হইতে আসিতেছেন বলিলেন। মুখুয্যে মশাই তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া একটী ছোট মাদুর পাতিয়া বসিলেন। বসিয়াই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নাম স্মরণ করিলেন। তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, "নাম

স্মরণ করিবামাত্র আমার সঞ্চার হইল। আমাতে আর আমি নাই। একেবারে আনন্দ ধামে চলে গেছি।" রায় মহাশয় অনেকক্ষণ পরে চক্ষু চাহিলে মুখুয্যে মশাই হাসিয়া বলিলেন যে, "সঞ্চার হইয়াছে ত?" রায় মহাশয় "হ্যাঁ" বলিয়া প্রণাম করিলেন। ইহাকেই বলে "দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি।" আমি রায় মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই লিখিলাম।

রায় মহাশয় বলিতেন, "আমার 'মুখ (দীক্ষা)' যদিচ কাঁচরাপাড়া হইতে কিন্তু 'স্ফুরণ' মুখুয্যে মশাইয়ের নিকট হইতে।" মুখুয্যে মশাইয়ের নামে গলিয়া যাইতেন। আমার মনে আছে, একদিন রায় মহাশয় মুখুয্যে মশাইয়ের পৌত্রকে অর্থাৎ আমাকে তাঁহার দোতলার বৈঠকখানার পার্শ্বে ছাদে বসাইয়া বড় বড় রসোগোল্লা কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেছেন ও বলিতেছেন যে, "আমার মনে হচ্ছে যে ঠিক মুখুয্যে মশাই খাইতেছেন।" নিকটে ঘরের ভিতর গণিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়, সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত উমেশ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি ভক্তগণ বসিয়া আছেন। রায় মহাশয় তাঁহাদিগের দিকে তাকাইয়া বলিলেন যে, "দেখ, উহারা বুঝিতে পারিতেছে না যে কে খাইতেছে। আমার যে কত আহ্লাদ হচ্ছে উহারা বুঝিতেছে না। আমার যা কিছু সব মুখুয্যে মশাই হইতে।" রায় মহাশয়

মুখুয্যে মশাইকে কত ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন তাহা বলা যায় না।

রায় মহাশয়ের নিকট ভাল ভাল লোক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা "নিত্য আনুগত্য" করিতেন। বজ্রাঘাত হ'লেও রায় মহাশয়ের নিকট সন্ধ্যাকালে আসিতেন। একবার কলিকাতা সহর বর্ষার সময় জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। ঠনঠনিয়া ৺কালীতলায় বুক অবধি জল হয়। ভক্ত শ্রীগৌরীশঙ্কর দে মহাশয় উক্ত জল ভাঙ্গিয়া রায় মহাশয়ের নিকট সন্ধ্যার সময় আসেন। তাঁহার এইরূপ গুরুতে প্রেম ও আসক্তি ছিল। গৌরীশঙ্কর দে মহাশয় কখনও জীবনে অনুপস্থিত হয়েন নাই। যাঁহারা "নিত্য আনুগত্য" করিতে সক্ষম হইতেন না তাঁহাদের রায় মহাশয় শিষ্য করিতেন না। উক্ত গৌরীশঙ্কর দে মহাশয় General Assembly অধুনা Scottish Church Collegeএর গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি মহাসাধক ছিলেন। স্বল্পভাষী ছিলেন। তিনি প্রাতে বাজার হইতে আসিয়া পাইখানায় যান ও শরীর কেমন করিতেছে বলিয়া শয়ন করেন ও গুরু গুরু বলিতে বলিতে দেহ রাখেন। গুরুগত প্রাণ ছিলেন। ইঁহার পুত্র Attorney শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দে মহাশয়।

রায় মহাশয়ের বহু শিষ্য ছিল। এই রায় মহাশয়ের এত

দীনতা ছিল যে তাঁহার গুরুগতপ্রাণ শিষ্যগণ সম্বন্ধে বলিতেন যে "দয়া করিয়া ইহাঁরা আমার এখানে আসেন। সকলেই শ্রেষ্ঠ আমা হইতে। আমি কিছুই নহি।" আরও বলিতেন যে "গৌরাঙ্গদেব কলির অবতার। গৌরাঙ্গদেব লক্ষ লোকের সহিত হরিনাম করিতেন কিন্তু রাত্রিতে গুটীদশ পারিষদ লইয়া শ্রীবাসের ঘরে আসিয়া নাম বা বৈঠক করিতেন। সেইরূপ আমার এখানে দু দশটী আসেন দয়া করিয়া ও বৈঠক করেন।" এ ধর্ম্মের দীনতাই প্রধান অঙ্গ।

রায় মহাশয় প্রায়ই বলিতেন যে, গোপিনীদের ন্যায় **"আত্মনিবেদন"** না করিলে হৃদয়নাথের সহিত প্রেম হয় না। এই সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প বলিতেন। গল্পটী এই—"এক হাটে 'অমূল্য ধন' বিক্রয় হইতেছে। বহু ধনী লোক, রাজা, জমিদার আসিয়াছে এবং যাহার জমিদারী আছে, অর্দ্ধেক জমিদারী দিতে চাহিতেছে, যাহার দশ লক্ষ টাকা আছে সে পাঁচ লক্ষ টাকা দিবে বলিতেছে, কিন্তু অমূল্য ধন অটল হইয়া বসিয়া আছেন, কাহারও নিকট যাইতেছেন না। এক বুড়ীর কুড়ি কড়া কড়ি সর্ব্বস্ব ছিল। বুড়ি প্রত্যহ ঐ ২০ কড়ার তূলা কিনিয়া সুতা তৈয়ার করিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া যে কড়ি পাইত তাহাতে প্রত্যহ খোরাকী চলিত ও অবশিষ্ট কড়িতে তূলা কিনিত। বুড়ী সে দিন সুতা বেচিয়া ২০ কড়া কড়ি লইয়া হাটে আসিয়াছে।

উহার ঐ ২০ কড়া কড়ি সর্ব্বস্ব ছিল। বুড়ী অমূল্য ধন বিক্রয় হইতেছে শুনিয়া মনে মনে বলিল, 'ওগো আমার অমূল্য নিধি, আমার এই ২০ কড়া কড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই। আমি এই ২০ কড়া কড়ি তোমায় দিচ্ছি যদি দয়া করে এসো।' এই বলিবামাত্র 'অমূল্য ধন' বুড়ির কোলে আসিয়া বসিল। "সর্ব্বস্ব" অর্থাৎ ষোল আনা না দিলে অমূল্য ধন মিলে না। ষোল আনার এক পয়সা কম হইলে হৃদয়নাথের সহিত প্রেম হয় না। যে ষোল আনা চিত্ত দেয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সেই হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত হয় ও শ্রীগুরু তাহার হয়েন।"

শ্রীশ্রীরায় মহাশয় বলিতেন, "মৃত্যুর আলে দাঁড়াইয়া তাঁকে ডাকা চাই।" অর্থাৎ ঐ বুড়ির মত ষোল আনা চিত্ত দিয়া তাঁকে ডাকা চাই ও এইরূপ সর্ব্বসময়ে প্রস্তুত হইয়া থাকা চাই। একমাত্র তিনিই সত্য বস্তু কিন্তু লোকে তাঁহাকে ধনের জন্য, সংসারের জন্য, পাথিব উন্নতির জন্য ডাকে; সুতরাং তিনি আসেন না। পরমাত্মার তাঁহার সৃষ্টির উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠ জীব মানবের সহিত সহবাস করিবার ইচ্ছা হইল, তাই প্রেম বলিয়া একটী বস্তু সৃজন করিলেন। যিনি বুড়ির মতন সর্ব্বস্ব দিতে পারেন অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করিতে পারেন প্রেম তাঁহার নিকট আসেন ও পরমাত্মা প্রেমের সাহায্যে তাঁহারই সহিত সহবাস করেন অর্থাৎ প্রেম করেন। ইহাকেই বলে মৃত্যুর আলে দাঁড়াইয়া তাঁকে

ডাকা, অর্থাৎ গোপিনীদের মত সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকা। শ্রীগুরুই সর্ব্ব বাসনা ও কামনা। পরমাত্মাই সৎগুরুরূপে এ জগতে দয়া করিয়া আসেন।

আরও বলিতেন, "যে মা ছেলের জন্য প্রাণ দিতে পারেন সেই মাতা তাহার মৃত্যু হইবার পর ছেলে ডাকিলে আর আসেন না, কিন্তু **মৃত্যুর আলে** দাঁড়াইয়া **'সত্য মাকে'** মা বলিয়া জোরে না ডাকিয়া আস্তে ডাকিলেই সত্য মার সাড়া পাওয়া যায়। এইরূপ প্রেম যখন হয় তখন তিনি ছাড়া সব মিথ্যা বোধ হয়। মৃত্যুর আলে দাঁড়াইয়া না ডাকিলে এ প্রেম হয় না।"

রায় মহাশয় গীতার সহিত বাইবেল মিলাইয়া অর্থ করিতেন। ভাল ভাল খৃষ্টান উঁহাকে বড়ই ভক্তি করিতেন। বাইবেলের St. Johnএ আছে "There was beginning a word and a word was with God and the word was God" ইহাই তিনি বলিতেন "নাম ব্রহ্ম" বা "শব্দ ব্রহ্ম"। St. John এইরূপ ভাবে নাম প্রকাশ করিয়াছেন।

বাইবেলের এক স্থানে আছে, "Until a man be born again, he cannot enter the Kingdom of God." ইহার অর্থ বলিতেন যে, "দীক্ষার পর নবজীবন লাভ হয়।

Crucification মানে "দীক্ষা" ও Resurrection মানে দীক্ষার পর "নবজীবন লাভ।" অর্থাৎ :—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে॥"

রায় মহাশয় বলিতেন, "বিবাহ করিয়া নাম লওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ভগবজ্জনের সেবা হইবে'' অর্থাৎ সংসারীর ইহাই ধর্ম্ম। বিবাহ না করিলে ভগবজ্জনের সেবা হয় না।"

রায় মহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম যথা—

হালিসহরে মুখুয্যে মহাশয়ের আটচালাতে একজন ভগবজ্জন শ্রীগুরু দর্শন করিতে আসিতেছিলেন কিন্তু পথিমধ্যে তাহাকে বৃশ্চিক দংশন করে। এই কথা তিনি আটচালায় আসিয়া প্রকাশ করায় মুখুয্যে মহাশয় বলেন যে, "তুমি শ্রীগুরু ও নাম ভুলিয়া গিয়া বিষয় চিন্তা করিতেছিলে, সে কারণ বিছা কামড়াইয়া তোমাকে পরমার্থ স্মরণ করাইয়াছিল।" তিনিও উহা স্বীকার করিয়া লজ্জিত হয়েন।

রায় মহাশয় বলিতেন যে, "মুখুয্যে মশাই যে কি বস্তু ছিলেন তাহা তিনিই জানিতেন। আমার কি সাধ্য যে জানিব।" মুখুয্যে মশাইকে "পরমাত্মীয়" বলিয়া পরিচয় দিতেন।

সাধন সম্বন্ধে তিনি বলিতেন "দেহ তরু স্বরূপ, প্রেম রস স্বরূপ, এবং তাহার ফসল 'শ্রীগুরুরূপী ভগবান।' তরু আশ্রয় করিয়া সাধন করিতে হয়।"

একজন ফকিরকে বলিতে শুনিয়াছিলেন যে, "যে মায়ের স্তন এতদিন পান করিলাম ও যে যোনি দিয়া বাহির হইলাম আবার তাই দেখিয়া ভুলিব? তবে দুনিয়াদারির জন্য স্ত্রী হয়, কিন্তু সে কার্য্য গোপনে ও অন্ধকারে হয়, ও পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পায় না।"

রায় মহাশয়ের নিকট নাম শ্রবণমাত্রই সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত উমেশ দত্ত মহাশয়ের সঞ্চার হয় ও সমাধিস্থ হন। দত্ত মহাশয় অত্যন্ত প্রেমিক ছিলেন, ঠিক যেন কাদার মানুষ।

কলিকাতা কলুটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত সহদেব দে পরম বৈষ্ণব ছিলেন ও চমৎকার কীর্ত্তন করিতেন। তিনি কলুটোলার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দের সহিত রায় মহাশয়ের নিকট আসেন ও নাম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত গুরুভক্ত ছিলেন। রায় মহাশয়ের কৃপায় বহুভক্ত ভবসাগর পার হইয়াছেন।

রায় মহাশয় একদিন ৩।৪জন শিষ্য সহ হালিসহরে মুখুয্যে মশাইকে দর্শন করিতে নৌকায় করিয়া কলিকাতা হইতে যাইতে ছিলেন। সঙ্গে নৌকায় লুচি তরকারী জলখাবার লইয়াছিলেন।

কিন্তু কোন পাত্র লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গাবক্ষে আহারের সময় পাত্র বা কলাপাতার অভাবে খাওয়া হইল না। রায় মহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু অল্পসময় পরে দেখা গেল এক গোছ কলাপাতা গঙ্গায় ভাসিয়া আসিতেছে। উহা নৌকার নিকট আসিলে একজন ধরিয়া লইল ও কলাপাতায় সকলে লুচি আদি আনন্দের সহিত আহার করিলেন। "গুরুতে বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ থাকিলে এইরূপ অলৌকিক ঘটনা প্রায় ঘটিয়া থাকে।" রায় মহাশয় হাসিয়া উপরোক্ত কথা বলিলেন।

রায় মহাশয় কাঁচারাপাড়ার কর্ত্তা (ঘোষ মহাশয়) সম্বন্ধে গল্প করেন যে, একদিন প্রাতে একটী লোক দৌড়িয়া কর্ত্তার ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। পুলিশ পিছন পিছন আসিয়া উহাকে ধরে। কর্ত্তা বলেন যে সে কি করিয়াছে। তাহাতে পুলিশ বলে যে উহার কাপড়ে একতাল আফিম আছে। কর্ত্তা উহাদের দেখিতে বলেন। পুলিশ তল্লাস করিয়া উহার কাপড়ের ভিতর একতাল আফিম পায় কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল উহা একতাল তামাক। পুলিশ অবাক হইয়া গেল ও উহাকে ছাড়িয়া দিল। মহাপুরুষের কৃপায় সব সম্ভব হয়, দর্শনে মুক্তি হয়।

একদিন এক শিষ্য কর্ত্তাকে বলেন যে, সে এক সন্ন্যাসীকে শূন্যে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছে। ইহা শুনিয়া কর্ত্তা হাসিয়া বলেন যে তুমি স্থির হইয়া বস। সে ব্যক্তি বসিয়া

দেখে যে, সে উপরে কড়িকাঠ অবধি আপনি আপনি উঠিতেছে ও নীচে নামিতেছে। নীচে বসিবার ক্ষমতা নাই। তখন হায়রান হইয়া বলে যে আমাকে বসাইয়া দেন। পরে বসিলে কর্ত্তা বলেন যে, "এ সব গুণক্রিয়া বা ভেল্কী দেখিয়া মোহিত হইও না। শ্রীগুরুই সত্য জানিবে।"

রায় মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে তিনি ভক্তগণ সহ বৈঠকে (সাধনে) বসিয়া দেহরক্ষা করিবেন। এক দিবস তাহাই ঘটিল। মহাপুরুষ সকল ভক্তগণ সহ রাত্রে সাধনে বসিয়া আছেন। সকলে মহা আনন্দে মগ্ন আছেন। বহু সময় অতীত হইবার পরও রায় মহাশয়কে ঐরূপ একভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভক্তগণ মধ্যে একজন নিকটে গিয়া বুঝিতে পারেন যে রায় মহাশয় সকলকে কাঁদাইয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। রায় মহাশয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। তিনি সাধনায় বসিয়া দেহরক্ষা করেন। তিনি এইরূপ অসাধারণ যোগীপুরুষ ছিলেন। ইহাঁর বয়স প্রায় ৮৫ বৎসর হইয়াছিল।

দেহরক্ষা সম্বন্ধে দুটী কথা মনে পড়িল। আমার গুরুভ্রাতা তম্‌লুকের উকিল শ্রীগুরুগতপ্রাণ হালিসহর নিবাসী ৺তারাপ্রসন্ন

বাড়ুয্যে মহাশয় ১৩৩০ সালে ১০ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে বেলা ৯॥০ টার সময় সজ্ঞানে নাম স্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করেন। দেহরক্ষা করিবার অল্প অগ্রে এক দৃষ্টে সম্মুখে তাকাইয়া থাকিয়া একমুখ মধুর হাস্য করিয়া বলেন, "বাবা এলে—চল বাবা যাই দুজনায় পারে।" ইহার পরই দেহ রাখেন। ইঁহার শ্রীগুরুপদে অসাধারণ ভক্তি ছিল। একবার একটী গুরুতর মোকর্দ্দমায় মিথ্যাভাবে জড়িত হন। তিনি শ্রীগুরুকে ইহা নিবেদন করিয়া অটলভাবে কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকেন। কিন্তু এই মোকর্দ্দমার কাগজপত্র পড়িয়া সরকারী উকিল উহা মিথ্যা বিবেচনা করিয়া উঠাইয়া লয়েন ও মোকর্দ্দমাটী মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। তাঁহার অসাধারণ ভক্তিতে অন্যান্য ব্যক্তিরা যাঁহারা জড়িত হইয়াছিলেন সকলে রক্ষা পাইলেন। ইঁহার শ্রীগুরুর চরণে ষোল আনা নির্ভর ছিল। ইনি কল্যকার ভাবনা ভাবিতেন না। ইনি বিখ্যাত উকিল ছিলেন কিন্তু দানে সমস্ত ব্যয় হইত। লোককে ধরিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন। পরদুঃখে অত্যন্ত কাতর হইতেন ও পরোপকার করা তাঁহার প্রধান ব্রত ছিল। কখন কাহাকেও কটুকথা বলিতেন না। মিথ্যা কথা বলিতেন না ও মক্কেলের নিকট হইতে মিথ্যা মোকর্দ্দমা লইতেন না। সদা সন্তোষ ও হাসিমুখ ছিল। অভিমানশূন্য ছিলেন। এমন

সহৃদয় ও মিষ্টভাষী লোক ছিলেন যে সকলেই ভালবাসিত। এরূপ শত্রুহীন লোক দেখা যায় না।

তমলুকে অক্ষয়বাবু বলিয়া এক মুন্সেফ ছিলেন। তিনি কালা ছিলেন। তজ্জন্য অক্ষয়বাবু দুঃখ করিতেন। তারাপ্রসন্ন বাড়ুয্যে মহাশয়ের অক্ষয়বাবুর জন্য দুঃখ হইত। তিনি একদিন বালীধামে শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীগাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া অক্ষয়বাবুর কাণ ভাল হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। যখন বলেন তখন রাত্রি প্রায় ৯টা। বালীর ঠাকুর বলেন যে, "দেখ Organic defect ভাল হয় না, গুরুদেব বলিয়াছেন।" ওদিকে তমলুকে রাত্রি ৯টার সময় মুন্সেফ অক্ষয়বাবু খাওয়া দাওয়া করিয়া শুইয়াছেন। এমন সময় একজন কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহাকে ডাকেন ও অফিস সংক্রান্ত কথা বলেন। অক্ষয়বাবু বেশ শুনিতে পান ও সব উত্তর দেন, ও কাণ ভাল হওয়ায় বড়ই আনন্দিত হন। কিন্তু পরদিন প্রাতে আর শুনিতে পান না। আবার যে কালা ছিলেন সেই কালা হইলেন। Organic defect মহাপুরুষের দয়ায় সাময়িক ভাল হইয়াছিল কিন্তু থাকিল না। ভক্ত তারাপ্রসন্ন তমলুক ফেরৎ আসায় অক্ষয়বাবু সমস্ত বিষয় বলিলেন। তারিখ ও সময় মিলিয়া গেল যখন উহাঁর কাণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবু আশ্চর্য্য হইলেন ও প্রণাম

করিলেন। যে ভক্তরা সর্ব্বদা গুরুপদে লীন থাকেন তাঁহাদের প্রার্থনা সত্যে পরিণত হয়।

ইঁহার জামাতা নারায়ণ মুখুয্যে ও তৎপত্নী বিমানকুমারী, নরনারায়ণ মুখুয্যে ও তৎপত্নী ইঁহার নিকট নাম গ্রহণ করেন। সকলে আদর্শ ভক্ত ছিলেন।

ইঁহার পিতা ৺দ্বারিকানাথ বাড়ুয্যে মুখুয্যে মশাইয়ের শিষ্য ছিলেন।

বাড়ুয্যে মহাশয়ের সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবী স্বামীর নিকট ধর্ম্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৫নং সিমলাই পাড়া লেনস্থ শ্রীশ্রীগুরুধামে ১৩২২ সালে ৭ই পৌষ তারিখে সোমবার রাত্রি ৪।৪০ মিনিট সময়ে সজ্ঞানে নাম স্মরণ করিতে করিতে দেহ রাখেন। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। দেহরক্ষার সামান্য আগে বলেন যে "ঠাকুর এসেছেন"। ইহার একটু পরেই শ্রীগুরুপদে লীন হয়েন। ইহাকেই "দেহরক্ষা" বলে। ইঁহার স্বামীভক্তি ও গুরুভক্তি অদ্বিতীয় ছিল। ইনি জীবিতকালে কখনও কাহারও উপর ক্রোধ করেন নাই, কটু কথা বলা ঘৃণা করিতেন। দয়া অত্যন্ত ছিল। পশুপক্ষীর কষ্ট দেখিলে ব্যথিত হইতেন। বাড়ীর চাকর চাকরানীর সঙ্গে বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। অতিথি বা ভিখারী বিমুখ হইত না। সকলকে খাওয়াইয়া তবে

খাইতেন। পরনিন্দা কখনও করিতেন না। স্বামীকে কখনও রূঢ়বাক্য বলিতে কেহ শুনে নাই। স্বামীর বাসনাই তাঁহার বাসনা ছিল, কখনও কোন কথার প্রতিবাদ করেন নাই। প্রতিবেশীর সহিত মধুর ব্যবহার ছিল। তিনি নির্ব্বাক সাধক ছিলেন—সদাই নাম করিতেন ও গুরুরূপ চারিদিকে দর্শন করিতেন। বেশী কথা কহিতেন না। প্রকৃতি অত্যন্ত ঠাণ্ডা ছিল। লোকে তাঁহাকে মাটীর মানুষ বলিত। মোটের উপর "জীয়ন্তে মরা" ছিলেন। ইঁহারা স্বামীস্ত্রীতে দেহরক্ষার আগে শ্রীগুরুর দর্শন পাইলেন। শ্রীগুরুর অপার দয়া। শ্রীগুরু আসিয়া লইয়া গেলেন। ইঁহার ভক্তিমতী কন্যা গৌরীদেবী মাতার নিকট নাম লয়েন।

৺তারাপ্রসন্ন বাড়ুয্যে মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কমলকুমারী দেবী পিতার নিকট ধর্ম্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভক্তি দেখিয়া তিনি সন্তোষের সহিত ইঁহাকে দীক্ষা দেন। ইঁহার সঞ্চার সহজেই হয় ও সর্ব্বদা গুরুগতপ্রাণ এবং নামরসে ডুবিয়া থাকেন। ধর্ম্মের জনকে পাইলে কৃতার্থ হন ও ভগবজ্জনের সেবায় বড়ই আনন্দ পান। ইনি গ্রন্থকারের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী। ইনি গুরু ছাড়া কিছুই জানেন না। সদা গুরুপ্রেমে গরগর। অনাসক্তভাবে সংসার করেন।

সাধুসঙ্গ গুণে রঙ ধরে। মুখুয্যে মশাইয়ের কলিকাতা

নিবাসী ৺হরিচরণ কর্ম্মকার নামে একজন অতি ভক্তিমান শিষ্য ছিলেন। ইঁহার স্ত্রী মুখুয্যে মশাইয়ের নিকট নাম শ্রবণ করা মাত্র পূর্ণ সঞ্চার হইয়া সমাধিস্থ হন। ভক্তিমান, গুরুগতপ্রাণ স্বামী সঙ্গ করিয়া ইঁহার পূর্ব্ব হইতে রঙ ধরিয়াছিল। ভক্তি থাকিলে "ভাবের অঙ্গ প্রেমের গঠন হয়।" সদাই ভাবে বিভোর থাকে।

গ্রন্থকারের জীবনে তুইটি অলৌকিক ঘটনা শ্রীগুরু কৃপায় সংঘটিত হয়। যে বিশ্বাসী সে বিশ্বাস করিবে। আমি ৩০ বৎসর বয়সে ৺কাশীধাম যাই। সে সময়ে বর্ষাকালে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়ায় গঙ্গার ধারের রাস্তাগুলি ডুবিয়া যায়। উক্ত সময়ে জল সরিয়া গেলে একদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে রাণীভবানীর শিব মন্দিরের উপরের চাতালে রাত্রি ১০টার সময় একজন সাধু সহ বসিয়া আছি। হঠাৎ শুনি মন্দিরের মধ্য হইতে অতি মধুরভাবে "ব্যোম! ব্যোম! ব্যোম!" তিনবার শব্দ হইয়া উক্ত ধ্বনি আকাশে উঠিয়া গিয়া মিলাইয়া গেল। আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কেহ সেখানে নাই ও মন্দিরের দ্বার বন্ধ। সাধু বলিলেন যে ইনি "সজীব মহাদেব।" এই সাধু বাঙ্গালী। দিল্লীর নিকট 'সলাকা' বলিয়া একটি স্থানে তাঁহার আশ্রম। আর কখনও

ইহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। বিশ্বনাথের রাজত্ব সত্য ও রহস্যে পরিপূর্ণ।

আমার প্রাচীন বয়সে একবার সাংঘাতিকভাবে বসন্ত হয়। তুদিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকি ও ক্রমশঃ মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতে থাকি। ইহার মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় স্বপ্ন দেখি যে আমি পাল্কি করিয়া একটী রাজবাড়ীতে আসিলাম। দোতলায় গিয়া একটী ছোট ঘরে চেয়ারে বসিলাম। আমার সম্মুখে দেখিলাম একটী ছোট টেবিল ও উহার অপরদিকে একখানি বড় চেয়ার। এই চেয়ারের পিছনে অনেক ভদ্রলোক সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চেয়ারে কেহ নাই। ভদ্রলোকেরা সকলেই আমার অপরিচিত। তবে মধ্যখানে একজন নাতিখর্ব্ব অর্দ্ধবয়সী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। সেইজন্য তাঁহাকে মনে আছে। একটু পরে একজন দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, অতি সুন্দর পুরুষ, বয়স ৩০।৩২ হইবে, আসিলেন ও চেয়ারে বসিলেন। ইহার গায়ের রঙ সোনার মত, চুল ভ্রমরকৃষ্ণ, গোঁফদাড়ি কামান। ইহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মশাই, আমি কি ভাল হব?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "আপনি ভাল হইয়া গিয়াছেন। আপনি যান, কবিরাজ যাইতেছে।" এই বলিয়া আর একজনকে ডাকিতে বলিলেন। আমি উঠিয়া পুনরায় পাল্কি চাপিলাম। অর্দ্ধপথে পাল্কি আসিল মনে আছে, তারপর আর মনে নাই। ইহার পর তৃতীয় দিন

প্রাতে আমার হঠাৎ জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে দেখি, আমার স্বপ্নে দৃষ্ট সেই নাতিখর্ব্ব ভদ্রলোকটী আমার নিকট বসিয়া আছেন। তিনিই কবিরাজ, যাহার কথা মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন। আমি আশ্চর্য্য হইলাম। ইনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। আমার কোন যন্ত্রণা ছিল না—এটী খুব আশ্চর্য্য ও দয়াময়ের কৃপা। এই ঈশ্বরপ্রেরিত কবিরাজের নাম শ্রীমনোরঞ্জন পাকড়াশী সাং ৩৯নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। অতি পবিত্র লোক ও নির্লোভী। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র অবনী ইঁহাকে আনে। ভগবানের রাজত্বে তাঁহার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়।

অনেক গুণী, পবিত্র আত্মা, উচ্চস্তরের ব্রাহ্ম শ্রীশ্রীজগৎসেনের নিকট এই গুপ্তধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। এটি গোপী ধর্ম্ম, একারণ ইহারা গুপ্তই ছিলেন। ইহাদের মধ্যে মজিলপুরের ৺কালীদত্ত মহাশয় মহাসাধক ছিলেন। তিনি "আত্মদর্শন" বই প্রণয়ন করেন। এখন সেই বই পাওয়া যায় না। "সুফী" সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটী বই লেখেন। সুফী ধর্ম্ম অনেকটা এ ধর্ম্মের মত অর্থাৎ উভয় ধর্ম্মেই "গুরু আনুগত্য" আছে। প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাভক্ত ও যোগী

পুরুষ ছিলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় যিনি "সঞ্জীবনীর" সম্পাদক ছিলেন তিনিও এই ধর্ম্মের গুপ্তসাধক ছিলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরী মোহন দাশ মহাশয় এই ধর্ম্মের মহাগুপ্ত সাধক ছিলেন। যাঁহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আরও অনেকে ছিলেন, সকলের নাম জানি না। ইঁহারা প্রকৃত ভক্ত ও উচ্চস্তরের মুক্ত সাধক। এ ধর্ম্মের সকলেই গুপ্ত সাধক, বাহিরে প্রকাশ নাই। কারণ "ধর্ম্ম গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ।" অনেকে এই ধর্ম্মকে "কর্ত্তাভজা" ধর্ম্ম বলিয়া সন্দেহ করেন, কিন্তু ইহা কর্ত্তাভজা ধর্ম্ম একেবারেই নহে। এ ধর্ম্মে সকলে সেই নিরাকার ও নির্ব্বিকার পরমব্রহ্মকে গুরু আনুগত্য দ্বারা ভজনা ও সাধনা করেন। সেই পরমব্রহ্মকে জগৎকর্ত্তা বলিয়া থাকেন। ইহাই গুরু-আনুগত্য ধর্ম্ম। ইহা গুণহীন ধর্ম্ম। গোপিনীদের মত "গুরু সুখে সুখী না হ'লে" এই ধর্ম্মের অনুভূতি হয় না—সঞ্চার হয় না। ভাবের ভাবী না হ'লে হৃদয়নাথের দর্শন পাওয়া যায় না। সদা শ্রীগুরুপদে ডুবিয়া থাকিতে হয়—নাম রসে হাবুডুবু খাইতে হয়, তবে "প্রেমের" সঞ্চার হয়। এ ধর্ম্মে গুণকর্ম্ম নিষেধ। তদ্ভাবে ভাবিত হইতে হয়। এই স্রোতের উচ্চস্তরের ভক্তগণ ব্রহ্মবিদ্, সংস্কারবিহীন ও সমদর্শীন।

মুখুয্যে মহাশয়ের শিষ্য সাধক ৺জগৎ সেন মহাশয়ের নিকট, খুলনা জিলার অধীন মহেশ্বর পাশা নিবাসী ৺গোপী মোহন

বাড়ুয্যে মহাশয় নাম লয়েন। এই গোপী বাড়ুয্যে মহাশয়ের শিষ্য মহাবৈষ্ণব, পরম ভাগবৎ শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়। ইনি কলিকাতায় কবিরাজী করেন। ইনি মহাপ্রেমিক ও গুরুগত প্রাণ। সদাই গুরুপ্রেমে ভাসমান। বাড়ুয্যে মহাশয়ের শিষ্যরা সাধন ভজন সময়ে চক্ষু মুদ্রিত করেন না। ইহাঁরা পরস্পরের চোখে চোখে তাকাইয়া শ্রীগুরুরূপ দর্শন করেন ও তাহাতেই সঞ্চার হয় ও ভাবে মোহিত হন। ইঁহার একটী ভক্তিমান শিষ্য আছেন নাম শ্রীযুক্ত তুলসী গাঙ্গুলী। ইনি ভাগলপুরে থাকেন।

১৯৩৬ সালের মে মাসের ৩১শে তারিখে উক্ত কবিরাজ মহাশয় ও তাঁহার গুরুভাই প্রোফেসর ৺ফণিভূষণ মুখুয্যে ও ভাগবতের পণ্ডিত ললিত চক্রবর্ত্তী ৺মুখুয্যে মহাশয়ের পৌত্রসহ অর্থাৎ আমার সহিত কলিকাতা হইতে কাঁচরাপাড়া ঠাকুরবাড়ীতে যান। তথা হইতে হালিসহরে গিয়া মুখুয্যে মহাশয়ের পুণ্যধাম দর্শন করেন। মুখুয্যে মহাশয় যেখানে বসিতেন সেইখানে বসিয়া সকলে সাধন (বৈঠক) করেন, তৎপরে আটচালায় গিয়া গড়াগড়ি দেন। ইঁহাদের ভক্তি অদ্বিতীয়।

৺শ্রীযুক্ত গোপীমোহন বাড়ুয্যে মহাশয়ের আর একটী পরম ভক্তিমান শিষ্য বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত হরিপদ গুপ্ত মহাশয়। ইনি কবিরাজ। কলিকাতার দর্জ্জিপাড়ায় গুলু ওস্তাগর

লেনে অবস্থান করেন। ইহার একটী ভক্তিমান শিষ্যের নাম শ্রীশ্যামাচরণ কর্ম্মকার ও আর একটী বিদ্যাকুমার বিশ্বাস। ইহাদের গুরুভক্তি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি।

রায় মহাশয় সম্বন্ধে একটী কথা মনে পড়িল। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবনী তাঁহার শিষ্য ৺কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী "সদ্‌গুরু গ্রন্থে" লেখেন। আমি সেই বই পড়িবার সময় একস্থানে দেখি, লেখা আছে যে, "·········গোস্বামী মহাশয় বৃন্দাবন আদি দর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ভবানীচরণ দত্তর লেনে একজন মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদ করিলেন ও বৃন্দাবনে কিরূপ দর্শন হইল প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন·········"। মহাপুরুষের নাম লেখা নাই। আমি এই পড়িয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়কে পত্র লিখি যে উক্ত মহাপুরুষ ৺নবীন রায় মহাশয় কিনা আমায় লিখিবেন। তাহাতে ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার এক শিষ্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বটব্যাল দ্বারা উত্তর দেন যে "উক্ত মহাপুরুষ ৺নবীন রায় মহাশয়।" গোস্বামী মহাশয়ের গুরুদেব ৺জগৎ সেন মহাশয় রায় মহাশয়ের গুরুভাই ছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীনদের ভিতর গ্রন্থকার ছাড়া আর কেহ নাই। এ স্রোতের প্রচার নাই। এটী গুণহীন ধর্ম্ম সুতরাং

গ্রাহক নাই বলিলেই হয়। সকলেই গুণকর্ম্ম চাহে। নির্গুণে বসতি করিতে কেহ চাহে না। তাঁছাড়া এ "অমূল্য ধন" ছিনাইয়া না লইলে কাহাকেও দেওয়া যায় না। সুতরাং পাত্র পাওয়া যায় না। "জীয়ন্তে মরা" যে হইতে পারে সেই পাবে। তাহা হইলে গ্রাহক পাওয়া দুষ্কর। যার বহু ভাগ্য সে পায়। "চেটুক পেটুক পায় না।" এ ধর্ম্মে গুণকর্ম্ম নিষেধ।

আমার অগ্রজসদৃশ অভিন্নহৃদয় মান্যবর গুরুভাই শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয় কলিকাতার ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ড্রী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেডের অধ্যক্ষ ছিলেন। ৮০ বৎসর বয়সে ইনি ১৩৫৩ সালে ১২ই শ্রাবণ তারিখে সজ্ঞানে সাধনায় বসিয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন। ইনি পরম সাধক ও প্রেমিক ছিলেন। সদা গুরুগতপ্রাণ ও শ্রীগুরুর নামে পাগল ছিলেন। গুরুভাইদের দেখা পাইলে মনে করিতেন যেন "নিধি পাইলেন।" কাঁচরাপাড়ার ঠাকুরবাড়ীতে ইহার অসাধারণ ভক্তি ছিল। ঐ বাড়ীর সেবাব্রত কার্য্যে ইনি যথেষ্ট সাহায্য করিতেন ও নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি নির্গুণ সাধক ছিলেন। আমি প্রায়ই উহাঁকে দর্শন করিতে

যাইতাম ও শান্তি লাভ করিতাম। উনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ইঁহারই উৎসাহে এই পুঁথিখানি লিখি। আমি রায় মহাশয়ের "বাণী" গুলি ইঁহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবাবু আমার জুড়াইবার স্থান ছিলেন। তাঁহার কাছে যাইবার অপেক্ষায় আছি। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী সাহিত্যিক ছিলেন, অনেক বই লিখিয়াছেন।

পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সাধ্বী সরলাদেবী স্বামীর নিকট নাম শ্রবণ করেন। তাঁহার অদ্বিতীয় স্বামীভক্তি ছিল। চিরজীবন কখনও স্বামীর উপর ক্রোধ বা ঝগড়া করেন নাই। স্বামীর বাক্য তাঁহার নিকট বেদবাক্য ছিল। সুতরাং নাম লইবামাত্র সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি লেখাপড়া তাদৃশ জানিতেন না। কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ-মমতায় মাতৃস্বরূপিনী ছিলেন। পরদুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিত। দান যথেষ্ট ছিল। তিনি ১৩৫৫ সালে ৩০শে আষাঢ় তারিখে বুধবার দিন স্বাতী নক্ষত্রে শ্রীগুরু (পতিপদ) ধ্যান করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহ রাখেন। তাঁহার মাতৃভক্ত উপযুক্ত পুত্রগণ নরেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ মাতার পারলৌকিক কার্য্য পরম ভক্তিসহ দানাদি করিয়া সম্পন্ন করেন। মাতা পারলৌকিক কার্য্য সম্বন্ধে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা সম্পন্ন করেন।

৺গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়ের পুত্রগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কাঁচরাপাড়া ধামে সেবাকার্য্য পরিদর্শন করেন ও যথাসাধ্য সাহায্য করেন। ইনি প্রেমিক, পরম ভক্ত ও বিশ্বাসী। পিতার ন্যায় ইঁহার যথেষ্ট গোপন দান আছে। অতি সরল প্রকৃতি ও ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে। প্রকৃতি অতি মধুর। ইঁহার গুরু ভক্তি ও পিতৃ মাতৃ ভক্তি অদ্বিতীয়। ইনি সর্ব্বদা নামরূপ স্মরণ করেন ও আমার সঙ্গ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করেন। ইনি আমার মর্ম্মী, দরদী বন্ধু ও পরমাত্মীয়।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথের ভক্তিমতী পরম সাধ্বী সহধর্ম্মিণী পতি সহ এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও নিয়মিতরূপে সাধন ভজন করেন। শ্রীগুরু আজ্ঞা ও নিষেধবিধি নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করেন। তাহার গুরুভক্তি ঐকান্তিক থাকায় সহজেই 'সঞ্চার' হইয়াছে। ইহার প্রকৃতি অতি শান্ত ও সরল। ইনি অতি মিষ্টভাষী, দয়াশীলা ও হিংসা দ্বেষবর্জ্জিতা। ভগবজ্জনের সেবায় পরম আনন্দিত হন। পতিকে প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। ক্রোধ কাহাকে বলে জানেন না। সকলের প্রতি সমভাব। পতির ইচ্ছাই তাহার ইচ্ছা বলিয়া জানে।

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়ের ভ্রাতা ৺কুঞ্জবিহারী দে মহাশয় এই ধর্ম্মের লোক ছিলেন। ইনি অতি প্রেমিক ছিলেন।

খুব কম কথা কহিতেন। ইঁহাকে কেহ রাগ করিতে দেখে নাই। মিষ্টভাষী ছিলেন। ইঁনি ১৩৩৬ সালে ১১ই অগ্রহায়ণ রাত্রি ৪॥০ টার সময় বিছানায় শয়ন করিয়া নাম করিতে করিতে দেহ রাখেন। ইচ্ছামৃত্যু ইহাকে বলে। ইনি ৺গৌরী শঙ্কর দে মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন।

এই স্রোতভুক্ত একজন পার্ষদ আছেন। তাহার নাম শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বাড়ুয্যে। ইনি কলিকাতার সাঁখারীটোলা লেনে থাকেন। তাঁহার উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথিতনামা ডাক্তার। ইনি পরম ভক্ত, প্রেমিক ও গুরুগত প্রাণ। ইহার গুরুতে প্রগাঢ় বিশ্বাস। শ্রীগুরু ছাড়া কিছুই জানেন না। নামরসে সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকেন। ইনি সত্যপদে প্রতিষ্ঠিত। চরিত্র অতুলনীয়।

দরদী বন্ধুদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কানাইলাল দে, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র রক্ষিত, শ্রীখগেন্দ্র ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্র শীল, শ্রীদয়াল ঘোষ ও শ্রীরাধারমণ ঘোষ (ডাক্তার) প্রভৃতিকে বেশী মনে পড়ে। ইহারা সকলে গুরুপদে লীন হইয়াছেন। এই স্রোতের হালিসহরের শ্রীযুক্ত ঈশান ভট্টাচার্য্য (বাড়ুয্যে), কবিরাজ শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত গোপাল দাস, শ্রীযুক্ত পিয়ারী ভাট (ব্রাহ্মণ), হুগলী জজ কোর্টের Public Prosecutor উকিল শ্রীযুক্ত হেম চাটুয্যে মহাশয় ও কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত রমানাথ দে, Small

১
২
৩
৪
৫

Causes Courtএর Interpreter বিপিন ঘোষ, ললিত মিত্র, নিতাই চাটুয্যে, মাতুবাবু প্রভৃতি সকলেই সাধক ও মহাভক্ত ছিলেন। এখন কেহই বর্ত্তমান নাই।

উপরোক্ত দরদী বন্ধু ৺যোগীন্দ্র রক্ষিত মহাশয় আমার শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভাই ৺গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। প্রত্যহ ইনি ওরিএণ্টাল প্রেসে গিয়া ৺গোষ্ঠবিহারীর সহিত নির্দ্দিষ্ট ঘরে বসিয়া সাধন ভজন করিতেন। আমিও মধ্যে মধ্যে গিয়া যোগ দিয়াছি। উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। ইনি অতি অপূর্ব্বভাবে দেহ রাখেন। ঘাটশীলায় বাড়ী করিয়াছিলেন। সেখানে পরিবারবর্গ লইয়া কলিকাতা হইতে ট্রেনে যান ও ষ্টেসন হইতে উক্ত বাড়ীতে পৌঁছাইয়া শরীর কেমন করিতেছে অনুভব করিয়া বিছানায় শয়ন করেন ও "জয় গুরু, জয় গুরু" বলিতে বলিতে দেহ রাখেন। ইঁহাকেই গুরুপদে লীন হওয়া বলে। প্রায় ৯১ বৎসর বয়সে দেহ রাখেন। বড়ই মধুর প্রকৃতি ছিল ও পবিত্র প্রেমিক পুরুষ ছিলেন। আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন। প্রায় 'গুরুধামে' আমাকে দেখিতে আসিতেন ও আহার করিতেন। ইনি সাহিত্যিক ছিলেন। শিশুগীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

মুখুয্যে মহাশয়ের পুত্র ৺হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়

এই ধর্ম্মে ছিলেন। তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ গ্রন্থকার বর্ত্তমান আছেন। ইনি ঠাকুরের জন। ইনি নিজেকে ভক্তদের দাসানুদাস বিবেচনা করেন ও সকলকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। ইনি হালিসহর হইতে কলিকাতায় আসিয়া ১৫নং সিমলাই পাড়া লেনে বাস করেন। ইঁহার আশ্রমের নাম "শ্রীশ্রীগুরুধাম"। তথায় নিয়মিতরূপে ভক্তগণ বৈঠক করেন অর্থাৎ সাধন ভজন করেন। তাঁহাদের সঙ্গ করিয়া কৃতার্থ হই ও ভাবসাগরে ডুবিয়া যাই। যাঁহাদের সঙ্গগুণে হৃদয়নাথের দর্শন পাই তাঁহারাই পরমাত্মীয়।

মুখুয্যে মশাইএর কনিষ্ঠ পুত্র ৺নিবারণচন্দ্র এই স্রোতভুক্ত ছিলেন। তিনি অতি ভক্তিমান পুরুষ ছিলেন।

আমার অভিন্নহৃদয় গুরুভাই প্রিয়বর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ গুপ্ত মহাশয় বালিগঞ্জে ৮৭নং বণ্ডেল রোডে তাঁহার শ্রীশ্রীনবীন আশ্রমে "নামব্রহ্ম" মন্দির স্থাপন করিয়াছেন এবং মন্দির অভ্যন্তরে তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীনবীন রায় মহাশয়ের বড় সুন্দর চিত্র বিরাজ করিতেছেন। ভক্তগণ ঐ চিত্রের পূজা প্রত্যহ করেন। প্রতি রবিবারে অদ্যাবধি উক্ত আশ্রমে ভক্তগণ আসিয়া সাধন ভজন

করেন। উক্ত পবিত্র স্থানে যাইলে কত যে আনন্দ হয়, কত যে শান্তি হয় তাহা প্রকাশ করা যায় না। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ গুপ্ত মহাশয়ের গুরুভক্তি অসাধারণ। সর্ব্বদা তাঁহার নামসাধন চলিত ও গুরুরূপ দর্শন করিতেন। তাঁর পবিত্র আদর্শ চরিত্রগুণে সকলেই মোহিত। বহু ভক্ত তাঁহার আশ্রিত হইয়া শান্তি পাইয়াছেন ও আনন্দধামে বাস করিতেছেন। ইনি নিত্য আনুগত্য করিতেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে ধন্য হইতে হয়। ইনি অক্রোধী, অভিমানশূন্য, নিত্যানন্দ। ইনি বিদ্যাসাগর কলেজের Principal ছিলেন। ছাত্রেরা ইঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন ও অত্যন্ত ভালবাসিতেন। চরিত্রের উৎকর্ষে লোকে দেবতা হয়।

ইনি ১৬ই মার্চ ১৯৫০ সালে অর্থাৎ বাংলা ২২শে ফাল্গুন ১৩৫৬ সালে বেলা ২টার সময় ৭৯ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে শ্রীগুরুপদে ধ্যান করিতে করিতে এক গাল মধুর হাস্য করিয়া শ্রীগুরুপদ লীন হন। শ্রীগুরু দর্শন করিয়া হাস্য করেন, ইহা আমাদের অনুভূতি।

ক্ষীরোদ বাবুর সহধর্ম্মিণী তাঁহার ভক্তিমতী শিষ্যা ছিলেন। ইনি ১৩৫৭ সাল ২৮শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রে শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে সজ্ঞানে গুরুপদ ধ্যান করিতে করিতে দেহরক্ষা করেন।

ইহার পতিভক্তি অতুলনীয় ছিল। স্বামীর জন্মদিনে দেহ রাখেন।

ক্ষীরোদবাবুর উপযুক্ত পুত্র ও শিষ্য শ্রীমান সত্যেন্দ্র গুপ্ত বর্ত্তমান আছেন ও দার্জ্জিলিংএ ওকালতি করেন। 'নবীন আশ্রম' রক্ষা করিতেছেন। গুরুপদে অসাধারণ ভক্তি। ইনি দীর্ঘজীবি হইয়া পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করুন এই প্রার্থনা করি।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ গুপ্ত মহাশয় প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশীর দিনে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মতিথি উৎসব করিতেন ও সাধু ভোজন সমারোহের সহিত হইত। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ উহা অনুসরণ করিয়া আমাদের ধন্য করিয়াছেন। ক্ষীরোদবাবুর মধ্যমা কন্যা ও শিষ্যা নির্ম্মলা ক্ষীরোদবাবুর রোগশয্যায় কি যত্নের সহিত অক্লান্ত সেবা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষীরোদবাবু বলিতেন যে "নির্ম্মলা আমার কন্যা নহে, পুত্র।" এরূপ গুরুভক্তি ও সেবা আদর্শস্থানীয়। নির্ম্মলা সেবায় সিদ্ধ।

৺ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের ভক্তিমান শিষ্যগণের নাম দিলাম ঃ—

ক। শ্রীশৈলেন চন্দ্র চন্দ্র, সাং কলিকাতা, কসবা।

খ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ কোলে, উকিল, সাং শ্রীরামপুর।

গ। শ্রীসুচারু ভাতুড়ী। ইনি সর্ব্বদা গুরু প্রসঙ্গ করেন ও ভাবে থাকেন। প্রায় গুরুধামে আসেন। তাঁহার সঙ্গলাভে বড়ই আনন্দ পাই।

ঘ। শ্রীতারাপদ বসু, সাং সিঙ্গুর, জেলা হুগলী।

ঙ। শ্রীএককড়ি লাল সরকার।

চ। শ্রীমহেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

ছ। শ্রীশিবপ্রসাদ মুখুয্যে, সাং দর্ম্মাহাটা, কলিকাতা।

জ। ভক্তিমতী পত্নী ও তিন কন্যা।

উপরোক্ত শিষ্যগণ সকলেই অতি ভক্তিমান ও গুরুগত প্রাণ।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবাবু আমার জুড়াইবার স্থান ছিলেন। ইঁহাকে দেখিলে হৃদয়নাথকে মনে পড়িত। ইঁহার নিকট হৃদয়নাথের কথা শুনিতে পাইতাম। যে সব মনের মানুষ ছিলেন তাঁহারা একে একে হৃদয় শূন্য করিয়া চলিয়া গেলেন। কবে যে হৃদয়নাথের নিকট গিয়া হৃদয়নাথের শ্রীচরণ সেবা করিব জানি না। সেই দিনের অপেক্ষায় তাঁহার শ্রীমুখ চাহিয়া বসিয়া আছি। তিনি যে অধমতারণ, পতিতপাবন, দয়াময়—এই যা ভরসা।

আমি নিম্নে আমার প্রিয় গুরুভাই শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ গুপ্ত মহাশয়ের একটী পত্রের কিয়দংশ দিলাম। ভক্তগণ পড়িয়া আনন্দ পাইবেন ঃ—

"………এখন নিজেদের যে দিন ফুরিয়ে এলো। সাধন ভজন ত' কিছুই হ'লো না। কি করি বল। আমাদের ত' গুরু-আনুগত্য ধর্ম্ম। তা' শ্রীগুরু প্রতি ত' নিষ্ঠা এলো না। শুনলাম ত'—

গুরু গুরু সবাই বলে, গুরু চেনা সহজ নয়।
(৬) গুরু যে চিনেছে, সে কভু জীয়ন্ত নয়॥

গুরুতে ত মন মজল না, জ্যান্তে মরাওত হলো না। তোমরা গুরুভাই, তোমাদের নিকট ছাড়া কার কাছে এ দুঃখের কথা বলবো।

ভাই দরদী, বলো কি ক'রে শ্রীগুরুর পায়ে আত্মসমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে চোখ বুজতে পারি। মন হ'লো না কথার বাধ্য, সাধ্য কি মোর সাধনে। মনটাই যে আমার হ'লো না। তা তাঁর পায়ে কি দিব? তোমরা গুরুভাই, তোমাদের আশীর্ব্বাদই এখন ভরসা।

আশীর্ব্বাদ কর ভাই যেন শ্রীগুরুর পাদপদ্মে অচলা অটলা ভক্তি বিশ্বাস লাভ ক'রে, নামে প্রাণ সঁপে, জয় গুরু শ্রীগুরু

ব'লে ভবসাগরে পাড়ি দিতে পারি। গুরু দয়াময়—'সে অপরাধ নেয় না'। শ্রীগুরু মুখের এই বাণী এখন আমার ন্যায় নরাধমের একমাত্র ভরসা।

সাধন সম্পন্ন আমার কভু ত হবার নয়।
একমাত্র ভরসা (হে নাথ) তুমি আপনি দয়াময়॥

দয়াময়! দয়াময়! দয়াময়! পতিতপাবন, পতিতপাবন অধমতারণ। কর্ত্তা যিনি, মালিক যিনি, তিনি দয়াময়; তিনি পতিতপাবন, তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু এই ভরসা—নরাধমের এই ভরসা। আশীর্ব্বাদ কর ভাই গুরু দয়াময়, দয়াময়, দয়াময়, এই সত্য নাম, সৎনাম স্মরণ করতে করতে যেন প্রাণবায়ু শেষ হয়। জয় শ্রীগুরু নবীন চন্দ্র। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ কী জয়।

শ্রীশ্রীগুরুপদাশ্রিত
তোমাদের ভাই
"ক্ষীরোদ"

ভক্ত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ গুপ্ত মহাশয়ের আর একটী সাধনা সম্বন্ধে প্রেমপূর্ণ পত্রের নকল নিম্নে দিলাম। ভক্তেরা পড়িয়া বড়ই আনন্দ পাইবেন:—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ৩০।১১।১৯৪০

ভাই গোষ্ঠ, ……………যে কয়টা দিন গুরু রাখবেন,

তোমাদের সঙ্গ যেন পাই তাঁর চরণে এই প্রার্থনা। .... তোমার সহধর্ম্মিণীকে স্বধর্ম্মে এনেছো বড় আনন্দের কথা। **ধনী স্বামী অপেক্ষা ধার্ম্মিক স্বামী অনেক বড় কথা।** ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি তাঁর সৌভাগ্য উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিয়া জীবন সফল করুন। সত্য ধর্ম্ম লাভ করা কঠিন, তাহা সাধন করা আরও কঠিন। সময় অল্প। এরই মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধ, শ্রীগুরু, অবস্থার কথা বলিতেন, মনে আছে বোধ হয়। (১) প্রবর্ত্ত অবস্থায় সত্যপালন করিয়া নাম সাধন; (২) সাধক অবস্থায় "ভাব" সাধন: (৩) সিদ্ধাবস্থায় "প্রেম" বা সেবা সাধন। আমাদের গুরুদত্ত দ্বিতীয় নামে বেশ বুঝা যায়—তাঁর কাজ তিনি করেন। তবে আমাদিগকে যন্ত্র করিয়াই করেন। তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর, তারপর তিনি দয়াময় এই বিশ্বাস রেখে তাঁর পায়ে স্ত্রীকে ফেলে দাও। যে ভার নিয়েছো সে দায় অবশ্যই দিবা। গুরুমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে ভুলিবে না। উৎসাহ, উপদেশ দ্বারা শ্রীগুরুর পথে চালিত করিতে ত্রুটি করিবা না। এইত গুরুর ঋণশোধ। অন্যান্য সম্প্রদায়ে গুরুকে ধন দৌলত দিয়া ঋণ পরিশোধ করে। আমাদের কামিনীকাঞ্চনের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা নিষেধ। শ্রীগুরুর সত্যনাম প্রচার দ্বারাই শ্রীগুরুর ঋণ শোধ করিবার কথা। তুমি স্ত্রীকে দীক্ষা দিয়া শ্রীগুরুর আদেশই

পালন করিয়াছ। ইহাতে নিজেকে অযোগ্য মনে করিয়া ভীত হবার কিছু নাই। দ্বিতীয় নাম স্মরণ করিয়াই দীক্ষা দিবার কথা। সেই নাম ভুলো না ভাই। সেই নামের মর্ম্মানুযায়ী কাজ ক'রে ঋণ শোধ কর। চিন্তা করিবা না। এই প্রসঙ্গে শ্রীগুরুর ঐ গানটী মনে করিয়ে দি।

এই যে আমার তুমি (ওগো) এই যে তুমি,
স্বস্থানে বসিয়া দেখি, তুমি আমি, আমি তুমি,
ওগো এই যে আমার তুমি।

তাই বলি ভাই, ভীত হইও না। শ্রীগুরু হৃদয়ে থেকে ভক্তকে কৃপা করেন। অহং-বুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ করিয়া শ্রীগুরুর হাতের যন্ত্র হওয়া এই ভক্তের কাজ।

"গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তজনে।"

"আচার্য্যাং মা বীজানিয়াৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য উচ্চৈঃস্বরে এই কথাই ঘোষণা করিতেছেন।

ভক্ত, ভগবান, ভাগবৎ—তিনে এক, একে তিন, মূলে বস্তু এক, কেবল আকারেতে বিভিন্ন। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বই হইল আউলিয়া চাঁদ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূল কথা।

তোমার গুরুভ্রাতা
ক্ষীরোদ

আর একটী পত্রের অংশ—তাঃ ২০।১২।৪০

………তাঁর কৃপায় বেদনা যেন হয় সাধনা, আপদ যেন হয় সম্পদ, এই হবে আমাদের প্রার্থনা।

আমাদের প্রেমভক্তির পথ। আপদে এই প্রেমের পরীক্ষা। শ্রীগুরু কৃপায় এই তত্ত্ব হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলেই আমাদের শান্তি।

"গুরু আনুগত্য ধর্ম্ম" বেদবিধির অতীত। যাঁহারা বেদ বিধির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চান তাঁহারা ইহাতে তৃপ্তি লাভ করিবেন না।

"সে ধন অমূল্য নিধি, বেদ বিধির অগোচর।"

"শাস্ত্র অন্ধ কূপময়, মরীচিকায় জলাশয়,
ডুবিলেও না জুড়ায়, আশায় রয় বেঁচে,
শুধু তার বিচারেতে, দুঃখ না ঘুচে,
ছাতি ফাটে পিপাসায়, তথাপি ধায় তার কাছে।"

"ভগবৎ বচন বিনে, কি হবে ভাগবত শুনে,
শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে, পণ্ডিত বিচক্ষণ।
গীতা সে পিতার কথা, পুরাতন পুষ্প যথা,
মধুকর না করে তথা, মধুর অকিঞ্চন॥"

এক কথায় বল্‌তে গেলে এই "গুরু-আনুগত্য ধর্ম্ম" সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম নহে, অতি উদার প্রেমভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম, সাধনের ক্রম মাত্র। এই সত্য-ধর্ম্মভুক্ত ছিলেন শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সমুদয় সম্প্রদায়ের লোক। নিজ নিজ গৃহে তাঁহারা পালন করিতেন পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি কিন্তু সাধন ক্ষেত্রে ছিল না কোন বিগ্রহের পূজা, চাতুর্ম্মাস্য, একাদশীর কঠোরতা। বহিরঙ্গে ছিল না কোন সম্প্রদায় বিশেষের ছাপ।

আরও কত মহাভক্ত আছেন কিন্তু সকলের বিষয় জানা না থাকায় লিখিতে পারিলাম না। সুতরাং সকলে ক্ষমা করিবেন। **ভক্তের লীলা বর্ণন ও ভগবানের লীলা কীর্ত্তন একই কথা।** এ কারণ যতদূর জানি, লীলা কীর্ত্তন করিলাম।

এই স্রোতের মুখুয্যে মশাইয়ের প্রিয় শিষ্য, মহাভক্ত ও সাধক ৺জগৎ সেন মহাশয়ের শিষ্যদিগের নাম নিম্নে দিলাম, যথা :—

১। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়

২। শ্রীযুক্ত৺তারাকিশোর চৌধুরী (সন্ত বাবাজী)

৩। শ্রীযুক্ত ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়, "সঞ্জীবনীর" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও সিটি কলেজের professor ছিলেন।

৪। ডাক্তার ৺সুন্দরী মোহন দাশ মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা ৺হেমাঙ্গিনী দেবী (৺ঘোষ মহাশয়ের শিষ্যা।)

৫। প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী। তিনি তাঁহার গুরু শ্রীযুক্ত জগৎ সেনের নিকট দেহ হইতে আত্মা বাহিরে বিচরণ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় দেহ রাখিয়া হাজারীবাগ পাহাড়ে বিচরণ করিতেছেন, ব্রাহ্ম শশী বাড়ুয্যে মহাশয় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ইহা আমি ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরী মোহন দাশের নিকট শুনিয়াছি।

৬। শ্রীকৈলাশচন্দ্র বাগচী।

৭। শ্রীসারদাচরণ, শ্যাম প্রভৃতি।

৮। শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত। ইনি মজিলপুরে বসতি করিতেন ও এই ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। ইনি শ্রীতারাকিশোর চৌধুরীর পরম বন্ধু ছিলেন। ৺জগৎ সেন মহাশয় কলিকাতায় গোয়াবাগানে থাকিতেন ও কবিরাজ ছিলেন।

৯। ৺রমানাথ দে মহাশয়, সাং ফকির চক্রবর্ত্তী লেন, কলিকাতা। ইনি রসিক ভক্ত ও সাধক ছিলেন। ইহার অনেক শিষ্য ছিল। নাম জানি না। ইঁহার পুত্র ৺কানাইলাল দে ও এই ধর্ম্মভুক্ত।

এই সম্প্রদায়ভুক্ত অপরাপর ভক্তগণের নাম নিম্নে দিলাম, যথা :—

১। ৺কানাইলাল দে মহাশয় সাং ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তী লেন, কলিকাতা।

২। শ্রীযুক্ত শীতল মজুমদার সাং ২৫সি, নকুলেশ্বর লেন কালীঘাট, কলিকাতা। ইনি শ্রীযুক্ত ৺গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়ের ভক্তিমান শিষ্য।

৩। ৺বিপিন ঘোষ, গোবিন্দ সরকার লেন, কলিকাতা।

৪। ৺নিতাই গাঙ্গুলী মহাশয়, ১১নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইনি হালিসহরের মহাসাধক ৺রূপ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পৌত্র।

৫। ডাক্তার ৺নন্দলাল দে (৺গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়ের পিতা)।

৬। ৺নিতাই চাটুয্যে, সাং কলিকাতা, বহুবাজার।

৭। ললিত মিত্র, সাং ক্রীক রো, কলিকাতা।

৮। আরও অনেক স্ত্রীপুরুষ ভক্ত আছেন যাহাদের নাম জানা যায় না।

৺কানাইলাল দে মহাশয় রায় মহাশয়ের ভক্তিমান শিষ্য ছিলেন। ইঁহার বাড়ী কলিকাতা ফকির চক্রবর্ত্তী লেনে। ইনি সঙ্গীত ও গীতাশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। গীতার সমস্ত শ্লোক কণ্ঠস্থ ছিল। গীতার শ্লোক সুর সংযোগে গাহিতেন। তাঁহার পিতার নাম ৺রমানাথ দে মহাশয় যিনি এই ধর্ম্মের ৺জগৎ সেন মহাশয়ের পরম ভক্তিমান শিষ্য ও এই ধর্ম্মের সাধক ছিলেন। ৺কানাইলাল দে মহাশয় বৈদ্যনাথধামে সজ্ঞানে শ্রীগুরু স্মরণ করিয়া দেহ রাখেন। তাঁহার স্ত্রী ও শিষ্যা শ্রীমতী মকরবাহিনী দেবী অতি ভক্তিমতী ছিলেন ও তিনিও সজ্ঞানে নাম করিতে করিতে দেহ রাখেন। অদ্যাবধি ৺কানাইলাল দে মহাশয়ের বাটীতে প্রতি রবিবার শিষ্যগণ বৈঠক করেন। তাঁহার শিষ্যগণের নাম যথা :—

ক। ইঁহার উপযুক্ত ও ভক্তিমান ভাগিনেয় শ্রীজগন্নাথ দাস, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ। শ্রীমাণিক লাল দে, সাং কলিকাতা।

গ। শ্রীঅটল বিহারী বসু, সাং কলিকাতা।

ঘ। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাং দর্জ্জিপাড়া, কলিকাতা।

এই বঙ্গদেশে ২২ ফকিরের বহু শিষ্য আছে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে। গুরুর নামে পরিচিত। নিম্নশ্রেণীতে বহু ভক্ত আছেন। তাহাদের ভক্তি প্রগাঢ়।

৺জগৎ সেন মহাশয়ের শিষ্য ৺তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় হাইকোর্টের প্রথিত যশা উকিল ছিলেন। বহু টাকা রোজগার করিতেন। তাঁহার সেভিং ব্যাঙ্কের বই অবধি ছিল না। তিনি খুব দানী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে "খরচের টাকা ভগবান পাঠাইয়াছেন, সুতরাং খরচ হইবে।" কাহারও দুঃখ শুনিলে তৎক্ষণাৎ টাকা দিতেন। মুখুযো মশাইও "টাকা সঞ্চয়ের জন্য নহে, খরচের জন্য" বলিতেন।

এই তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় ১৩০১ সালে রামদাস কঠিয়া বাবার আশ্রিত হন, কিন্তু ভিতর ভিতর এই ধর্ম্ম যাজন করিতেন। ইনি বহু শিষ্য করেন ও হাওড়া শিবপুরে প্রকাণ্ড মঠ স্থাপন করেন। উঁহার শিষ্যরা এই ধর্ম্মের নিষেধ আদি সমস্ত পালন করেন। ইনি "সন্ত বাবাজী" নামে খ্যাত। ইনি ১৩৪২ সালে ২২শে কার্ত্তিক শুক্রবার দেহরক্ষা করেন। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঐরূপ একটী সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া নিজ

শিষ্যদের মধ্যে প্রকারান্তরে এই ধর্ম্মের প্রচার করেন। ৺জগৎ সেন মহাশয় উঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া শিষ্য ৺কৈলাশ চন্দ্র বাগচী মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্রটী লেখেন। ভক্তগণ এই পত্রটি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন :—

শ্রীশ্রীগুরু জয়তি

পরম কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রখানি পাইয়া সকল অবগত হইলাম। যে পর্য্যন্ত ভক্তগণ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট শুনিয়াছেন যে, আমাদিগের নাম **শাস্ত্র সম্মত** নহে সেই পর্য্যন্তই অনেকের এই নামের প্রতি অশ্রদ্ধ হইয়া অনেকেই এই নাম ছাড়িয়া দিয়াছেন।

তারাকিশোর **প্রতিষ্ঠার** ইচ্ছায় একজন নামযুক্ত সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ধার্ম্মিক পদবাচ্য হইবার ইচ্ছায় এ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রথম অনুরাগ তোমার অবিদিত নাই।

গোপী মোহন, বাসদা ও তাহার কনিষ্ঠ আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে তাহাদের এ নামের প্রতি বিশ্বাস নাই। তাহারা তান্ত্রিক নাম করিয়া থাকেন। এক্ষণে তাহাও ছাড়িয়া

গৌরাঙ্গের প্রতি ভক্তিবিশ্বাস হইয়াছে। যাহাদিগের চিত্ত এরূপ পরিবর্ত্তনশীল তাহাদিগের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়। তবে পরিত্যাগের একটা কারণ দেখান আবশ্যক সেইজন্য এইরূপ বলিতেছেন। তবে এখনও যে মধ্যে মধ্যে একবার করিয়া আমাকে দেখিতে আইসেন সে কেবল আমার মান রক্ষার জন্য। বৈঠকের সময় যে গোলমাল হয় বলিয়া তাহারা বৈঠক করিতে পারেন না। সে কেবল ওজর মাত্র। সত্য, আমাদের নাম শাস্ত্র সম্মত নহে কারণ ইহা বেদবিধির অতীত। নাম ও ধর্ম্ম, ইহার পরিণাম এপর্য্যন্ত কাহারও অনুভূতি হয় নাই। যাহাদিগকে তোমরা বড় সাধক ও ভক্ত বলিয়া জান তাহারাও কিছুমাত্র ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। ইহা যে ব্রজগোপিকাদের প্রাণের জিনিষ—দুঃখের বিষয় এই যে, তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

শ্রীনাথ. এক বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিল যে, আমরা এধর্ম্মের অধিকারী নই। যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা আপনার কৃপায় মাত্র। ....

স্রোত বন্ধ হইবে না এবং যদ্যপি একজনও মানুষের মত হয় তাহা হইলেই বলিব যে আমার জন্ম সার্থক।

তোমার পত্র পাইয়া কেহ অসন্তুষ্ট হন নাই। তোমার শরীর সর্ব্বদা অস্বচ্ছন্দ থাকে তাহাতে বড়ই দুঃখিত থাকি।

আরোগ্যের জন্য বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদা গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিবে। ....

ইতি

১৫ই ফাল্গুন ১৩০৫ শুভানুধ্যায়ী

জগৎ চন্দ্র সেন"

এই সেন মহাশয় ১৩০৭ সালে ২৯শে ফাল্গুন মাসে বুধবার রাত্রি ১॥০টার সময় কলিকাতার বাড়ীতে দেহরক্ষা করিয়া শ্রীগুরুপদে লীন হন। ১৩০৬ সালে তিনি হালিসহরে গিয়া তাঁহার ইষ্টদেব মুখুয্যে মশাইয়ের পূণ্য ধাম দর্শন করেন ও চণ্ডীমণ্ডপের সামনের প্রাঙ্গনের মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। ইনি মহাভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ছিলেন। বহু লোক ইঁহার নিকট নাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ও শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় (পরে সন্ত বাবাজী) ইঁহারই শিষ্য ছিলেন যাঁহাদের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু ফকিরঠাকুর রূপে ত্রিবেণীতে গঙ্গা পার হইয়া হালিসহরে আসিয়াছিলেন।

এই হালিসহরে চৈতন্যপ্রভুর শ্রীগুরু প্রভু ঈশ্বরপুরীর আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমস্থ টোলে শ্রীচৈতন্যপ্রভু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রমে একটী ডোবা ছিল। উহাতে প্রভু পড়ুয়াগণ সহ সাঁতার কাটিতেন। একদিন চৈতন্যপ্রভু ঐ ডোবায় ডুব দিয়া গুপ্ত হন। পরে জানা গেল যে প্রভু নিমাইপণ্ডিত রূপে নবদ্বীপে টোল করিয়া বিরাজ করিতেছেন। প্রভু ইহার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া একদিন এই হালিসহরে শ্রীগুরুপীঠ দর্শন করিতে আসেন। নৌকা হইতে তীরে নামিয়াই মস্তকোপরি গঙ্গাতীরের মাটি লয়েন ও বলেন যে "এখানে কুকুরও আমার প্রণম্য যেহেতু ইহা গুরুস্থান।" ধন্য গুরুভক্তি—আদর্শ গুরুপ্রেম।

এই শ্রীঈশ্বরপুরীর আশ্রম শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজী নামক একজন ব্রজবাসী বৈষ্ণব উক্ত "চৈতন্য ডোবা" সহ ক্রয় করিয়া তথায় বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন ও ঐ আশ্রমের নাম হইয়াছে "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর পাট।" উক্ত ডোবার পূর্ব্ব হইতেই নাম ছিল "চৈতন্য ডোবা"। ৶দোলের সময় উক্ত পবিত্র স্থানে মেলা বসে। বহু ভক্ত, বৈষ্ণব, সাধু প্রভৃতি আসেন। সব লীলাময়ের ইচ্ছা।

এই হালিসহরের জাগ্রত দেবী "মা সিদ্ধেশ্বরী" গঙ্গাতীরে আছেন। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির আছে। তথায় ছেলে

বেলায় জগা স্যাকরার চণ্ডীর গান শুনিয়াছি। "মা, মা" রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইত, গঙ্গায় প্রতিধ্বনি হইত ও সকলের চোখে জল পড়িত। কালমাহাত্ম্যে সে সব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মায়ের পূজায় সেরূপ ঘটা বা আড়ম্বর নাই। সে নাটমন্দির আজ শূন্য। নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। দেখিলে প্রাণ বিষাদে পরিপূর্ণ হয়।

হালিসহরের অপর নাম "কুমারহট্ট"। ইহার কারণ, একদা কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বজরা করিয়া গঙ্গায় ভ্রমণ করিতে করিতে প্রাতে হালিসহরে আসিয়া উপস্থিত হন। মাঝিরা বজরা একটী ঘাটে বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে। ইতিমধ্যে মহারাজা বজরায় বসিয়া দেখেন যে একটি নিম্নশ্রেণীর লোক ঘাটে স্নান করিয়া অতি নিস্তব্ধভাবে গঙ্গার স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া উঠিয়া যাইতেছে। মহারাজা তাহার সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কস্তম?" ইহাতে সে ব্যক্তি বলে, "রজকোঽহম্"। মহারাজা আশ্চর্য্য হইয়া বলেন যে, "বাপু, তুমি কি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছ?" তাহাতে রজক বলে, "হালিসহর গ্রামে বহু ব্রাহ্মণের সংস্কৃত টোল আছে এবং তথায় বহু ব্রাহ্মণকুমার সদা সর্ব্বদা সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র আলোচনা করেন। এমতে আমি সর্ব্বদা সংস্কৃত স্তোত্রাদি শুনিয়া সংস্কৃতের

হালিসহরের জাগ্রত দেবী

শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী মাতা

উচ্চারণ ও সংস্কৃতও কিছু শিখিয়াছি, নচেৎ আমি সংস্কৃত জানি না।" মহারাজা এই শুনিয়া বজরা হইতে তীরে নামিয়া হালিসহরে আসেন ও দেখেন যে হালিসহরে বহু সদ্-ব্রাহ্মণের বাস ও ঘরে ঘরে সংস্কৃত টোল আছে। টোলে বহু ব্রাহ্মণকুমার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। সংস্কৃতের ও শাস্ত্রের এইরূপ চর্চ্চা দেখিয়া মহারাজা বড়ই সন্তুষ্ট হন ও টোলে বহু ব্রাহ্মণকুমার দেখিয়া হালিসহরের নাম দেন "কুমারহট্ট"। মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া সদ্ব্রাহ্মণদের জমি দান করেন। উহার নাম ব্রহ্মোত্তর জমি। মহারাজা মহা ধার্ম্মিক ও গুণী ব্যক্তি ছিলেন। হায়! সেই কুমারহট্ট—হালিসহরে এখন একটিও টোল নাই ও সংস্কৃত চর্চ্চাও নাই। কালমাহাত্ম্যে সকলই লুপ্ত হইয়াছে। ঘরে ঘরে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, তাহাও এখন নাই। আছে বড় বড় পাকা বাড়ী, বৈঠকখানা, আর আছে পাট কল ইত্যাদি, বিষয়ের কচকচি। মা গঙ্গার সে তরতর বেগ নাই—মা ক্ষীণ কলেবরা হইয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছেন। স্মৃতি ছাড়া কিছুই নাই। সহরের সভ্যতা প্রবেশ করিয়া সে গ্রাম্য সুখশান্তি নষ্ট হইয়াছে।

এই পুণ্যভূমি হালিসহরে সাধক রামপ্রসাদ সেনের বাড়ী ছিল। এই রামপ্রসাদ শ্যামা সঙ্গীত রচনা করিয়া গান গাহিতেন। মহাভক্ত ছিলেন। ইনিই পূর্ব্বজন্মে পূর্ব্বকথিত ত্রিবেণী ঘাটের

রামপ্রসাদ পাটনী ছিলেন ও খেয়া দিয়া লোক পার করিতেন। ফকিরঠাকুর রামপ্রসাদ পাটনীকে দর্শন দিয়া বলেন যে, "তুমি তিন জন্মে উদ্ধার হবে।" ইনি দ্বিতীয় জন্মে রামপ্রসাদ সেন ও পরজন্মে কাচরাপাড়ার মহাবৈষ্ণব রামচন্দ্র কবিরাজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। হালিসহরে এখনও, সাধক রামপ্রসাদ সেনের সাধনাস্থল "পঞ্চমুণ্ডী ও পঞ্চবটী" বর্ত্তমান আছে। বহুলোক উহা দর্শন করিতে যান। ঐ স্থানে হালিসহরবাসীগণ কালী মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। ৺কালী পূজার সময় তথায় "প্রসাদমেলা" বসিয়া থাকে। বহু লোক সমাগম হয়।

হালিসহরের গঙ্গার ধারে সাধকপ্রবর শ্রীনিগমানন্দ স্বামীর মঠ ও সমাধি আছে। স্বামীজী যোগীপুরুষ ছিলেন। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি ও তাঁহার সহিত অনেক নিগূঢ় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। তাঁহার যৌগিক প্রভাব আমি অনুভব করিয়াছি। তাঁহার ধর্ম্মমতের সহিত এই "সত্য-স্রোতের" সাদৃশ্য আছে। সেইজন্য এই প্রসঙ্গ করিলাম। তাঁহার শিষ্যরা শ্রীগুরু ছাড়া আর কিছুই জানেন না।

এই পুণ্যভূমিতে সত্য-স্রোতের মহাপুরুষ ঠাকুর শ্রীরাম নারায়ণ মুখুয্যে মহাশয় উলা হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন, পূর্ব্বে লিখিয়াছি। মুখুয্যে মশাইয়ের সে 'আটচালা আশ্রম'

এখন নাই। জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বকথিত আটচালাস্থিত গঙ্গার ধারের সেই বটবৃক্ষ ও তুলসীমঞ্চ গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন। এ তাঁহারই ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। মুখুয্যে মশাইয়ের বসতবাটী সংলগ্ন চণ্ডীমণ্ডপও নাই এবং পূর্ব্ব ভিটার চিহ্নও নাই। উহা সংস্কৃত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্ব স্মৃতি ছাড়া কিছুই নাই। সকলই কালের প্রভাবে লয় হইয়া গিয়াছে। সব মালিকের মর্জ্জি।

এখন সাধন সম্বন্ধে কিছু প্রসঙ্গ করিব। শ্রীগুরুর নিকট সুধামাখা নাম শ্রবণে শ্রীগুরুর সহিত জীবের কি মধুর সম্বন্ধ তাহা ভাগ্যবান জীব শিষ্যরূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে ও চেতন প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান কায়াতে প্রাণনাথের দর্শন পাইয়া, অনুভূতি পাইয়া সদা আনন্দে ভাসমান হয়। এই অবস্থা ভগবজ্জন সাধন (বৈঠক) করিয়া উপলব্ধি করেন ও আনন্দে ডুবিয়া যান। গুরুকৃপায় ভক্তের পূর্ণ সঞ্চার হইলে হৃদয়ে ভগবান দর্শন করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ডুবিয়া গিয়া ভক্ত নিবৃত্তিমার্গে অবস্থিত হয়; **গুণহীন** হইয়া, নিষ্কামী হইয়া এই সিদ্ধ দেহে পরম আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করে। সত্যস্বরূপ ভগবান শ্রীগুরুতে সদা

অবস্থিত হইয়া শ্রীগুরুকে সদা অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করেন ও সর্ব্বদা নামানন্দে থাকেন। তখন হিংসা, দ্বেষ থাকে না। সমদর্শীন হইয়া ক্ষমার প্রতিমূর্ত্তি হয়। ক্ষমা মাত্রই শুদ্ধ রাগের উদয় হয় ও চেতন প্রাপ্ত হয়। চেতন প্রাপ্ত হইলে দেহবুদ্ধি বা সংস্কার থাকে না। তখন শ্রীগুরুই হন ভক্তের অহং। শ্রীগুরুচরণ ভক্তের একমাত্র কামনা ও ভক্তের সর্ব্বস্ব। তখন ভক্ত শ্রীগুরুর নাম ও রূপরসে আত্মহারা হইয়া জীয়ন্তে মরা হইয়া থাকে। যে প্রকৃতি জয় করিয়া শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুচরণে সদা লীন হইয়া থাকে তাহাকে "জীয়ন্তে মরা" বলে। ইহা "আত্মসমর্পণ" ধর্ম্ম। ইহাই মধুর প্রেম। সঞ্চার হইলেই অনুভূতি হইবে। এই আত্মহারা অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধক "আউলিয়া" হইয়া যায়।

শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া শরণাগত হইয়া ভক্ত সদাই শ্রীগুরুর দোহাই দেয়। সর্ব্ব আপদের শান্তি হইয়া যায়। শ্রীগুরুই সত্য, প্রতীয়মান হয়। শ্রীগুরুই মুস্কিলে আসান হয়। একমাত্র শ্রীগুরুই বস্তু আর সব অবস্তু জ্ঞান হয়। ইহাই পরম শান্তির অবস্থা। সর্ব্ব-বস্তুতে শ্রীগুরু দর্শন হয়। ইহা গোপী ধর্ম্ম। আত্মহারা না হ'লে, Selfless না হ'লে **গোপী** হয় না। ব্রজ-গোপিনীরা সর্ব্ব বস্তুতে কৃষ্ণ দর্শন করিতেন ও সদা কৃষ্ণসুখে

সুখী। এখানেও ঐ অবস্থা লাভ হয়। উপযুক্ত সন্তান (শিষ্য) হইলে আজ্ঞা সেবায় প্রাণপণে অনুরক্ত হয় এবং পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া সে বুঝিতে পারে যে শ্রীগুরুই সত্য, নিত্য, শ্রীগুরুর বাক্য সত্য, শ্রীগুরু যাহা করান তাহাই করে, শ্রীগুরু যাহা বলান তাহাই বলে, শ্রীগুরু যাহা খাওয়ান তাই খায়, শ্রীগুরু যেমন রাখেন তেমনি থাকে ও শ্রীগুরুসুখে সুখী এবং শ্রীগুরু সঙ্গে সঙ্গী হইয়া সতত থাকে। এই সহজ মানুষে ব্রজগোপিনীদের ন্যায় পূর্ণ আত্মসমর্পণ, প্রগাঢ় ভালবাসা (প্রেম) ও প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকিলে সহজ মানুষ তোমার হন ও তুমি তাঁহার হও। তুমি কাহারও নও একমাত্র তাঁহার এবং তিনি সেইরূপ তোমার। তাঁহাকে না দেখিলে পলকে প্রলয় হয়—এই বিরহের পর মিলনে পরমানন্দ লাভ হয়। পূর্ণ সঞ্চার হইলে এই অবস্থায় অনুভূতি হয়। শ্রীগুরুকে সদা ঠার নজরে রাখিতে হয়। যে জীয়ন্তে মরা হইয়াছে সেই এই বস্তু লাভ করিয়াছে। সংসার নিরপেক্ষভাবে করিয়া যায়। সকলই শ্রীগুরুর কৃপা। তাঁহার কৃপা ছাড়া কিছুই হয় না—সাধনাও হয় না।

"গুরু গুরু সবাই বলে, গুরু চেনা সহজ নয়।
যে চিনেছে গুরু, সে কভু জীয়ন্ত নয়॥"

অর্থাৎ শ্রীগুরুতে যাহার রতি হইয়াছে সে প্রকৃতি জয় করিয়া জীয়ন্তে মরা হইয়া গুরু চিনিয়াছে ও শ্রীগুরুতে ভগবান দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

"গুরু কৃপায় ফুট্‌লে আঁখি দেখলাম পরমেশ্বরে।
কি অপরূপ অভয়চরণ ডুব্‌ল নয়ন সুখসাগরে॥"

গুরু কৃপায় গুরু চিনিলে গুরুতেই ভক্ত অভয়চরণ দর্শন করে। ইহাই বর্ত্তমান প্রেম, বর্ত্তমান আরাধনা। এই দেহেই ভগবান দর্শন হয়। এই জন্যই ইহা পরকেলে ধর্ম্ম নহে। সেই চৈতন্য স্বরূপ, সত্য স্বরূপ, বেদ বিধির অতীত, নিরাকার ও নির্গুণ পরম ব্রহ্ম দয়া করিয়া জগৎকর্ত্তারূপে অর্থাৎ পরম সুখদ শ্রীগুরুরূপে ভবে আসেন ও ভক্তকে দয়া করিয়া দর্শন দেন এবং আত্মহারা নির্গুণ ভক্তের সহিত প্রেম করেন। শ্রীনামের তরী ভাসাইয়া ভক্তকে ভবপারে লইয়া যান। ভক্ত দেহবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির অধীন না হইয়া, জীয়ন্তে মরা হইয়া এই দেহেই, সহজ মানুষেই, ভগবান দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয় ও নবজীবন লাভ করিয়া ভাবে ডুবিয়া যায়। "ভাবে ভরল তনু হরল গেয়ান" অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাকে গ্রন্থিভেদ (Crucifiction) বলে ও ইহার পর নবজীবন লাভ (Resurrection) হয়। ইহাই এই

দেহের পুনর্জ্জন্ম। এই দেহরথে তাঁহাকে দর্শন করিলে আর জন্ম হয় না ও সংসার ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে হয় না। "রথেচ বামনং দৃষ্টা, পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"—কথার অর্থ ইহাই। অটুট ভক্তি বিশ্বাস দ্বারা শ্রীগুরুর কৃপা লাভ হয় ও সঞ্চারী প্রেম হৃদয়ে উদয় হয়।

ভক্ত শ্রীগুরু ভগবানের সহিত "নিত্য আনুগত্য" করিয়া মানব জন্ম সফল করেন। সদা আনন্দময়ের সহিত আনন্দে থাকে ও ভাবসাগরে হাবুডুবু খায়। গোপিনীদের ন্যায় শ্রীগুরু ছাড়া কিছুই জানে না। তাহাদের প্রার্থনা নাই, স্বার্থ নাই, কোন বাসনা নাই, পরকালের চিন্তা নাই। মুক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া একমাত্র গুরুই তাহাদের সর্ব্ব বাসনা, কামনা ও সর্ব্বস্ব হইয়াছে। সদা শ্রীগুরু-পদ-পঙ্কজে মন লাগিয়া থাকে। এই সব নিত্য সিদ্ধ জীব সদাই গুরুসুখে সুখী, সদাই আনন্দে ভাসমান, মুখে সদাই হাসি ও সদা তদ্‌ভাবে ভাবিত।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, পরম সাধক শ্রীশ্রীমুখুয্যে মশাই শিষ্যগণ সহ আটচালায় বৈঠকে (সাধনায়) বসিয়া প্রেমে গলিয়া যাইতেন ও শ্রীমুখ 'চকাবকা' হইত। ইহাকেই বলে প্রেমের পূর্ণ সঞ্চার। আবার বাহ্য হইলে ক্রমশঃ স্বাভাবিকরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেন। সদাই অন্তরে নামরূপ আস্বাদন করিতেন ও ভাবে থাকিতেন।

শ্রীনামে রুচি না হইলে সাধনে অগ্রসর হওয়া যায় না। সদা নামরূপে মজিয়া থাকা চাই। অন্তরে নামানন্দ চলিবে তবে অনুভূতি আসিবে। বহির্ভাগে পূর্ণ সংসারী কিন্তু অন্তরে চূর্ণ ফকির হ'তে হবে ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যেমন "গাছের ফল গাছে রইল বোঁটা গেল খসে।" দরদী হইয়া সদা ভাব পোষণ করিতে হয়। "ভাবের ভাবী না হ'লে, অভাবে কে তাঁরে ধর্‌তে পারে?" সদা ভাবে ডুবিয়া থাকিলে তবে ভাবের মানুষকে ধরা যায়। "সে যে ভাবে আসে, ভাবে যায়, ভাবের ঘরে করে আনাগোনা।" এ সব ভাবের কথা, যে ভাবুক সেই বুঝিবে।

শ্রীগুরুতে যাহার দৃঢ় ভালবাসা হইয়াছে ও যে শ্রীগুরু সহ "নিত্য আনুগত্য" করে তাহার শ্রীগুরু কৃপায় সঞ্চার হয়। ভগবজ্জনের বৈঠকে (সাধনে) বসিয়া যোগক্রিয়া করেন। এই যোগক্রিয়া গুরুগতপ্রাণ প্রেমিক ভক্তদের পক্ষে সহজসাধ্য। একমনে শুদ্ধচিত্তে শ্রীগুরুপদ ধ্যান করিয়া মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীনাম শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ করিলে নাম অন্তরে প্রবেশ করে ও গুরু কৃপায় পূর্ণ সঞ্চার প্রত্যক্ষ হয়। তখন সাধক আপনাতে আপনি থাকে না—অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ডুবিয়া যায়। তখন আত্মা-পরমাত্মার মিলন হইয়া, উভয়ে একাঙ্গী হইয়া আনন্দে হাবুডুবু খায়। সঞ্চার হইলে হাসি, কান্না, স্বেদ, কম্প, নৃত্য প্রভৃতি

লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই অবস্থা প্রকাশ করা যায় না। যাহার সঞ্চার হইয়াছে সেই অনুভব করিয়াছে ও "গুরু সত্য" তাহা বুঝিয়াছে। এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের কাছে পার্থিব ইন্দ্রিয় সুখ তুচ্ছ। মন চঞ্চল হইলে এই যোগক্রিয়া হয় না। যাহার গুরুতে প্রগাঢ় ভক্তি আছে তাহার চিত্তে বৃত্তি থাকে না। সে শ্রীগুরুতে লীন হইয়া থাকে ও সদা নামানন্দে থাকে। শ্রীগুরুচরণে অর্জ্জুনের ন্যায় এক মনে, এক নজরে লক্ষ্য রাখিতে হয়। সদা গুরুরূপ নয়নে 'ঝিলিক' দিবে। যাহার এইরূপ শ্রীগুরুপদে দৃঢ় ভক্তি ও প্রেম হইয়াছে ও নামে রুচি হইয়াছে তাহার বৈঠকে বসিয়া নামরূপ স্মরণ করিবামাত্র সঞ্চার হয় ও আনন্দধামে চলিয়া যায়। বেশী শ্বাস লইতে হয় না। ইহা ক্লীবকে বুঝান যায় না অর্থাৎ 'ঐহিককে' বুঝান যায় না, কারণ সে ইহার অনুভূতি পায় নাই—কেবল শুনিয়াছে ও বই পড়িয়াছে। যে এই দেহে উক্ত অপার্থিব প্রেম আস্বাদন করিয়াছে তাহারই অনুভূতি হইবে ও সাংসারিক সুখ বা দৈহিক সুখ তাহার নিকট তুচ্ছ হইবে। সকলই শ্রীগুরুর কৃপা। মনের লয় হইলে ও সত্যতে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভক্ত গুরুময় জগৎ-সংসার দেখে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধকের ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়। ইচ্ছা করিলে মৃতকে সঞ্জীবিত করিতে সক্ষম হয় এবং ইহাও সংঘটিত হইয়াছে।

এই সত্য-স্রোতে বৈঠকে স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে বসেন না। ইহা একেবারে নিষেধ। স্ত্রীলোকেরা একসঙ্গে পৃথক স্থানে বসেন ও সাধনা করেন। পুরুষের সহিত কোন সংস্রব নাই। স্বামীর নিকট স্ত্রী যদি দীক্ষা লয়েন তাহা হইলে দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ হইবে কারণ শিষ্য হইলে কন্যা সম্বন্ধ হইল। এই স্রোতে দীক্ষার আগে শ্রীগুরু সম্মুখে পূর্ব্ব-পাপ স্মরণ করিয়া শিষ্য গুরুকৃপায় নিষ্পাপ হইয়া পবিত্র হয় ও দীক্ষিত হইয়া শ্রীগুরুরূপী ভগবানকে দর্শন করিয়া ও সঞ্চার দ্বারা অনুভূতি পাইয়া মানবজন্ম সফল করে ও নবজীবন লাভ করে। তাই বলিতেছিলাম, *ইহা পরকেলে ধর্ম্ম নহে, বর্ত্তমানেই সব পূর্ণ হয়।* বর্ত্তমান আরাধনা, বর্ত্তমান উপাসনা, বর্ত্তমান প্রেম যাহা জীবের দুর্লভ তাহা গুরুকৃপায় লাভ হয়। গুরু দর্শনে সর্ব্ব সংশয় ও সর্ব্ব সংস্কার ছিন্ন হইয়া যায় ও শিষ্য গুরুতে স্থিত হয়।

এই স্রোতের বহির্ম্মুখীন কোন বিশেষ চিহ্ন নাই। সদা মনে মনে, শ্বাসে শ্বাসে জপ। জপের মালা নাই। সদা স্মরণ, মনন, নিরীক্ষণ। নাম লইতে জিহ্বা নড়িবে না। নামের সময় অসময় নাই। সর্ব্ব অবস্থায় নাম স্মরণ করিতে পারিবে। নামে রুচি হইলে এই অবস্থা হয়। এই স্রোতের জাতিভেদ নাই। সর্ব্ব জাতি "নাম" (দীক্ষা) লইতে পারে। নাম লইলেই ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়। জীব জগতে ঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছে। সকলকে

প্রেম বিতরণ করিয়া, নাম বিতরণ করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করে। একলা ভোগ না করিয়া সকলে মিলিয়া আস্বাদন করে।

সাধন সম্বন্ধে নিম্নে একটী সাধকের পদ বা সঙ্গীত দিলাম। ভক্তগণ উহা পাঠ করিয়া, ধারণা করিয়া আনন্দিত হইবেন :—

আমার সাধের সাধন ধনে মন ডুবিল।
স্মরণে সে শ্রীচরণে আনন্দে মগন হ'ল॥
অলক্ষ্যে হেরিয়ে পাখী, অনিমিখ র'ল আঁখি,
চক্রবাক্ চক্রবাকী যেন পাইল।
লয় হয় পলক্ বিনে করি কি ব'ল,
পরাণ হয়েছে রাজি, গেল বুঝি জাতি কুল॥
শ্রবণকে ক'রে সাপেক্ষ, পঞ্চজনে হ'য়েছে ঐক্য,
ধরিবে মনোহর পক্ষ পীরিতের আটায়,
নামরসে বশ ক'রলে, আগে রসনায়,
ক'রে লক্ষ মোক্ষ পদ আমায় মজাইল॥
গুরুবাক্য করিবালা, সার করেছে তরুতলা,
চালাইছে সাতনলা, নলে নলে ঠিক,
দরিদ্রে দেখিতে যেন পাইল মাণিক,
নিরখিয়ে প্রেম বিহঙ্গ, অবাক্ অঙ্গ চেয়ে র'ল।

ছাড়িল জীবনের আশ, পরেছে পীরিতের ফাঁশ,
না সরে নিঃশ্বাস পাস একি হইল,
বুঝা নাহি যায়, প্রাণ আছে কি ম'ল,
এ দেশে থাকার আশা, জীবন্তে বাসা ভাঙ্গিল।

(দেহটী তরু-স্বরূপ, তাহার রস প্রেম, ফসল শ্রীগুরু।)

অভিন্নহৃদয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয় আমাকে যে সকল পত্র লিখিতেন তাহা গভীর ভাবপূর্ণ। তাহার কয়েকটী গভীর ভাব নিম্নে দিলাম। ভক্তগণ পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন। তিনি যে উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন তাহা পড়িয়া বুঝিবেন :—

১। শ্রীশ্রীগুরুদেব যে সত্যপথ দেখিয়ে গিয়াছেন সেই পথ ধ'রে থাক্‌তে পার্‌লে আর কোন আকাঙ্ক্ষাই থাকে না।

২। অনেক ভাগ্যে "জীয়ন্তে মরা" হয়। গুরুতে আত্মহারা না হ'লে উক্ত অবস্থা হয় না। তাঁর দয়া ছাড়া উপায় নাই।

৩। মন্ত্র, গুরু, বস্তু তিনে এক, একে তিন। এই জ্ঞান যেন সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকে।

৪। শোনা এক কথা আর বোঝা আর এক কথা। আবার বোঝা এক কথা, আর ভজা আর এক কথা। আর ভজা এক কথা, আর মজা আর এক কথা।

৫। 'ভাবের অঙ্গ প্রেমের গঠন' (এইরূপ ভক্তের ভাব দেহ হওয়া চাই)। বলিতেন—"ভাবে ভরল তনু হরল গেয়ান"। তিনি নিজে সদাই ভাবে থাকিতেন ও ভাব সমাধি হইত।

৬। গোপিনীদের মত আত্মহারা অবস্থা না হ'লে, সদা গুরুসুখে সুখী (Selfless) না হ'লে, গুরুতে প্রেম জন্মায় না।

৭। ভাব স্বভাবে পরিণত করিতে হবে, অর্থাৎ এই কুটীল স্বভাবকে নামরূপ ভাবরসে মজে থেকে প্রেমিকে পরিণত হ'তে হবে। গুরুগত প্রাণ হওয়া চাই—নিজেদের পার্থিব সুখ দুঃখের দিকে একবারও দৃকপাত না ক'রে সর্ব্বদা ভগবানে, গুরুপ্রেমে মজে থাকিতে হবে—পাগল হ'তে হবে। তা'হলেই এই ভাব স্বভাবে পরিণত হবে।

৮। বহির্ভাগে পূরো গৃহস্থালী করিবে কিন্তু মনে মনে চূর্ণ ফকির হবে। ব্যবহারিক সব করবে কিন্তু মোক্ষ্য বস্তু তিনি। সেই দিকে সর্ব্বদা নজর রাখবে।

৯। জয় গুরুজীর জয়, গাও গুরুজীর জয়।
শোকের হোক ক্ষয়, মৃত্যুর হোক লয়,
গাও গুরুজীর জয়,
নাহি শোক নাহি ভয়॥

এইরূপ ভাব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে অর্থাৎ এই চোদ্দপোয়া দেহ মধ্যে ভাবের অঙ্গ প্রেমের গঠন করতে হবে তবেই না "গোপীভাব" আপনাআপনি ফুটে উঠবে।

১০। আমায় তিনি একবার লিখেছিলেনঃ— ধর্ম্মযাজন ত অনেকেই ক'রে থাকেন, কিন্তু কয়জন স্বধর্ম্মজনের প্রতি সুখে দুঃখে সকল বিষয়ে একমন, একপ্রাণ হ'য়ে মেলামেশা ক'রে থাকেন? আপনাতে এই ভাব পূর্ণ বিদ্যমান। ভালবাসা জিনিষটা ছেলেখেলা নয়। দুটি মিষ্টি কথা বলিলেই ভালবাসা হয় না। অন্তর হ'তে যে ভালবাসা উদ্ভূত হয় সে ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা।

১১। ভবসাগর অপার। এপার ওপার হওয়া যায় না। তবে পার হ'বার কি উপায় নাই, আছে। ভবসাগরে যে সব জীব আছে, সেই সব জীবের মধ্যে কোন কোন জীব সদুপদেশে বা সদ্‌গ্রন্থ পাঠে কিছুক্ষণ জগৎ-সংসার ভুলে যায়, আবার পরক্ষণে

ভবসাগরে প’ড়ে হাবুডুবু খায় ও সংসার চিন্তায় জর্জ্জরিত হয়। এই সব জীবের মধ্যে কোন কোন জীবের গুরু বা ব্রহ্ম কৃপায় পালক ও ডানা জন্মে। সেই ডানার বলে কিছুক্ষণ শূন্য সম্ভোগ করে। আবার ডানার বল ক্রমে গেলে ভবসাগরে হাবুডুবু খায়। এইরূপ অভ্যাস বা সাধন করতে করতে যখন জীব স্থির বাতাসে গিয়ে পড়ে তখন আর ভববন্ধন থাকে না, ভবসাগরে প’ড়ে হাবুডুবু খায় না। ভগবৎ প্রেমে বিভোর হ’য়ে কালাতিপাত করিতে থাকে।

১২। যতই দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা হউক, সকলই দেহের ধর্ম্ম, আত্মার নয়। সমস্ত প্রফুল্ল মনে সহিয়া গুরুপদে মজিয়া থাকা চাহি, কেননা, তুমি তাঁহার হইয়াছ। তাই সর্ব্বদা মনে রাখ্‌তে হবে:—

“ঢেঁকিতে কুট্‌বে, কুলাতে উড়াবে আর ভিতর থেকে হাত জোড় ক’রে বল্‌তে হবে ঃ

আমি তোমারি—
তোমারি, তোমারি,
সম্পদে তোমারি,
বিপদে তোমারি,
জীবনে তোমারি,
মরণে তোমারি,
শুধু তোমারি, শুধু তোমারি।”…নবীন রায় মহাশয়

১৩। আর একস্থানে লিখেছিলেন :—

যা শুনেছ নির্জ্জনে বসি,
সে ত কথার কথা নয়,
কি ভয় মরণে আমার
যদি তুমি সুধারাশি সঙ্গে রও।
চাহিলে দেখি তোমায়,
জিজ্ঞাসিলে কথা কও॥

আরও কত মধুর বাণী লিখিয়াছিলেন তাহা সমুদয় লিখিলাম না। তিনি একনিষ্ঠ প্রেমিক সাধক ছিলেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার জীবন নিঃসঙ্গ হইয়াছে। তাঁহার তিরোভাবের পর আমি তাঁহার "ধর্ম্মজীবন" ১৩৫৩ সালে প্রকাশ করিয়াছি। উহাতে এই স্রোতেব অনেক তথ্য নিহিত আছে। উহা এই পুস্তকের পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

সত্য-স্রোত

অভিন্নহৃদয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়ের নিকট হইতে পরম পূজনীয় ৺নবীন চন্দ্র রায় মহাশয়ের যে অমূল্য বাণীগুলি সংগ্রহ করিয়াছি তাহা নিম্নে দিলাম। ভক্তগণ ইহা পড়িয়া কত যে আনন্দ ভোগ করিবেন তাহা বলিতে পারি না। বাণীগুলি এত মধুর যেন সজীব হইয়া কথা কহিতেছে, অনুভব হয়। মহাসাধকের ভাবের কথা। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবাবুর নিকট আমি এই অমূল্য দানের জন্য চিরকৃতজ্ঞ।

মহাবাণী

১। ভাবে ডুবে থাক্‌রে আমার মন।
ভাবের অগাধ জলে ডুবে তলিয়ে গেলে,
হৃদ-কমলে দেখতে পাবি মানুষ রতন।

২। ডাক্‌লে বঁধু পাইনে সাড়া,
না ডাক্‌তে বড় আপনি এলে,
ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি,
ধরা কি যায়, আপনি ধরা না দিলে।

৩। কি দিব গুরুর পরিচয়,
গুরু গুরু সবাই বলে, গুরু চেনা সহজ নয়,
যে চিনেছে সে মজেছে সে কভু জীয়ন্ত নয়।
গুরু ব্রহ্ম, গুরু ব্রহ্ম, গুরু ব্রহ্ম, শাস্ত্রেতে কয়,
যেই নাম সেই বস্তু, সেই গুরু জানিও নিশ্চয়,
ভেদাভেদ কর্ত্তে গেলে, নরকে যেতে হয়।

৪। মনের কথা কইব কি, তা কইতে মানা,
দরদী বিনা প্রাণ বাঁচে না।
যে জন দরদী হয়, দরদ বোঝে,
বেদরদী ভাব জানে না।

৫। সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিও ঐক্য,
না করিও অন্য অভিলাষ।

৬। মন্ত্রের স্বরূপ হন অখিলের পতি।
সেই মন্ত্র সিদ্ধ হ'লে একধাম প্রাপ্তি॥
শ্বাসে শ্বাসে কর নাম, ঘুচে যাবে মোহ কাম,
তব স্বরূপ উদয় হবে শীঘ্রগতি॥

৭। বুঝি অধর চাঁদ, দিয়েছে ধরা।
তাই তোর নয়নে বহে প্রেম অশ্রুধারা॥

৮। রসিক সুজন হয় যে জনা,
নয়নে তার যায় গো চেনা,
সে দুএক জনা।

৯। (মন) তুই দুর্ব্বল পেয়েছিস্ আমায়,
তোকে বলবানের হাতে দোবো।

১০। মনের কথা কইব কি, তা কইতে মানা।
রসের রসিক হয় যে জনা,
নয়নে তার যায় গো চেনা
সে দুএক জনা।
সে রসে ভাসে, প্রেমে ডোবে
করে উজান পথে আনাগোনা॥

১১। একবার ডেকে দেখনা একবার ডেকে দেখনা।
তোর সবশ অঙ্গ অবশ হবে এখনি॥

১২। বসে বৃক্ষ মূলে, আপন ভুলে,
গুরু বলে ডাক্‌না দেখি।

১৩। তুমি বই আমার আর কেউ নাই
আমার আর কেউ নাই।

এই যে **আমার তুমি**, তুমি তুমি তেঁই ব'লে
আমার কেবলমাত্র তুমি ॥

১৪। যে ভাবে রাখিবে তুমি, সেই ভাবে থাকিব।
সইতে না পারি যদি, তোমার পায়ে ধরে কাঁদিব ॥

১৫। বিপদে পড়িয়ে ডাকি তোমাকে,
আমাকে রক্ষা কর, তোমার **দোহাই**।

১৬। কে এসেছে ঘরে, কে এসেছে ঘরে।
একবার বদন তুলে, দেখনা তারে ॥

১৭। এ মানুষে আছেরে মানুষ রতন।
ও তার **ভাবের অঙ্গ প্রেমের গঠন** ॥

১৮। একবার ডাক্‌না তারে, ডাকনা গুরু বলে,
সে যে অধমতারণ, পতিতপাবন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু।

১৯। গুরু বলে ডাক্‌রে আমার মন,
ভাবের অগাধ জলে, ডুবে তলিয়ে গেলে,
হৃদ্‌কমলে দেখতে পাবি মানুষ রতন।

২০। দেখ্‌ না রে মন, হয়ে সচেতন,
কে এসেছে তোর ঘরে।

ও যে অগতির গতি, অখিলের পতি,
ওর বসতি ভক্ত হৃদিমন্দিরে ॥

২১। তোর দুয়ারে আনন্দ বাজার,
চেয়ে দেখরে মন।
একবার বদন তুলে, চেয়ে দেখরে মন ॥

২২। এই মানুষে আছেরে মানুষ রতন।
ওযে রসে ভাসে, প্রেমে ডোবে,
ও তার রস রতি উজান চলে ॥

২৩। কোথা হতে এসেছে এ রসের গোরা।
সে আপনার ভাবে আপনি মাতোয়ারা,
দেখ্‌তে জীয়ন্ত কিন্তু মরা ॥

২৪। কি ভয় মরণে আমার যদি তুমি সঙ্গে রও।
চাহিলে দেখি তোমায়, জিজ্ঞাসিলে কথা কও ॥

২৫। মার কোলে শুয়ে আছি,
বল আমার ভাবনা কি।
চুকু চুকু মাই খাই,
মার বদন পানে চেয়ে রই,
বল আমার ভাবনা কি ॥

২৬। ধীরে ধীরে চল কালাচাঁদ,
(প্রাণনাথ) আমি তোমার সঙ্গে যাব।
আমি জেতে নারী, চলিতে নারি,
তোমায় না দেখলে, আমি পথ হারাই॥

২৭। কি ছার জীবনে আমার, যদি তুমি না সঙ্গে রও।
চাহিলে না দেখি 'তোমায়, জিজ্ঞাসিলে না কথা কও॥

২৮। অসাধ্য সাধন, হে নাথ, এত হবার নয়।
ভরসা কেবল মাত্র, আপনি তুমি দয়াময়॥

২৯। সাধন সম্পন্ন আমার হবে কতদিনে।
ত্যজে দেহ, হয়ে স্নেহ, মগ্ন হব তব শ্রীচরণে॥

৩০। এবার ভেসেছে তরী, এবার ভেসেছে তরী।
আনন্দে দাঁড় বেয়ে চল্, ছেড়ে আপন জারিজুরী।
ও তুই অবহেলে যাবি পারে, ওযে হাল ধরেছে শ্রীনাথ কাণ্ডারী।
গাইতে থাক্ নামের সারি॥

৩১। যে জন চেতন দিলে ও তোর অচেতন ঘরে,
একবার চেতন হয়ে দেখনা তারে।
সে ধন বেদ বিধিতে নাই, খুঁজলে না পাই,
বিরাজ করে ভক্তের হৃদমন্দিরে॥

৩২। একবার ডাক্‌না গুরু বলে, একবার ডাক্‌না গুরু বলে,
তিনি যে অধমতারণ, পতিতপাবন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু।

৩৩। ভাবে ভরল তনু, হরল গেয়ান।
পুরুষ প্রকৃতি হয়ে ভজ ভগবান॥

৩৪। **সহজ** ভাব মাধুর্য্য, মানব লীলা।
প্রাণ গেলেও ছাড়তে পারবো না, পারবো না॥

৩৫। পূর গৃহস্থ, চূর ফকির। ......মুখুয্যে মশাই

৩৬। ভক্ত বড় শক্ত, অতিথি রইল বসে।
গাছের ফল গাছে রইল, **বোঁটা গেল খসে**॥

৩৭। অযোনি মানুষ, সজনি মানুষ,
মানুষ বড়ই দূরের দূর।
জীয়ন্তে মরিয়ে যে জন ভজে,
সেই সে ভকত শূর।

৩৮। আজ সত্য কাল মিথ্যা, বেধর্ম্ম।
আজ সত্য কাল সত্য, স্বধর্ম্ম।
সত্য বল সঙ্গে চল॥

৩৯। ঢেঁকি দিয়ে কুটবে, কুলোর বাতাস দিয়ে উড়োবে,
আর ভিতর থেকে বল্‌তে হবে, **আমি তোমারই**।

৪০। নামের স্বরূপ হন অখিলের পতি।
সেই নাম সিদ্ধ হলে, একধাম প্রাপ্তি॥

৪১। Keep the fire always burning.

৪২। অধর চাঁদকে ধরবো বলে,
ফাঁদ পেতেছি হৃদ্‌কমলে।

৪৩। সে যে অগতির গতি, অখিলের পতি,
বসতি ভক্তহৃদিমন্দিরে।

৪৪। গুরু গুরু সবাই বলে, গুরু চেনা সহজ নয়।
যে চিনেছে সে মজেছে, সে কভু **জীয়ন্ত** নয়॥

৪৫। অসাধ্য কৃষ্ণপ্রেম, সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

৪৬। কে আজ এসেছে ঘরে,
অধর চাঁদকে যায় না ধরা,
বাঁধা যায় কেবল ভক্তিডোরে।

৪৭। **গোপিনীদের মতন না হলে কিছু হয় না।** গুরু সঙ্গ নিত্য করিতে হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া করিলে তবে রঙ ধরে। গাঙ্গুলী মশাই।

৪৮। আমি কার, কে তোমার, আমাতে দেখিছি সব।
আমি পুরুষ কি নারী, বুঝিতে না পারি,
আমি কি তুমি, তেঁই তেঁই তোমায় বলি
তুমি তাহা দেখহ বিচারি।

৪৯। সে ঘরের উল্টো চাবি,
কলে কৌশলে খুলতে পারলে
অমূল্য নিধি কতই পাবি। মুখুয্যে মশাই।

৫০। এক জরু, সব মাই।
এক গঙ্গা, সব খাই॥ মুখুয্যে মশাই।

৫১। ভাবিলে ভাবনা বাড়ে।
তোমা নিধি ভাবিলে ভাবনা কমে॥

৫২। Until a man be born again, he cannot enter into the Kingdom of God অর্থাৎ দীক্ষা না হইলে এই দেহের পুনর্জন্ম হয় না ও শ্রীভগবানের অনুভূতি লাভ হয় না।

৫৩। "ভাব স্বভাব" শ্রীগৌরীশঙ্কর দে।

অর্থাৎ ভাব স্বভাবে পরিণত করিতে হইবে।

৫৪। স্বভাব ছাড়িতে নারে, ভাবের দোহাই দেয়।

স্বভাব ছেড়ে, ভজে যে, ভজি তার' পায়॥

৫৫। ভাব স্বভাবে পরিণত হবার নাম ধর্ম্ম।

৫৬। কি ধন পেয়েছি বল্‌ব কি,

কেউ কি তা বল্‌তে পারে।

বোবা যেমন দেখে স্বপন, আপনা আপনি গুম্‌রে মরে!

অবাংমনসোগোচরো, শাস্ত্রে বলে যাহারে॥

৫৭। সহজে আসে সহজে যায়,

সহজের খবর কেউ না পায়।

সহজের খবর পায় যে,

তিন লোকের ঠাকুর সে॥

৫৮। বাহ্যে যেরূপ দেখ সে কিছু নয়—

অন্তরে যেরূপ দেখ সেও হত হয়।

গোপীভাবামৃত পানে যার লোভ হয়,

বেদ ধর্ম্ম ত্যজি তারে **সত্যরে ভজায়**॥

৫৯। Forgive and you shall be forgiven.

৬০। Judge not and you shall not be judged.

৬১। Hate sin but not the sinners and his friends.

৬২। Love thy God with all thy soul, mind heart and strength.

৬৩। Love thy neighbours as thyself.

৬৪। কর্ত্তার ভজন আর সত্যের পালন।

৬৫। মূল মন্ত্র—আত্মসমর্পণ।

৬৬। সত্য নিত্য বস্তু, তাহা দেশ কালে আবদ্ধ নহে।

৬৭। ধর্ম্মের রক্ষা ধর্ম্ম করে। ধর্ম্মের সাহায্যে আমরা আত্মরক্ষা করি। আত্মরক্ষার মূলমন্ত্র—আত্মসমর্পণ।

৬৮। সত্যের অনুসরণ বা আনুগত্য, সত্যের পালন।

৬৯। ধর্ম্ম মানে যাহা ধ'রে পরম বা নিত্য সত্য লাভ হয় বা জীবে রক্ষা পায়।

৭০। "সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্য,
হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
পক্কাপক্ক করিবে বিচার।"

অর্থাৎ শ্রীগুরুবাক্য, শাস্ত্রমার্জ্জিত চিত্ত অর্থাৎ সাধন দ্বারা যে চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে তাহা দ্বারাই সত্য নির্দ্ধারণ করিবে। গুরুবাক্যই সত্য। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ।

৭১। যেই নাম সেই গুরু, ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

৭২। যা শুনেছ নির্জ্জনে বসি,
সে ত' কথার কথা নয়, সুধারাশি।

৭৩। "কম খাও, গুম্ খাও।" অর্থাৎ কম খাবে ও কম কথা কহিবে।

৭৪। "জাহাজী চাল।" অর্থাৎ সত্য-স্রোতে ভেসে সত্য দেশ হইতে এই সত্য বস্তু (শ্রীনাম) জাহাজে করিয়া অর্থাৎ শ্রীগুরু মুখে এই দেশে আসিয়া জীবের ভবক্ষুধা মিটাইয়াছে।

৭৫। আমি নরাধম, ওহে পতিতপাবন,
আগেই ত' জেনেছিলে,
(তবে) এখন কেন নিঠুর হ'লে।

৭৬। সে মানুষ কোথায় মিলে,
যার নাইকো রোষ সদাই সন্তোষ,
গুরুর ইচ্ছায় চলে বলে।

৭৭। তাঁকে পেতে হ'লে পাগল হ'তে হবে।

৭৮। ভক্ত জেনো তারে,
(যারে) দেখ্‌লে মনে পড়ে, তাঁরে।

৭৯। গুরু ব্রহ্ম, গুরু ব্রহ্ম, গুরু ব্রহ্ম ন সংশয়ঃ।

৮০। যাহা মুস্কিল তাহাই আসান।

৮১। যিনি সাপ হ'য়ে কাটেন,
তিনিই রোজা হ'য়ে ঝাড়েন।

৮২। (ও) গুরু! নিয়ে চল আমায় হাত ধরে,
আমার একলা যেতে ভয় করে।

৮৩। যে যার সে তার,
যুগে যুগে অবতার।

৮৪। পেয়ে ভজা, আর ভজে পাওয়া।

৮৫। "ভাবসিদ্ধ" হ'তে হবে।

৮৬। অনুরাগ বিনে ভজন বৃথা।

৮৭। ভক্তাধীন ভগবান।

৮৮। কেন কঠিন হ'লে, কেন কঠিন হ'লে।
আমি নরাধম, তুমি পতিতপাবন,
আগে তুমি ত তা জেনেছিলে,
কেন কঠিন হ'লে॥

৮৯। কে শুনালে গুরুকৃষ্ণ নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

৯০। নিরুপাধি গুরুপ্রেম সাধ্য কভু নয়,
উপাধি থাকিতে দেহে বিন্দু না পরশে।

৯১। সহজভাব মাধুর্য্য—মানবলীলা,
ছাড়তে পারবো না।

৯২। কখন হাল্‌সে বেহাল, কখন নটবর বেশ।

৯৩। পূর্ব্ব উল্লিখিত এক শিষ্ট গুরুভক্ত কাচারাপাড়ানিবাসী মাণিক ময়রাকে কেহ "গুরুর উপযুক্ত চেলা" বলিলে উত্তরে বলিতেন—"চেলা? কুপিয়ে কুপিয়ে একটু ছিলে বার হয় না—সে আবার চেলা।"

৯৪। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব,
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।

মালি হইঞা সেই বীজ করয়ে রোপণ,
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করিয়ে সিঞ্চন।
বীজ হইতে লতা উঠি বৈকুণ্ঠে ধায়,
গুরুকৃষ্ণ পাদপদ্মে করয়ে আশ্রয়।
তেমতি সাধক রয় ভক্তিলতা প্রায়,
গুরুকৃষ্ণ পদে ম'জে প্রেমে ডুবে রয়,
কর্ম্মভোগ করিবার তরে আর জনম না হয়।

৯৫। আকাশের বিজলীকে মানুষ মর্ত্তে Positive ও Negativeএর বলে ধরে এনেছে, সেইরূপ ভক্তি বিশ্বাসের বলে ভগবান মানুষের মধ্যে ধরা পড়েছে।

৯৬। বৃথাই জনম তার, যে গুরুকৃষ্ণ পদে লভে না আশ্রয়।

৯৭। যাহা মুস্কিল তাহা আসান,
তাঁরই নাম মুস্কিল আসান।
তাঁরই নাম বিপদভঞ্জন—
তাঁর শ্রীনামই সঙ্কটত্রাণ।
তিনিই আপদে বিপদে রক্ষাকর্ত্তা হন।

৯৮। ডুব দিলাম সুধাসিন্ধু হেরি,
এখন বিষের জ্বালায় জ্বলে মরি।

৯৯। ঐশ্বরিক ভাবকে স্বভাবে পরিণত করিতে হবে, অর্থাৎ
ভাবসিদ্ধ হতে হবে। শ্রীগৌরীশঙ্কর দে।

১০০। অনেক দেবতা আছে সাধু তরিবারে,
পতিত উদ্ধার করে ঠাকুর বলি তারে।

১০১। বেদনা যদি দাও গো প্রভু, শকতি দাও সহিতে,
হৃদয় আমার যোগ্য কর গো তোমার বাণী কহিতে।

১০২। কেন তোরে পাগল করে মন।
সে কি তোর বস্তুতত্ত্বে,
কিম্বা তোর মনস্তত্ত্বে,
করে গমনাগমন।
কিম্বা তোর ভাবের ঘরে,
ভাবের খেলায়
করে আলোড়ন॥

১০৩। গুরু-নারায়ণ—পরাকরা,
গুরু-নারায়ণ—পরাবেদা,
গুরু-নারায়ণ—পরাগতি,
গুরু-নারায়ণ—পরাভক্তি,
গুরু-নারায়ণ—পরামুক্তি।

১০৪। গুরু ভরসা আমারি,
গুরু ভরসা আমারি,
আমি সদা গুণ গাহি, গুরু চরণোপরি।
বিপদে আমারি, সম্পদে আমারি,
মঙ্গলে আমারি, মঙ্গলে আমারি,
সর্ব্বকালে আমারি,
আমারি আমারি।

১০৫। প্রভু! এ দাস,
তোমার বলে বলীয়ান,
তোমার তেজে তেজীয়ান,
তোমার মহিমায় মহীয়ান,
তোমার গরবে গরীয়ান।

১০৬। তব কৃপায় যে জন পায় কায়াতে সন্ধান।
সংসার চক্রেতে কভু সে নাহি হয় ভ্রাম্যমান॥
ভাবের হিল্লোলে চলে গলে তার কঠিন পাষাণ।
কল খেলে ক্ষিতিতলে, অতল সিন্ধু উজান চলে॥
বিনা মেঘে ভাসে জলে, ধ্যানীর ভাঙ্গে ধ্যান।
প্রাচীন হইয়া ব্রহ্মা, অর্ব্বাচীন হয়, হারায়ে জ্ঞান॥

১০৭। সখী!

একি জনরব, মানুষে মেলে মানুষ শিবেরি দুর্লভ।

সদয় হইয়া জীবে, অধরচাঁদ এসেছে ভবে,

শুনিয়া করিছে সবে আনন্দ উৎসব।

পাইয়া মানুষ ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্মাকর্ম্ম,

ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম ছাড়িছে প্রণব॥

পরাণ ব্যাকুল লোভে, একত্ব পাইব কবে,

ভব নাহি পায় ভেবে, পাইবে মানব।

অধৈর্য্য হতেছি প্রাণে, ধৈর্য্য ভূরি নাহি মানে,

শ্রবণে সুধা বর্ষণে মানিলাম সম্ভব॥

১০৮। সাধু কার্য্য সাধু বিনে কেবা জানে কোথায়।

১০৯। স্বরূপে তোমারে কই, আমি আর নাই আমারে।

১১০। সে ত জীবের সাধ্য নয়, তবে যদি সে যোগ হয়,

স্বভাব পরাজয় করিতে থাক।

অগ্রে কর প্রাণ অর্পণ, লহ গুরুর স্মরণ,

চরণ ধ'রে তার করণ শেখ॥

১১১। মনের মানুষ মেলে যদি

সেধে পায়ে ধরে, প্রাণ দিবে সাধি।

হ'ল না প্রেম গুরুচাঁদে, বেদবিধি বিবাদী।

১১২। কে পারে এ পারে তারে, ধরতে বেদাচারে।

১১৩। গুরু পদে কর পিরীতি।
পেলে ত আশার সুসার, দেখা হল পরস্পর॥

১১৪। গুরু সত্য যদি **সত্য মান**, দৃষ্ট হবে বর্ত্তমান।

১১৫। ধরিয়ে মানব আকার,
গুরুব্রহ্ম রূপ অবতার,
নমস্কার শত শতবার, চরণ যুগলে।

১১৬। মনের মানুষ না হ'লে, গুরুর ভাব জানা যায় কিসেরে,
(গুরুর প্রেম জানা যায় কিসেরে।)

১১৭। অনুরাগ নইলে কি সাধন হয়,
ভজন সাধন মুখের কর্ম্ম নয়।

১১৮। গুরুরূপের পুলক, ঝিলিক দিতেছে যার অন্তরে,
(ঝিলিক দিতেছে যার অন্তরে)।
তার কিসের ভজন, কিসের সাধন, লোক জান্‌বে কিরে
(এই ভাব লোক জান্‌বে কিরে)॥

১১৯। আমার মন-পাখী বিবাগী হয়ে ঘুরে মরো না।
ভবে আসা যাওয়া যে যন্ত্রণা, জেনেও কি তা জান না

দেহে আট কুটুরী, রিপু ছয় জনা,
মন থেকো, হুসিয়ার থেকো, যেন মায়ায় ভুলো না॥

১২০। আমি দেখে এলেম সৎ গুরুর হাটে,
আমার মন প্রাণ হরে নিল প্রেমের বরিষণে।
একে মোর জীর্ণ তরী,
বোঝাই তাই হয়েছে ভারী,
সাধনের করণ ভারী
বোঝগে সাধুর কাছে॥
কাঙ্গাল কয় গেল বেলা,
ছাড় ভাই রসের খেলা,
কাঙ্গাল সাঁইএর যুগল চরণ,
নিল দেল দরিয়ার ঘাটে।
আমি দেখে এলেম সৎ গুরুর হাটে॥

১২১। বাদী মন কারে বলেরে আপন,
যারে বল আপন আপন।
আপন নয় সে নিশির স্বপন,
পর কখন হয়রে আপন?
(ওরে পাগল মন) কারে বল্‌বে আপন॥
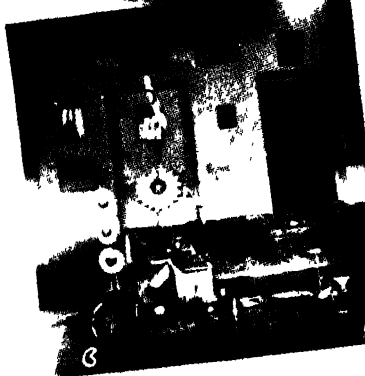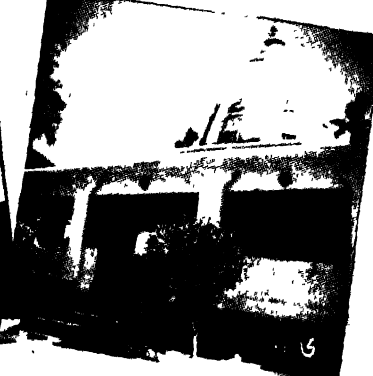
সত্য-স্রোত

এক দেড়াকে (বৃক্ষে) পঞ্চ পাখী,
তারা আছে পরম সুখী,
বেলা গেলে চলে যাবে,
যার যেখানে মন।
কারে বল্‌বে আপন॥ (ওরে পাগল মন)

১২২। গুরু কৃপা করলে তবে অনুভূতি হয়, তবে দর্শন হয়।

১২৩। সবার মাঝে আছেন নারায়ণ।

১২৪। নিজেকে গুরুতে নিবেদিত করিবে। দেহ মন সকলি নিবেদিত।

১২৫। পূর্ণ আত্মসমর্পণে পূর্ণ ভালবাসা লাভ। যতটুকু দিবে ততটুকু পাবে। প্রাণ বিনিময়ে প্রাণ পাওয়া যায়।

১২৬। Pope Pius XII :—

"He has crucified his flesh and enjoying life and spirit and does not think of any word. He abhores cruelty but puts those who employ cruelty. He follows 'Truth, Suffering, Pity and Faith.' His motto is, '**Peace** to everyone without destruction of Caste, Creed and Colour,' Ultimatum of Life is **Peace**."

১২৭। প্রকৃতির অন্তরালে এক **আনন্দময় সত্ত্বা** আছে। এই আনন্দময় সত্ত্বার প্রকাশে সমস্ত ভূত মধুময়, আনন্দময়। এই রসময় সত্ত্বাই প্রকৃতিকে নানারূপে সজ্জিত করিতেছে, সমস্ত রস, সমস্ত সৌন্দর্য্য এই সনাতন সত্ত্বা হইতে উৎসাধিত হইতেছে। **রসস্বরূপের রস প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দিত হয়।** এই **পরমাত্মাই (শ্রীগুরু)** সমস্ত ভূতের আনন্দের হেতু। যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। **তিনি অনুভূতিস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ।**

১২৮। অসুখাদি দেহের ধর্ম্ম। আত্মার ধর্ম্ম নয়। গাঙ্গুলী মশাই।

১২৯। এটী গুণহীন ধর্ম্ম। গাঙ্গুলী মশাই।

১৩০। **গোপীনীদের** মত না হলে হয় না। গাঙ্গুলী মশাই।

১৩১। সব ঘড়ি ঘরকি।
এক ঘড়ি হরকি॥ মুখুয্যে মশাই।

নিম্নে কতকগুলি এই ধর্ম্মের দেহতত্ত্ব বিষয়ক ও ভাবের উচ্চস্তরের গান ও কথা দিলাম। ইহা ভক্তগণ পড়িলে বড়ই আনন্দ পাইবেন ও আশা করি গভীরভাবে গানের মর্ম্মগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবেন :—

১। যাবৎ দেহে প্রাণ রবে আমি তোমারি, আমি তোমারি।
রাখ তোমারি, মার তোমারি, তবু তোমারি, শুধু তোমারি॥
বিপদে তোমারি, সম্পদে তোমারি,
জীবনে তোমারি, মরণে তোমারি,
শুধু তোমারি॥
(এই হ'লে প্রেমের সিদ্ধি হয়)

২। যে জন চেতন দিলে, তোর অচেতন ঘরে,
একবার ডাক্‌না তারে, একবার ডাক্‌না তারে,
একবার চেতন হ'য়ে মন প্রাণ ঐক্য ক'রে
ডাক্‌না জয়গুরু, শ্রীগুরু ব'লে।
সে যে বেদবিধির অগোচর, ব্রহ্মা পায় না ধ্যানে,
একবার বিষয় ত্যজে, অহং ত্যজে, ডাকনা জয়গুরু ব'লে,
সে যে দয়াল গুরু এসেছে ভবে, ওযে নামের তরী ভাসিয়েছে,
পারের ভাবনা কিরে. জীবের ভাবনা কিরে॥

৩। নোনা গাঙ্গে সোনার তরী বেয়ে যায়।
সে যে রসিক নেয়ে, ঠাণ্ডা হ'য়ে বাগ বুঝে পাড়ি জমায়॥
ওহে, ও হৃদয়নাথ নেয়ে, তোমায় বল্‌ছি পায়ে ধরে,
আমার এ জনমটা পার করে নাও, দীন হীন বলে,
মুখে বলো জয়গুরু, গুরু, হায় গো ভব পারে যাই॥

৪। তুফান আস্‌তেছে কস্যে,
জলে জল যাবে মিশে,
মাঝি হাল ধর কস্যে,
আর যাহা নৌকা তাহা তুফান,
নৌকা রাখ কি কারণ,
ওরে মাঝি দাঁড়িয়া শোন।
মাঝি সত্য বাদাম লও,
ধীরে ধীরে বাও,
কেন তুফান পানে চাও,
হাল ধরেছে নিরঞ্জন॥

৫। ওকে ডাঙ্গায় তরী যায় বেয়ে, কোন রসিক নেয়ে,
আছে দাঁড়ি মাঝি দশ জনা,
ছয়জনা তার গুণটানা,
সে কে তা জেনেও জান্‌লি না।
আনন্দেতে যাচ্ছে বেয়ে,
যত অনুরাগী সারি গেয়ে একজন রসিক নেয়ে,
আছে ডিঙ্গি ভরা বস্তু ধন
বস্যে প্রেমের মহাজন,
তার চৌকি পঞ্চজন॥

৬। ক্ষ্যাপা এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনে ভজন কর।
যখন পালাবে সে রসের মানুষ, পড়িয়া রবে শুধুই ঘর॥

৭। সত্য বলে সুপথে চল আমার মন।
যদি পাবি সে' শুদ্ধ সত্য বস্তু ধন, এই কথা শোন।
জোর করি চালাবে কমি ঠেকিবে সঙ্কটে,
শমন ধরিবে জটে,
আর ফেরেফারে দিতে হবে করে্য ষোল্ আন্ ভুক্তন।
ফড়্যা যারা মজবে তারা
বাটখারা যাদের কম ধরে, তসিল করবে যম,
আর গদীয়ান জহুরী যারা, বস্তে ব্যাপার করছে প্রেমরতন।
মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক যেতে পারবে না,
পথে আছে এক থানা,
সোনারবেণে সোনা চিনে, নেবে নিক্তিতে করে ওজন॥

৮। দরবেশ করোয়া ধারী,
প্রভু আমার অটল প্রেমের অধিকারী,
প্রভুর ব্রজের নামটী বংশীধারী,
নবদ্বীপে গৌরহরি,
এযে করতেছে ফকিরী,
আউলে নাম করে্য জারি।

দরবেশ দরদি বটে,
যখন যা চাও তাই ঘটে,
তবে মিছে পূজা ঘটে পটে,
দেখ সেরূপ নেহাব করি।

৯। ধন্য গুরুরে পাগল গোঁসাই,
আহা মরি মরি গুণের লইয়া বালাই।
নাহি কিছু গুণেব শেষ, চন্দনে ছাড়ি আবেশ,
অঙ্গে মাখেন ছাই।
কি কব ধ্যানের কথা, লেঙ্গুটী আর ছেঁড়া কাঁথা,
গোলামে এলাম দাতা সবে বাদসাই।
চঞ্চল লোচনে চায়, কে বুঝিবে অভিপ্রায়,
কোথা থাকে কোথা যায়, কোথা আছে নাই॥

১০। স্বরূপের বাজারে থাকি।
শোনরে খ্যাপা, বেড়াস্ একা,
চিন্তে নার্লি ধর্বি কি।
কালায় বোবা কথা কয়,
কালা গিয়া শরণ মাগে কে পাবে নির্ণয়,
আর অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে,
তার মর্ম্ম কথা বল্বো কি।

মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়,
জেয়াস্তে ধরিতে গেলে হাবুডুবু খায়,
সে মড়া নয়কো রসের গোরা,
তার রূপেতে দিয়া আঁখি॥

১১। সহজ মানুষ আলেক লতা।
আলেকে বিরাজ করে,
বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা।

আলেকের প্রেমের কোলে,
পেতেছে বাঁকা নলে,
ত্রিবেনীর জল উজান চলে,
বহিছে সর্ব্বদা।

আপনি চলে নলের পথে,
সে নল কেউ নারে চিন্তে,
চিন্তামনি চিন্তাদাতা

আলেক দুনিয়ার বীজে,
আলেকের সাঁই বিরাজে,
আলেকে খবর নিচ্চে,
আলেকে কয় কথা।

আলেক গাছে ফুল ফুটেছে,
যার সৌরভে জগৎ মেতেছে,
আলেকে হয় গাছের গোড়া,
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা।

আলেক মানুষের রসে,
সনাতন সদা ভাসে,
বাউলে তোর লাগলো দিশে,
যেতে নার্‌বি সেথা।

তুমি সদাই বেড়াও রিপুর ঘোরে,
মানুষ চিন্‌বি কেমন কোরে,
যে দিন ধরবে তোরে,
মুগুর দিয়ে ছেঁচ্‌বে মাথা॥

১২। দেল্‌ দরিয়া খবর কররে মন।
তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নিধুবন,
কোথায় রে তোর গুরুর আসন।
যদি পদ্মা পাড়ি দিবি,
তবে ঢাকা দেখ্‌তে পাবি,
মুক-সুদাবাদ কররে অন্বেষণ।

আছে কলিতে কলিকাতা,
তিন সহরে আঁটা,
সাঁতার দে' যায় রসিক যে জন ॥

১৩। হলো বিষম রাগের করণ করা,
জেনে যোগমাহাত্ম্য, রূপের তত্ত্ব,
জানে কেবল রসিক যারা।
খালি মুখে হস্ত দিয়ে,
বস্তে আছে নির্ভয় হ'য়ে,
করি অমৃত পান গরল খেয়ে,
হ'য়ে আছে জীয়ন্তে মরা।
রূপেতে রূপ নেহার করি,
আছে রাগ দর্পণ ধরি,
হুতাশনকে শীতল করি,
অনলে রেখেছে তারা।
গোঁসাই গুরু চাঁদবদন,
ডুবে থাক মন সিন্ধু জলে,
কিন্তু সে জল পরশ হ'লে,
শুক্‌নোয় ডুবাবি ভরা ॥

৪। আপন দেশ কেতাবসে ঢুড়েলে।
মুরসিদ্‌ (গুরু) আমার কোনখানে বিরাজেরে ॥

মুরসিদ আমার কোন শিয়রে জাগে রে।
ঘরখানি বান্ধো বান্দা দুয়ারখানি ছান্দো।
আপনি মরিয়ে যাবা, মিছে পরের লাগি কান্দোরে॥
আসিবার কালে বান্দা দিলে মৌত লেখে।
এখন কেন কান্দো বান্দা পরের মৌত দেখে রে॥
মায়ের চারি বাপের চারি, ওরে খোদার দিয়ে দোয়াদশ।
আঠারে মোকামের মধ্যে জলে হার সরে রে॥
তিল প্রমাণ জায়গাখানি বান্দা আঠারো সজ্জা পড়ে।
আমার খোদার দোস্ত মহম্মদ নবি, কোন খানে নেমাজ করে রে॥
আসমান জোড়া ফকির রে ভাই, জমিন জোড়া কাঁথা।
এসব ফকির ম'লে পরে এর কবর হবে কোথা রে॥

১৫। আমি ছিলাম কোন খানে,
আমায় আন্‌লে সে কোন জনে,
আমি যাবো কোথায় কেউ বলে না, হয় না রে মনে।
আমি এসে এই ভুনে, মন মুরসিদ না নিলাম চিনে,
আমার মনের দোষে, কালের বশে, পেয়ে বস্তু হারালেম কেনে।
চোখে আমার দিয়েছেন ঠুলি, আমি দেখতে পাবো কি,
আমার সাধুর ভরা যাইছে মারা, রবি আর শশী,
দেলে আমার দিয়েছেন কালি।

ধড় ছেড়ে জান্ তুই ছেড়ে পালালি,
এই মুখেতে হরদম্ মওলায় (গুরুর) নাম লইতাম,
কল্লিরে খালি ॥

১৬। ঐ দেখ হেমের গাছে প্রেমের লতা বেষ্টিত হ'য়ে আছে।
শুধু হেম নয়, শুধু প্রেম নয়, ওনীলকান্ত তনু তায় মিশে আছে ॥
ফুল বিনা ফল ধরে,
ফুল থাকে আট ক্রোশান্তরে,
তবে ফল সে কেমনে ধরে।
সে ফল বীজের গুণে,
হ'লেও হ'তে পারে ফল আপনি ধরে,
নীর থাকে তার কোন্ সহরে ॥
সে যে মালীর পরিপাটি,
অবোধ নাগরী, দেহ ক'রে খাঁটি,
নীর থেকেও ক্ষীর ছেঁকে বাছে।
কি বস্তু ফলের ভিতর,
খাইলে জীয়ন্তে মরে,
মরা তনু জীয়াতে পারে।
সে ফল সুধা ছাঁকা,
গরল মাখা
অদ্যাপি না হয় পাকা।

ও তার কাঁচাতে সুরস,
রসে ক'রে বশ,
সেই রসে গোঁসাই ডুবে আছে॥

১৭। যায়রে কলের জাহাজ ভেসে।
তাতে মনের ময়লা, দিয়ে কয়লা,
টান দেয় তায় ব'সে বসে॥
এমনি মজা আগুনের কলে, তরী উজান
ভেটেন সমান চলে।
ও তার এমনি বেগুন, লাগলে আগুন,
যোজন গমন যায় নিমিষে।
তবু এমনি পাজি, কাঙ্গাল মাঝি,
দাঁড় টানে তায় ক'সে ক'সে॥

১৮। বিঁদ্‌লো প্রাণে মরি একি (নাম শ্রবণে)।
কি আশ্চর্য্য বচন বলে লোচনে কভু না দেখি॥

১৯। অজপার সঙ্গে জপ গুরুদত্ত ধন (মন)।
কর জপে, মালা জপে কিবা প্রয়োজন॥
হবে তার প্রেমের ভুক্, গুরুপদে হাজির থা'ক।
প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে ডাক হ'য়ে সচেতন॥

কি সকাল, সন্ধ্যা কিবে, সদা জপ রাত্র দিবে।
হৃদ্‌কমলে প্রকাশিবে, সে গুরু রতন॥

২০। সে রস যে জানে সে জানে, কত সুখ হয় সুধাপানে।
নিত্য সুখী নিত্য সুখে **অকাম** রমনে॥

২১। মন তুমি খুব প্রেম করিলে।
ক'রে নামসুধা পান, তোমার ঝরলো না প্রাণ,
কঠিন পাষাণ সেও ত গলে॥
তুমি কি ক'রে পণ, নিলে কি রতন,
কি ধন পেয়ে ডুবে রইলে।
গুরু সত্য মান, কথা শুন, পড়োনা আর মায়াজালে॥

২২। প্রেম কি কবার কথা, যার প্রেম সেই জানে না রে।
প্রেমে মান থাকে না, জ্ঞান থাকে না,
আপনাতে আপনি থাকে না রে॥
ভজে মন অন্তরেতে, মজে রয় দিনে রেতে রে।
ত্যজে তায় কোন মতে, কুলে রইতে পারে না রে॥

২৩। আ মরি কি সুখের নগর ভব সাগর পারে,
সুখময় সুখে বিরাজ করে।

সেথা কেউ দুখী নয়, সদাই সুখী,
সদা নগরবাসীর মুখে হাসি ॥
ভেবে বিরিঞ্চি যার পার নাহি পায়,
দেখলাম গুরুকৃপায় নয়ন ভরে ॥

২৪। হাসি কে ফুটালে, কমল কলিকে,
ক'রে গোপন পিরীতি ॥

২৫। নামের আদান খেয়া, আজান গাছের বীচি।

২৬। সহজ মানুষ আলেকলতা।

২৭। **আপ গরজির** কভু না হয় প্রেমের সঞ্চার।

২৮। চলে বেদ বিধি ধরে, সে কেবল শমন ভয়ে।
মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে, মনকে আঁখি ঠারে ॥
তার সম পাপী নাই, পুনঃ পুনঃ জপে যেই,
নাম অপরাধী সেই পাপী দুরাচার।

২৯। আমি বুঝতে নারি মানুষ লীলে।
তোমার সুখ উপজে আমি ম'লে ॥

৩০। সর্ব্ব কার্য্য হয় সিদ্ধি,
চিত্তশুদ্ধি সে মূলাধার।

৩১। গুরু সুখে সদা সুখী, বিমল হৃদয়
আত্ম সমর্পিয়ে আছে শ্রীচরণ কৃপায়।

৩২। নামী ধামী সিদ্ধি কামী.
হবে নাকো থাক্‌তে আমি,
বিনে তুমি তুমি।

৩৩। সে চরণে পতিত যারা,
তাদের অন্তর অমির ভরা,
আছে হ'য়ে জেয়ন্তে মরা।

৩৪। গুরুকৃপায় ফুট্‌লো আঁখি, দেখলাম পরমেশ্বরে;
কি অপরূপ অভয় চরণ, ডুবলো নয়ন সুখ সাগরে।

৩৫। বর্ত্তমান তার আরাধনা, পূজা অর্চ্চনা।
আপ্ত সুখে থাক্‌লে লোক, করোনা বাসনা॥
গুরু সুখ সন্তোষ বিনে, ইষ্ট যে ভাবে গগনে।
চিরদিন যায় রোদনে অদর্শনে তার,
আপগরজির গুরু সেবায় না হয় অধিকার।
সুখে উপজিবে দুঃখ, চেটুক পেটুক ভাব পাবেনা।
সর্ব্ব কার্য্যের গুরু মূলাধার ব্রহ্ম পরাৎপর॥

বলিহারি যাই কৃপায়, করুণা সাগর।
গুরু সাক্ষাৎকার, তার **নাই ধ্যান ধারণা**॥

৩৬। গুণ টেনে পার হওয়া যায় না, পাড়ি দিতে হয়।
মুখুয্যে মশাই।

৩৭। শ্রীগুরুই বস্তু আর সব অবস্তু।

৩৮। যো ব্রহ্মবিদ ওই ব্রহ্ম তাকুবানি বেদ। "নানক"

৩৯। এই মানুষে মনের মানুষ পাওয়া যায়,
মানুষ চিনে ধরতে পার্‌লে হয়।
সে মনের মানুষের রীত, হয় আপনি উপস্থিত,
জেনে যে করে পিরীত।
না ডাক্‌তে এসে, হৃদয়ে পশে,
মানুষে সেঁদিয়ে হেসে, রসের কথা কয়॥

৪০। প্রাণের আশা ছাড়, জ্যান্তে মর,
অধরচাঁদকে ধরবি যদি।

৪১। মন ভাল না হ'লে হরি পাব কিসে।
হ'ল না আমার মনের দোষে॥

৪২। দিয়ে বেদ ঠুলি চোখে, নিষেধ বিধিতে থেকে,
ঘুরে জীব বিধির বিপাকে।

৪৩। সাধু কার্য্য সাধু বিনে কেবা জানে কোথায়।

৪৪। কি নাম শুনালে গুরু গোপনে,
নাম নয় সে সুধারাশি, আহা মরি, মরি।

৪৫। তুমি আপনি সরল, আপনি বাঁকা,
আপনি শত্রু, আপনি সখা,
আপনাকে আপনি ধোঁকা,
আপনি এক সবাকার।

৪৬। হ'ল না প্রেম গৌরচাঁদে, বেদবিধি বিবাদী।

৪৭। গোপী বিনে গুপ্তধন, কেউ চেনে না।

৪৮। সে থাকে সপ্তম তলায়, আমি থাকি ভগ্ন চালায়।
নিশিদিন কাটে গাছতলায়, রোগের জ্বালায় বসে জাগি॥

৪৯। তার কথা কি ক'বার কথা।
কে লোভী কারে করি, ভাবের ভাবী পাবি কোথা॥

৫০। মনের সাধ হ'লেই কি হবে।
সাধন বিনে সিদ্ধ-বস্তু কভু নাহি পাবে॥
কাঠ, পাথর, জল, চামড়া ভজে,
আমড়া পাবে কাজে কাজে।

লুকিয়ে আছে পোষাক ত্যজে,
ফাঁকি দিয়ে জীবে ॥

৫১। সে কেতাব কোরাণ, দেখিয়ে বেদ পুরাণ,
অন্তরে অন্তরে ফিরে কে পাবে সন্ধান।

৫২। নাম করিয়ে শ্রবণ
আনন্দে ভাসিল মন,
ব্যাকুল হ'ল জীবন,
দরশন বিনে।

৫৩। সে প্রেম করতে জানলে মরতে হয়।
আত্মসুখীর মিছে সে সুখের আশায় ॥

৫৪। প্রাণের আশা ছাড় জ্যান্তে মর,
অধরচাঁদকে ধরবি যদি।
ধর তলিয়ে তলা, ঘুচবে জ্বালা,
সে যে অগাধ জলের নিধি ॥

৫৫। মনকে লয়ে সরল হ'য়ে, মানুষ চোকে থাক।

৫৬। গুরুসত্য মান, কথা শুন, ভাব কেন অকারণ।
তুমি ডুবলে ভাবে, দেখবে প্রেমনদী বহে উজান ॥

৫৭। পেলেত আশার সুসান, দেখা হ'ল পরস্পর।
ঘুচাও মনের আঁধার॥

৫৮। ত্যজে মান অপমান, ঝড়বৃষ্টি তুফান বান,
মুস্কিল আসান জ্ঞান সমান যার মনে।
এ পিরীতের মর্ম্ম সেই কিঞ্চিৎ জানে,
প্রাণ রক্ষা ক'রে, প্রাণ সঁপে পরাণে॥

৫৯। গুরু করুণাসাগরের কথা মন বল, বল,
আমার নিদয় হৃদয় শিহরিল, পাষাণে নিশান দিল।
শ্রবণে সুধা বর্ষিল, রসনা রসেতে ভাসিল॥

৬০। সামান্য যোগে কি সখি প্রেম উপজে,
সমর্থা যৌবন বিনে, হয় কি গাঢ় রতি রসরাজে।
মূলাধারে, সহস্রারে, যোগ হ'লে একাধারে,
ভাব রসে যায় ডুবে অন্তরঙ্গ তায়,
তবে প্রাণ দিয়ে তোষে প্রিয়োত্তমে হৃদি মাঝে।
রাধা কৃষ্ণ' য়ার লাগি গড়াগড়ি যায়।
প্রেমের শরীর যার তারেই এ প্রেম সাজে॥

৬১। নিরাকারে পিরীত করা বৃথা,
মানুষ বই ইষ্ট সংস্থানে, সে ব্রহ্মজ্ঞান, কথার কথা।

আমি সাকার, সে নিরাকার,
মাথা নাই তার মাথার ব্যথা ॥

৬২। কি নাম শোনালে গুরু গোপনে (মরি, মরি),
নাম নয় সে সুধারাশি ভাবি মনে।
নিদয় হৃদয় মম, মরুভূমি সম,
তাহে উপজিল প্রেম শ্রবণে ॥
ভেবেছিলাম হবার নয়, হয়নিক' কারু,
অঙ্কুরিল প্রেমতরু পাষাণে।
কি তার মাধুরী মরি, হেরি বশীভূত,
প্রফুল্ল হয় চিত, স্মরণে ॥

৬৩। গুরু সুখে সুখ পায়, যার হয় সে সঞ্চার।

৬৪। না হ'লে যান্দা ফকির, নাহি পায় সে ফিকির।

৬৫। না হ'লে অন্তরে ভক্তি, শক্তি না সঞ্চারে।

৬৬। সে ত জীবের সাধ্য নয়,
তবে যদি সে যোগ হয়,
স্বভাব পরাজয় করতে থাক।
অগ্রে কর প্রাণ অর্পণ,

সত্য ঋষি
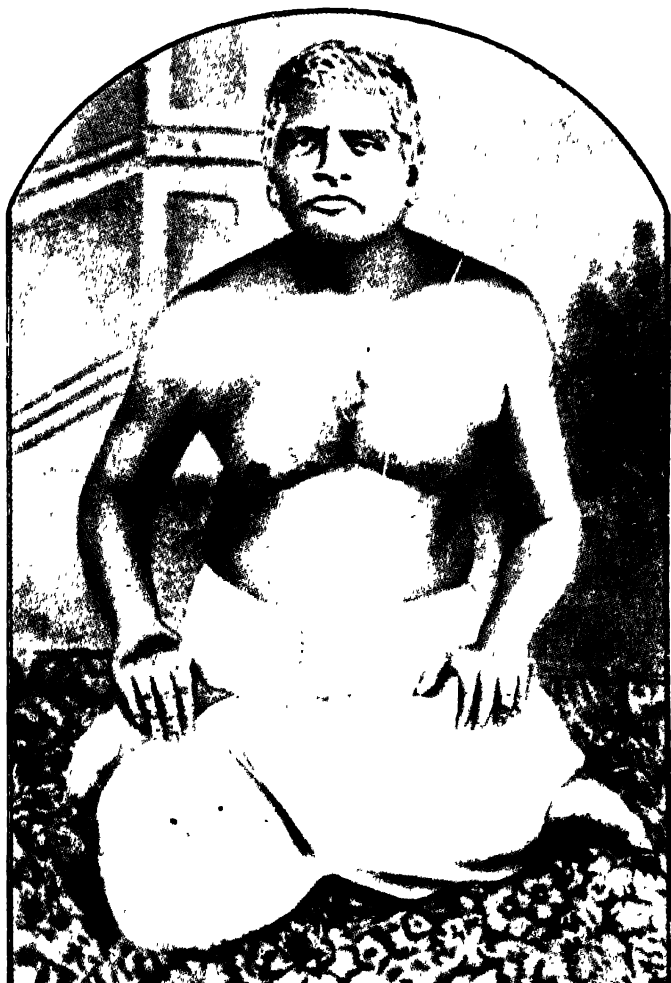
লও গুরুর স্মরণ,
চরণ ধ'রে তার করণ শেখ ॥

৬৭। একি সেই মনের মানুষ ভূতলে এল।
নিতে না নিতে সঙ্গ,
গ'লে যায় পাষাণ অঙ্গ,
মরি কি প্রেম তরঙ্গ,
মন মাতঙ্গ মাতিল ॥

৬৮। ওহে প্রাণনাথ, সহে না এ যন্ত্রণা আমার বক্ষে।
হ'য়ে আপন, কেন গোপন, কঠিন কঠিন অপিক্ষে।
সঞ্চারীয়ে দেখা দিয়ে, যাও হে কোথায় অলক্ষ্যে।

৬৯। কোথা থেকে এক ক্ষ্যাপা এসে,
ছিল ব্রহ্মার দুর্লভ যে ধন,
লুটিয়ে দিল দেশ বিদেশে।
সে ভাব হালাগোলা, ভাবে ভোলা,
মন ভুলালে পাগল বেশে ॥

৭০। ওরে মন বাসনা ভুলে,
তোর ভজন সাধন যা বলি শোন, হরদমে ডাক্ গুরু বলে

৭১। রসিক হরিদাস, খাচ্ছে সে রস দিনে রেতে।
প্রেমের গাছে অনুরাগের ঘড়া পেতে॥

৭২। ধর্‌তে নাম রসনাতে প্রাণ জুড়ায়।
গুরুনাম-রস পান কর্তে কর্তে, কত রস জোগায়॥
এসে রসনায়, আঁখি ভাই তায় নিরখিতে চায়।
মহামন্তর অন্তর বাহির,
অমৃতাভিষিক্ত হয় রোমাঞ্চ শরীর,
কিবা অপূর্ব্ব শব্দেতে জীব সঞ্চার হয় মৃত্যুকায়॥

৭৩। আমি বুঝতে নারি মানুষ লীলে,
তোমার সুখ উপজে আমি ম'লে।
কি ভেবে নিদয় হ'লে, না রাখিলে চরণতলে॥

৭৪। ধিক্ রে মন ধিক্ ধিক্,
গুরু সাক্ষাৎকার কারে ডাক,
দেখেও হ'ল না চিত্তশুদ্ধি

৭৫। হায় মানুষের দরদ বিনে,
কি সাধন আছে আর রে।
সে মরার মর্ম্ম মরা জানে,
তা জীয়ন্তে বুঝা ভার রে॥

৭৬। নিত্য সুখী নিত্য সুখে, অকাম রমন।

৭৭। শুধু কথায় সাধু সাধিলে কি হ'বে,
অন্তরে না হ'লে মধু, বঁধু কোথা পাবে।

৭৮। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস।

৭৯। তুমি সত্য আমি ভৃত্য, নিত্য তব দাস।
আমি কিসে দুখী তা জান্‌তে চাই, কেন হারাই॥

৮০। নিত্য চিত্ত শুদ্ধ হ'লে, আর না হ'বে ভ্রম।

৮১। সুখের অবধি কি তার।
স্বরূপে শ্রীরূপে নয়ন ডুবিয়াছে যার॥
নাহি মানে বেদ বিধি, পেয়েছে অমূল্য নিধি,
আনন্দে আনন্দে ভাসে, রূপসাগরে যত পশে।
নিরানন্দ নাই সে দেশে, আনন্দ বিস্তার॥
যায় আসে ভবপারে, অধরচাঁদ ধরে অধরে,
কাল শমন ডরে তারে, হ'য়েছে ঈশ্বর॥

৮২। দীননাথের চাইতে হ'বে,
দীনের দিন কি এমনি যাবে হে।

যদি পাষাণে বীজ না হ'ল অঙ্কুর,
তবে নাম দয়াময় বল্‌বে কে হে জগত জনে।
যদি ব্রহ্ম ডাঙ্গায়, না দাঁড়ালো জল,
তবে ভকত বৎসল বল্‌বে কে হে!
ওরূপ মনে হ'লে পাষাণ গ'লে,
মনাদি ইন্দ্রিয় সবে হে॥

৮৩ চল গুরু দুজনা যাই পারে।
আমার একলা যেতে ভয় করে॥
আমার দেহ ছিল শ্মশান সমান।
তুমি এসে মন্ত্র দিয়ে, কর্‌লে ফুলবাগান॥
আমার সেই বাগানে ফুল ফুটেছে।
অধরচাঁদ বিরাজ করে॥

৮৪। কোথায় ভুলে রয়েছো, ও নিরঞ্জন,
নির্ণয় করবেরে কে,
তুমি কোন্‌খানে খাও, কোথায় থাকো মন অটল হ'য়ে,
কোথায় ভুলে রয়েছ।

তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী,
আপনি দাঁড়ি, আপনি মাঝি,

আপনি হও যে চড়নদারজি, আপনি হও যে নায়ের কাছি,
আপনি হও যে বৈঠা।

তুমি আপনি মাতা, আপনি পিতা, আপনার নামটি রাখ্‌বে কোথা,
সে নাম হৃদয়ে গাঁথা,
আমার গোঁসাইচাঁদ বলে, সে নাম ভুল্‌ব নারে প্রাণ গেলে।

তুমি আপনি অসার, আপনি হও সার,
আপনি হও রে নদীর দুধার, আপনি নদীর কিনার,
আমি অগাধজলে ডুব দিতে যাই,
সে নাম ভুলবো নারে প্রাণ গেলে।

আপনি তরো আপনি সারা, আপনি জরা আপনি মরা,
আপনি হও সে নদীর পাড়া,
আবার আপনি হও সে শ্মশান কর্ত্তা গো,
আপনি হও সে জলের মীন, ও নিরঞ্জন, কোথায় গো সাকিম
আমি ভেবে চিন্তে হলাম ক্ষীণ॥

৮৫। অপরাধ মার্জ্জনা কর প্রভু! এমন মতিভ্রম জন্ম জন্মান্তরে
তোমার সংসারে হয় না যেন কভু।

৮৬। তুমি সবের সেব্য, সবের ভাব্য, ভাব ভাবের ভাবী হও।

৮৭। যত অর্থ স্বার্থ সামর্থ জব্দ করে নাও,
আমায় নিন্দুকের বন্দুকে সেস্তে রেখে দাও।

৮৮। গরজে ক্ষীর ত্যজে, এ রাজ্যে গরল করি পান,
বিষ ত্যজিয়ে, প্রেম রসে মজিয়ে, বসিয়ে আছে ভাগ্যবান
আমি আত্মসুখী হয়েছি, ডুবিয়েছি ডিঙ্গে,
কর্ম্মফলে আমি কালে জব্দ হ'তেছি॥

৮৯। ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি যারে ভাবিরে,
সে কখন ঘৃণা করতে পারে, গরীব কাঙ্গাল দেখিরে?
এসেছে সে দিন দয়াল হ'য়ে, ভাই,
তুমি কি তা জেনেও জান না,
গরীব বই সে কার সাথে পিরীত করে না,
ভাবের ভাবী হ'য়ে সে এল কাঙ্গাল স্বভাব নিয়েরে।

৯০। ভাইরে, ভাব্‌লে সিদ্ধি, ভাবের নিধি যদি ভাব থাকে।

৯১। মনে করিলে নয়ন জলে ভেসে যায় হিয়ে বহিয়ে,
ভাব্‌তে ভাব্‌তে ভাবের কূপেতে থাকি ডুবিয়ে।
সে যে ভাবের বন্ধু, আনন্দ সিন্ধু সমতুল,
ক্ষণেতে প্রাণ বেঁচে থাকিতে হয় না যেন ভুল॥

৯২। রাজ্য খুঁজিয়ে রে ভাই অধম পেলেম না,
অধমের পদ না দেখিলে আমার মন ত বুঝে না।
আমি অধম জনার চরণ পূজিব,
মর্শ্মের মর্শ্মী হ'য়ে অমনি মজিব,
অধমের মর্শ্ম যাহাতে, কহিতে পারে নারে ভাই বেদাগমেতে।
এই অধম জনার অধম বই আর হয় কি তুলনা।
আমারে তুই অধম বলিস, আমি অধমের গোলাম,
এই কথাটী শ্রবণ করে, আনন্দে বহিছে ধারা নয়ন নীরে।

৯৩। ভাব্‌লে কি ভাবের মানুষ পাবে।
তার আপনা হ'তে ইচ্ছাটি না হতে,
কি কর্‌তে এসে দেখা দিবে।

৯৪। শ্রীগুরু পদে মজ মূঢ় মন,
সদা ঐ চরণ কর রে স্মরণ,
চরণ ভাবিলে ভাবনা যাবে, পার হবি ভব-জীবন॥
আনন্দময় স্বচৈতন্য, যাঁর কৃপায় জীবের চৈতন্য,
সমভাবে সমাশ্রয় পূর্ণ।
তিনি অনাদি, সকলের আদি,
ঐ যে গুণাতীত গুণান্বিত স্বগুণে গুণধারণ॥
পরমে পরম দেবতা, গুরু হন সকলের আত্মা,

গুরুতে সব দেব সংস্থিতা।
তিনি নিরাভাস, আছেন তত্ত্বভাস,
তিনি এই স্বরূপে নিত্যরূপে করিতেছেন কালযাপন।
আদি ক্ষেত্র ব্রহ্মভূমি, যে ভাবে সে, অন্তর্য্যামী,
আশাত্যাগী বিধি নিষ্কামী।
হোলে পাবে তায়, কাঙ্গাল ইহাই কয়,
কেন অচিন্ত্য চিন্তাতে সদা মগ্ন থাক অনুক্ষণ॥

৯৫। শুনরে বলি উদ্ধব, এই যে গোপীকা সব,
কৃষ্ণ প্রেম এদের ভাব্য ভাবনা,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এদের নাহিক বাসনা।

৯৬। দিন গেল মিছে কাজে, রাত্রি দিন নিদ্রে,
না ভাবিলাম শ্রীগুরুর চরণারবৃন্দে।

৯৭। হরদমে ডাক নিতাই ব'লে,
নিতাই প্রেমের মহাজন,
তুই যা চাবি সেখানে পাবি,
নিতাইচাঁদের দয়া হ'লে।

৯৮। কানাই নেচে নেচে নেচে আয়,
তোর পদধূলি দে মোর গায়।

৯৯। সে যে অধর মানুষ, দেয়না ধরা,
ধরতে মন হার মেনেছে।
তারে ধরে ধরে ধর্‌তে নারি,
মন আমার পাগল হয়েছে।

১০০। ও এক মানুষ অটলবিহারী।
টলালে সে নাহি টলে, পাষাণ হ'তে অধিক ভারী।
ঐ মানুষের স্মরণ নিলে, ঘুচে যাবে মনের কালি॥

১০১। ধরবি যদি মনের মানুষ, ধরারে ধররে মন।
হিংসা, নিন্দা, তম যাবে, তবে দেহ শুদ্ধ হবে,
তবে দেহ শুদ্ধ হবে,
তবে সে ফল হাতে পাবে,
অধর ধরার এ লক্ষণ।

ধরা ধরে আছে যারা,
সে মানুষ জ্যান্তে মরা,
মরার সঙ্গে মরা হ'লে,
পাবি রাঙ্গা সে শ্রীচরণ।

মানুষ আছে যেথা সেথা,
খুঁজলে মানুষ পাবে কোথা,

মানুষে মানুষ জোড়া গাঁথা,
সেই মানুষটি রত্ন ধন।

১০২। ভাবিতে ভাবিতে যবে, সেরূপ আরোপ হবে,
বিধির কলম হবে বৃথা, সাপের খোলোসের প্রায়,
খসিয়া পড়িবে কায়।

তবে আসি এক সহচরী, নিয়ে যাবে করে ধরি,
সমর্পিবে শ্রীরূপেরি পায়॥

১০৩। গুরুদাস পাগলে বলে, কাল নিকট হ'ল,
ও ঋণ শোধ হ'ল না, রইল দেনা,
মনরে আমার পাগল চাঁদের খাতাতে।

১০৪। এক মন হ'লে পরে, তবে সে যেতে পারে
তবে সে যেতে পারে
নিতাইচাঁদের দরবারে।

১০৫। God knows God;
Gold knows gold;
Thief knows thief;
খোদা খোদাই জান্তা হ্যায়।

১০৬। অধম চণ্ডাল, জীবের ঘরে ঘরে গিয়ে কাঙ্গাল বেশে,
প্রভু আমার দুর্লভ নাম দিতেছেন যাচিয়ে,
হেন দয়াল অবতারে, যার রতি না জন্মিল,
কাঙ্গাল গোঁসাই বলে সেই পাপী এল আর গেল রে।

১০৭। দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাত পোহাল হ'ল ভাব।
পূর্ণিমাতে অমাবস্যা, তের প্রহর অন্ধকার।
বৃন্দাবনে বলে গেছে বামী বৈষ্ণবী,
এবার একাদশীর দিনে হবে জন্ম অষ্টমী।
ভাদ্র মাসে সাতই পৌষে চড়কপূজার দিন এবার।
নাপ্‌তে শামী, ধোপা বামী হাসতেছে কেমন,
এক বাপের পেটে তারা জন্মেছে দুজন,
কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশী ধামে হাহাকার।
রাজার বাড়ী টাট্টু ঘোড়া, শিং উঠেছে দুটো তার,
বৃষ্টি জলে সৃষ্টি ভেসে, পুড়ে হ'ল ছারখার॥

১০৮। স্বরূপের বাজারে থাকি।
শোনরে, বেড়াস্ একা, চিন্‌তে নারবি, ধরবি কি।
কানার সঙ্গে বোবা কথা কয়,
কালা গিয়ে শরণ মাগে, কে পাবে নির্ণয়,
আর অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে, তার মর্ম্মকথা বল্‌বো কি॥

১০৯। চৈতন্য সঙ্গ পাইয়া, কহে নিত্যানন্দ।
মাকে ভজ, বাপকে পাবে, ঘুচ্‌বে মনের ধন্ধ॥
প্রাণের উপর জলের মরাই, কাছিম সাপে ধরে।
সাপের মাথায় হংসের ডিম্ব, তাহে হরিণ চরে॥
ডিমের ভিতর চৌদ্দ ভুবন, ডিমের বাজার তায়।
সাপের মুখে ফুল ফুটেছে, কর্ত্তা বসে তায়॥
সাধ ক'রে ঘরের দ্বার করেছেন নটা।
ঘরে ভূতের বাসা, গালিম আছে ছটা॥
ভূতের মুখে ফুল বাগিছে, পাড়ায় পাড়ায় মেয়ে।
জলের ভিতর আগুন দিয়ে, বাউল দেখে চেয়ে॥
খেপার কথায় হাতী পড়ে মাকড়সার ফাঁদে।
তা দেখে চৈতন্য হাসে, নিত্যানন্দ কাঁদে॥
বোবা কয়, কালা হাসে, কানা দেখে রঙ্গ।
দাস নিত্যানন্দ কহে, পেয়ে সাধু সঙ্গ॥

১১০। কেনা কেনা আছে পিরীতে, সুসম্পিরীতে।
যে জন সে সার বুঝে না, সেই মজে না পিরীতে॥
গুরু কেনা শিষ্য পিরীতে, শিষ্য কেনা গুরুর পিরীতে।
ত্রিজগত কেনা পিরীতে, বদ্ধ আবদ্ধ আর পিরীতে॥

১১১। রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতে লাগি থির নাহি বান্ধে॥

১১২। মন পাগলা রে, হরদম্ গুরুজীর নাম লইও,
দিবানিশি নাম লইও, নামে কামাই দিও না, (আমার মন),
আমার গুরুজীর নাম সদা নূতন রয়রে, মন পাগলা রে।

১১৩। দয়াল গুরুধন তোরে কোথায় যাইয়া রে পাব,
কোথায় যাইয়া রে পাব, তোরে কোথায় যেয়ে পাব।
যে দেশেতে যাবারে গুরুধন, আমি সেই দেশে যাব,
তোমার চরণের নূপুর হ'য়ে চরণে বাজিব।
তুমি হবা কল্পতরু রে, আমি হ'ব লতা,
তোমার চরণে জড়িয়ে রব, ছেড়ে যাব কোথা।
পার হবার তরে, গেলাম গুরু খেয়া ঘাটের কূলে,
নাও আছে কাণ্ডারী নাই, আপন কর্ম্ম দোষে।
ছায়া নিবার তরে গেলাম বটবৃক্ষ তলে,
ও তার ডাল আছে পাতা নাই, নিজ কর্ম্মফলে।
স্রোতের সেহালা হ'য়ে, আমি ফিরি ঘাটে ঘাটে,
এমন বান্ধব নাই যে জিজ্ঞেসে যে ডেকে।

১১৪। বিফল জনম, বিফল জীবন—
জীবনের জীবন না হেরে।
সুখে ডালে বসি, ডাকিছ পাখীরে,
ডাকিছ কি সেই পরম পিতারে,
কি বসে ভাবিছ, বলে দাও আমারে,
আমি ডেকে যদি পাই তাঁরে রে॥

গুঞ্জর ভ্রমর, করি গুন্ গুন্,
গাইছ কি সেই গুণাকর গুণ।
শিখাও আমারে আমিরে নির্গুণ,
কি গুণে ভুলালে তাঁরে রে॥

কেন ফুল কুল হাসিছে সকলে,
পেয়েছ কি সেই পরম দয়ালে।
পায়ে ধরি বল, কেমনে পাইলে,
আমি ডেকে ডেকে যাঁরে না পাইরে॥

সুনীল গগন নীল আবরণে,
লুকায়ে রেখেছ বুঝি মোর প্রাণধনে।
খুল আবরণ হেরি নয়নে,
হেরি মন প্রাণ জুড়াই রে॥

১১৫। এক অপরূপ রূপের মধ্যে রূপ সহর,
তারের মধ্যে খবর রসিকেতে জান্‌তে পারে,
মাণিক, মুক্তা, লাল জহর।
রূপের ঘরে রূপের বাতি, নাহি সন্ধ্যা দিবারাতি,
মানুষে মানুষ বসতি, আজগবি আজান সহর।
গুরু গোঁসাইয়ের পদতলে কত লাল মতি মোহর॥

১১৬। রে মন, খুঁজলে কোথায় পাবে,
ও সে কখন জাগে, কখন ঘুমায়, কখন স্বপন দেখে রে।
যার নাম অধরা, যায় না ধরা, ধরাকে জান্‌বি যদি,
কৃপাময় কৃপা করে, যখন যাবে, তখন দেখা দিবে।
ও মন, থেকো ব'সে পাবার আশে, আশাতে মিলবে,
কেউ ধরবে ব'লে হৃদকমলে ফাঁদ পেতেছে এসে ভবে।
বাউল বলে সে যে ভাবের মানুষ, ভাবে আসে ভাবে যায়॥

১১৭। আজ্‌গবি সোনার মানুষ, কোথা হ'তে নদে এলো,
নামটি তার গৌরহরি, রূপ হেরি পুরুষ নারী ভুলে গেল।
সাত সমুদ্র এক ক'রে জগত মাতাইল॥

১১৮। স্বরূপে বিশ্বাস হ'লে তবে মানুষ হ'বে জানা।

১১৯। লালের খবর রসিক যে জন, সেই জানে,
যে জানে সে বল্‌বে কেন।
সপ্তম তলা ভেদ করিলে লালের ঘরে যাওয়া যায়,
স্বরূপ রূপ এক ঐক্য হ'লে,
তবে লালের খবর জান্‌তে পারে।
স্বরূপেরই আশ্রয় লইয়ে, ও সে রূপের লহরে থাকিলে,
মানুষ উদয় হবে অন্তরে॥

১২০। মন পাখী যেও না উড়ে,
বেদেনী ফাঁদ পেতেছে জগত জুড়ে।
থাক আমার পোষা হ'য়ে, দিব কল্পতরুর ডালে বাসা,
তোর পূর্ণ হবে সকল আশা, সে গাছের মেওয়া খাসা,
খুব সে খাবি জঠর পূরে
(বেদেনী—অবিদ্যা; কল্পতরু—শ্রীগুরুচরণ)

১২১। প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর, ও তার থাকে না আত্মপর।
প্রেমিক, ও সে আত্মানন্দে সদাই থাকে,
সে চায় না কো জাতি, চায় না সুখ্যাতি, ভাবে হৃদয় পূর্ণ,
হয় না ক্ষুন্ন রট্‌লে অখ্যাতি, ও তার হস্তগত সুখের চাবি।

প্রেমিকের রোগটা বেয়াড়া, যত বেদ বিধি ছাড়া,
বসে আঁধার কোণে চাঁদ গেলে, তার মুখে নাই সাড়া,
সে চোদ্দ ভুবন ধ্বংস হ'লে আসমানেতে বানায় ঘর॥

১২২। তব কৃপায় যে জন পায়, কায়াতে সন্ধান।
সংসার চক্রেতে কভু সে নাহি হয়, ভ্রাম্যমান॥
ভাবের হিল্লোলে চলে, গলে তায় কঠিন পাষাণ।
কল খেলে ক্ষিতিতলে, অতল সিন্ধু উজান চলে॥
বিনি মেঘে ভাসে জলে, ধ্যানীর ভাঙ্গে ধ্যান,
কত নীরে কেবা ভাসে, না হয় পরিমাণ।
প্রাচীন হইয়া ব্রহ্মা অর্ব্বাচীন হয়, হারায়ে জ্ঞান॥

১২৩। কবে হবে সে শুভ যোগ, বেদরদী অনুরাগী।
দুরারাধ্য সাধু বৈদ্য, সাধ্যহীন হ'ল রোগী॥
সে থাকে সপ্তম তলায়, আমি থাকি ভগ্ন চালায়।
নিশি দিন কাটাই গাছ তলায়, রোগের জ্বালায় বসে জাগি॥
ত্রিতাপ হরিবে সত্য, সাধু বিনে কার সাধ্য।
বুঝা গেল তা হদ্দ মুদ্দ, নাই বৈদ্য সফল যোগী॥

১২৪। রসিক হরিদাস খাবে সে রস দিনে রেতে।
প্রেমের গাছে অনুরাগ ঘড়া পেতে—

তরু অমৃতের সার, বহে সুধা ধার—
আনন্দ অপার হয় মনেতে।
যে যত খায় নিচ্চে চেয়ে,
ফুরায় না পেট ভরে খেয়ে,
আর বিলায়ে দিয়ে ;
উঠেছে অতলের রস ঊর্দ্ধে ধেয়ে,
পড়ছে নালি বেয়ে রসনাতে॥
দিব্য চক্ষে দেখলে চেয়ে,
ভাবে গলে পাষাণ হিয়ে,
তরু নিরখিয়ে ;
দেখলে মনের আঁধার থাকে না আর,
কিন্তু বার পাওয়া ভার এ চক্ষেতে॥
সূক্ষ্ম তরু সে প্রেম তরু,
ব্রজ গোপীর প্রেমের গুরু,
ফলে ফল সুচারু ;
সে ফল খাবার সাধ্য হয় না কারু,
হয় তার সুমেরু পার হ'য়ে যেতে॥

১২৫। তোমারি তুলনা তুমি হে নাথ মহীমণ্ডলে।
কাঁদেরে পূর্ণিমার চাঁদ কলঙ্কেরি ছলে॥

সৌরভে গৌরবে তোমা সম কে আছে,
তুমি আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা ॥

১২৬। আমার মন ভুলালে যে, মন মজালে যে,
মন মোহিলে যে, কোথা আছে সে।
বল দেখি হিমাচল, তুমি কার প্রেমে হ'লে আকুল,
গলে তোর পাষাণ হিয়ে, বহে বারি সুশীতল।
বল দেখি তরুলতা, আমার জগজ্জীবন আছে কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কস্ না কথা,
তাই বুঝি তোদের কুসুম হাসে ॥

জয়গুরু ! জয়গুরু !! জয়গুরু !!!

সত্য তত্ত্ব (২)

এই সত্য-স্রোতভুক্ত যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই জগতে শীর্ষস্থান অধিকাব করিয়াছেন। তাঁহাদের স্বতঃই অবস্থার উন্নতি হইয়া ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হইয়াছে। সত্য-নারায়ণ যদি ঘরে থাকেন তাহার কোনই অভাব থাকিতে পারে না। যেখানে সত্য সেখানেই লক্ষ্মীর স্থিতি। পূর্ব্ব উল্লেখিত সমস্ত মহাত্মা ও ভক্তগণ শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে শ্রীগুরু দর্শন করিয়া সেই গুরুধামে, আনন্দধামে, শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন ও শ্রীগুরুলোকে শ্রীগুরু সন্নিধানে বাস করিতেছেন। ভক্তরা তাঁকে ছাড়া কিছু চাহে না, কিন্তু তিনি নির্গুণ ভক্তদের স্বইচ্ছায় শীর্ষস্থান ও লক্ষ্মী প্রদান করেন। সকলেই সদা নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন। আমি অতি অধম—তথাপি আমাকে কর্ম্মজীবনে কত বিপদ হইতে দয়াল শ্রীগুরু রক্ষা করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। আমি কতবার বিপদে ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া রক্ষা পাইয়াছি, যথা:—

মেঘনা ভয়ঙ্কর নদী। উহার পরপার রেখার মত দেখায়—গলাকাটা মেঘনা বলে। আমি সেই নদীতে নৌকা করিয়া আশুগঞ্জ

হইতে ভৈরবগঞ্জ অর্থাৎ পরপারে যাইবার সময় হঠাৎ তুফান উঠে। মেঘনায় তুফান যে কি ভয়ঙ্কর তাহা না দেখিলে ধারণা করা যায় না। তুফানের সময় প্রকাণ্ড ঢেউগুলি বোধ হয় পর্ব্বত সমান ও একটা ঢেউ ভাঙ্গিয়া দশখানা হইয়া যায়। নৌকা সেই ঢেউয়ের ভিতর পড়িল। বুঝিলাম আর রক্ষা নাই। প্রভুকে স্মরণ করিয়া শ্রীনাম স্মরণ করিতে থাকিলাম। নৌকা ডুবিতে ডুবিতে ডুবিল না। তুফানের মধ্য দিয়া নৌকা পরপারে আসিল। নৌকার এই অবস্থা দেখিয়া তীরে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। সকলে বলিল, "আপনার ভাগ্য ভাল, বাঁচিয়া গেলেন। এ তুফানে নৌকা কিছুতেই বাঁচিতে পারে না।" মনে মনে ভাবিলাম প্রভুর কৃপায় রক্ষা পাইলাম। তিনি বলিয়াছেন যে, "আমাদের অপঘাত মৃত্যু নাই।" তাঁহার মহিমা স্বচক্ষে দেখিলাম। তিনি বলেন, "যাহা মুস্কিল তাহা আসান।" তিনি মুস্কিল হইয়া আসিলেন আবার তিনিই তুফানের আসান করিলেন। আমি অতি অধম তবুও তাঁহার দয়া হইতে বিচ্যুত হই নাই।

আর একবার মেঘনা নদী দিয়া নৌকা করিয়া যাত্রাকালীন আকাশে জলস্তম্ভ দেখা যায়। জলস্তম্ভ কি তাহা জানিতাম না। ইহা স্বচক্ষে দেখিলাম। আকাশে একটী প্রকাণ্ড হাতীর মাথা শুঁড় সহ কাল মেঘে দেখা দিল। বুড়া মাঝি ছিল। সে বলিল যে "বাবু, আর রক্ষা নাই। নৌকা আকাশে উঠিয়া

যাইবে ও নীচে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যাইবে। এখুনি ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হইবে।” বলিতে বলিতে ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রভুকে স্মরণ করিয়া স্থির হইয়া থাকিলাম। নদীর জল ফোয়ারার মত উপরে উঠিয়া আকাশে জলস্তম্ভের সহিত যোগ হইয়া গেল। সেই ঝড়ের বেগে নৌকা তীরের মত আপনি ভাসিয়া গিয়া নিকটস্থ একটী খালের (খাঁড়ি) ভিতর প্রবেশ করিয়া নৌকা বাঁচিয়া গেল। এ অলৌকিক ঘটনা শ্রীগুরু কৃপায় সংঘটিত হইল। নিকটে খাল না থাকিলে নৌকা বাঁচিত না। মাঝি নিজেই অবাক্ হইয়া গেল যে, নৌকা কি করিয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া আপনা হইতে খালে গিয়া ঢুকিল ও রক্ষা পাইল। আমি বুঝিলাম যে প্রভু অধমের জন্য হাল ধরিয়া খালের ভিতর আনিলেন। এ দয়ার তুলনা নাই। সর্ব্বদা শ্রীগুরু সঙ্গে আছেন। জলস্তম্ভে কত নৌকা আকাশে উঠিয়া গেল ও ঝড় থামিলে নৌকাসকল জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল, চুরমার হইয়া গেল। সব তাঁর লীলা।

পুনরায় একদিন নৌকা করিয়া যাওয়াকালীন ভয়ানক গভীর ঘূর্ণীর ভিতর নৌকা পড়িয়া তাঁহার কৃপায় নৌকা সহ রক্ষা পাই। আবার একদিন বড় জাহাজ আসিতেছে, তাহার সাম্‌নে প্রকাণ্ড ঢেউয়ে পড়িয়া নৌকাসহ দয়াময়ের দয়ায় বাঁচিয়া গিয়াছি।

১
২
৩
৪
৫
৬

রূপনারায়ণ নদীতে নৌকা করিয়া যাবার সময় হঠাৎ বান আসে ও নৌকা তাহাতে পড়িয়া ডুবিয়া যায়। কিন্তু তাঁকে স্মরণ করিয়া সাঁতরাইয়া পারে উঠিয়া বাঁচিয়া যাই। রূপনারায়ণও ভয়ঙ্কর নদী। ঢেউগুলিও প্রকাণ্ড। তিনি যেন আমাকে তীরে উঠাইয়া দিলেন। আমি অধিকক্ষণ সাঁতার কাটিতে পারি নাই। হাত অবশ হইয়া গেল ও জল নাকে মুখে ঢুকিতে লাগিল। আমাকে যেন প্রভু টানিয়া লইয়া তীরে আনিলেন। কথায় বলে "এসো বিপদ, রয়ো না।" তাঁর উপর ভক্তিবিশ্বাস থাকিলে বিপদের শান্তি হয়। এততেও লোকে তাঁহার দয়া অনুভব করে না। অনুভব করিলেও পরে ভুলিয়া যায়। প্রভু সর্ব্বদা বুকে করিয়া রাখিয়াছেন।

হালিসহরে থাকাকালীন গভীর রাত্রে ডাক্তার বাড়ী যাই। আমি যখনকার কথা বলিতেছি তখন হালিসহর খুব পাড়াগাঁ ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বাড়ী ফিরিবার সময়, নির্জ্জন পথে একটী বড় বাঘের সামনে পড়ি। শ্রীগুরু স্মরণ করিয়া বাঘের পাশ দিয়া মুখ নীচু করিয়া চলিয়া যাই। বাঘটি আস্তে আস্তে সোজা চলিয়া গেল। বেশ বড় বাঘ। প্রভুর কৃপায় বাঘের মুখ হইতে রক্ষা পাইলাম। হালিসহরে তখন পানের বরজ বিস্তর ছিল। ঐ বরজে সুন্দরবনের বাঘ আসিত।

একবার একটী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইবার সময় রাত্রে একটী বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ গোখ্‌রো সাপের সাম্‌নে পড়ি। সাপ চক্র ধরিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিল। আমার পালাইবাব পথ নাই। আমি ঠাকুরকে স্মরণ করিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে সাপ আপনি চলিয়া গেল। মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল, কিন্তু প্রভু রক্ষা করিলেন। আত্মসমর্পণ করিলে তিনি রক্ষা করেন।

একবার কোন স্থানে যাইবার জন্য রেলওয়ে ট্রেনে রওনা হইব, কিন্তু কোন কারণে সে ট্রেনে না গিয়া পরবর্ত্তী ট্রেনে যাইব স্থির করিলাম। পরে সেই ট্রেন যাহাতে যাইব মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহাতে কলিশন (Collision) হইয়া বহুলোক মারা যায় ও জখম হয়। আমি সেই ট্রেনে যাইলে মহাবিপদে পড়িতাম। প্রভু মনের পরিবর্ত্তন করাইয়া দিলেন। তিনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া কত রকমে রক্ষা করেন তাহা ভাবিয়া অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁর নামে কোন বিপদ থাকে না।

কত আর লিখিব। বহু বিপদ, বহু দুর্ঘটনা হইতে বহুবার রক্ষা পাইয়াছি। আমার কিছুই ছিল না। তিনি আমায় "শ্রীগুরুধামে" থাকিতে দিয়াছেন ও সুখে রাখিয়াছেন। আমার পার্থিব সুখ, প্রতিষ্ঠা সবই তাঁহার দান। এখানে আমরা যাহাকে বাড়ী বলি তাহা ভাড়াটিয়া বাড়ী। আসল বাড়ী সেখানে।

এখানে কর্ম্ম ফুরাইলে সেই গুরুধামে শ্রীগুরুর নিকট যাবো। সেখানে আর কর্ম্ম নাই। শান্তিময় ধামে শান্তিতে তাঁহার চরণ সমীপে থাকিব।

আমার ব্যক্তিগত কথা লিখিলাম। ইহা ছাড়া গুরুভাইদের অনেক আশ্চর্য্য বিষয় জানি তাহা কিছু কিছু লিখিতেছি। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যেমন সকলে ধর্ম্মজগতে উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন সেইরূপ পার্থিব জগতেও তাঁর কৃপায় ভক্তেরা শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছেন। যদিও তাঁহাদের প্রার্থনা বা আকাঙ্ক্ষা নাই কিন্তু শ্রীগুরু ভক্তকে সর্ব্বরকমে বড় করিয়াছেন। তিনি ভক্ত পক্ষপাতী, ভক্তের আনন্দে তাঁহার আনন্দ, ভক্তের দুঃখকষ্ট সহিতে পারেন না। যে ভক্ত তাঁহাকে '*আমার*' করিতে পারিয়াছেন তাঁহার কোন অভাব নাই। ঠাকুর তাঁহারই হইয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় ভক্ত সর্ব্বসময়ে শান্তিতে থাকে ও নামানন্দে দিন কাটায়। তিনি দয়াময় ও ক্ষমাময়। জীব নিত্য অপরাধী। তাঁর এত দয়া, অপরাধ সর্ব্বদা ক্ষমা করেন। সর্ব্বদা বলিতে হয়, "*ঠাকুর! অপরাধ ক্ষমা কর, শরণাগতি দাও।*" সর্ব্বদা যে তদ্ভাবে ভাবিত থাকে সে সর্ব্বদা তাঁহাতে বসতি করে ও শান্তি উপভোগ করে। শ্রীগুরু ছাড়া কিছুই জানে না। শ্রীগুরুই একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া জানে।

আমাদের এ ধর্ম্মের সকলেই "দরদী বন্ধু"। সকলের জন্য সকলে "দরদ" সমভাবে পোষণ করে। সকলের একটী মন। ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বাইশ ফকিরের সকলেরই এক মন, এক আত্মা ছিল। ইহাই দরদী ভাব। দরদী ভাব সম্বন্ধে নিজের একটী বিষয় উল্লেখ করিলাম।

আমার দরদী বন্ধু শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ ঠাকুর বলিতেন, "দরদী বিনে দরদ বোঝে না।" তিনি আমায় এত দরদ করিতেন যে, যখন বৈকালে তিনি সাধন ঘরে বসিয়া দেহ রাখেন, ঠিক সেই সময়ে আমি বাড়ীতে একটী গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ আপনা হইতে কাঁদিয়া ফেলি। কান্না সংবরণ করিতে পারি না। যেন হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমার মনে হইল যে এক আত্মীয়া অত্যন্ত পীড়িত ছিল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবাবুর ছাপাখানার একজন কর্ম্মচারী আসিয়া খবর দিলেন যে, "কর্ত্তাবাবু" দেহ রাখিলেন। দেহরক্ষার ঠিক সময়েই আমার আত্মা তাহা জানিতে পারায় আমি কাঁদিয়াছি বুঝিলাম। এমন দরদীভাব যে সাধন কালেও তিনি আমাকে ভুলেন নাই। তাঁহার আমার উপর যে কি গভীর অপার্থিব ভালবাসা ছিল তাহা স্মরণ করিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য শেষের দিনের অপেক্ষায় বসিয়া আছি। সকলই

প্রভুর কৃপা। ক্ষীরোদবাবুও দরদী বন্ধু ছিলেন। তিনিও চলিয়া গিয়াছেন। ভাঙ্গা হাটে নিঃসঙ্গ হইয়া এক্‌লা বসিয়া আছি। সদাই মনে পড়ে, "এবে পার কর মোর ভাঙ্গা তরণীখানি।"

পরম শ্রদ্ধাস্পদ পরম সাধক আমার গুরুভাই শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাশ মহাশয় যখন দেহে ছিলেন, তখন তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম যে, একদিন তিনি একটি পীড়িত বন্ধুকে দেখিতে যাইবার জন্য প্রাতঃকালে পদব্রজে বাড়ী হইতে রওনা হইয়া ফুটপাথ দিয়া যাইতে যাইতে হেঁটমুখ করিয়া রাস্তা পার হইতেছিলেন, হঠাৎ চক্ষু চাহিয়া দেখেন যে তিনি চলন্ত মোটর গাড়ী ও লরী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন ও শ্রীগুরুকে চক্ষু বুজিয়া স্মরণ করিলেন। মনে করিলেন যে, আর রক্ষা নাই। তারপর হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া দেখেন যে, শ্রীগুরুর অশেষ কৃপায় সব গাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কোন শঙ্কা নাই। আস্তে আস্তে চলিলেন। মনে মনে উপলব্ধি করিলেন যে, শ্রীগুরু কৃপা করিলেন নচেৎ প্রাণ রক্ষা হইবার কোন উপায় ছিল না। ভক্তের পিছনে সদা গুরুশক্তি ও গুরুকৃপা পরিভ্রমণ করে ও ভক্তকে রক্ষা করেন।

আর এক ঘটনা বলিয়াছিলেন তাহা মনে আছে। যখন কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছে, সেই সময় তাঁহার একটী অনেকদিনের পুরাতন চাকর বাজারে গিয়া বাড়ী

ফিরে না। সাত আট দিন না আসায় ভাবিলেন যে, কোনরূপ দুর্ঘটনা হওয়ায় আসিতে পারে নাই। মনে মনে বলিলেন যে, "ঠাকুর, ঐ চাকরটী ছাড়া আমার গতি নাই। দয়া করিয়া তাহাকে আনিয়া দাও নচেৎ আমার কি করিয়া চলিবে।" এমনি শ্রীগুরুর কৃপা চাকরটী পরদিন প্রাতে হঠাৎ বাড়ী আসিল ও বলিল যে, হাঙ্গামার জন্য বাড়ী আসিতে পারে নাই। দাশ মহাশয় বলিলেন যে, "তাঁহার দয়া অনন্ত—লজ্জা হয় যে অল্পতেই প্রার্থনা করি। দুর্ব্বল জীব অল্পতেই আত্মহারা হই। পূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ থাকিলে কোন প্রার্থনা করিতে হয় না।"

দাশ মহাশয় কত উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন বলিতে পারি না। আমাকে বড়ই ভালবাসিতেন ও দরদ করিতেন। তাঁহাকে মনে করিলে বড়ই আনন্দ পাই। আবার তাঁহার সহিত দেখা হইবার আশায় বসিয়া আছি।

কাঁচরাপাড়া ধামের মহাভক্ত মানিক ময়রা সম্বন্ধে একটী গল্প মনে পড়িল। মানিক সদা ভাবে থাকিতেন। এই জন্য এলোমেলো ভাব ছিল। বৈঠকের সময় সকলে মানিকের উপর বিরক্ত হইত। একদিন ঘোষ মহাশয়, সকলে মানিকের উপর বিরক্ত হইতেছে বুঝিতে পারিয়া মানিককে বলিলেন যে, "মানিক তুমি চলিয়া যাও।" কর্ত্তার হুকুমে মানিক চলিয়া গেল। কিন্তু

একটু পরে ফিরিয়া আসিল। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানিক, তুমি আবার ফিরে এলে কেন?" মানিক বলিল যে, "যাব কি, এই সব ব্যাটাইত আমার সঙ্গে চলিয়াছে। উহাদের আমার সঙ্গে যেতে বারণ কর, তবে ত আমি যাব?" এই শুনিয়া সকলে লজ্জিত হইলেন। কর্ত্তা হাসিলেন ও স্নেহ করিয়া বলিলেন, "বস মানিক বস, আর যেতে হবে না।" এত অনুরাগ ছিল যে, মানিক সকল সময়েই শ্রীগুরুকে দর্শন করিতেন ও গুরুভাইদের সহিত মানসে সঙ্গ করিতেন। জীয়ন্তে মরা ছিলেন, সদা ভাবে থাকিতেন।

শ্রীযুক্ত মুখুয্যে মশাইয়ের একটী কথা লিখি নাই। এখন মনে পড়িল। মুখুয্যে মশাই সদাই নামানন্দে থাকিতেন। সংসারের ভাবনা ভাবিতেন না। অথচ গুরুকৃপায় অভাব হইত না—চলিয়া যাইত। অতিথি ভোজন, সাধুভোজন রোজ হইত। একদিন ঘরে কিছু নাই, অথচ অতিথি জনকয়েক উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছেন। নিত্য পার্ষদ ঈশান ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিয়া আছেন। এমন সময় পোষ্ট অফিসের এক পিওন আসিয়া মুখুয্যে মশাই নামীয় একটি কুড়ি টাকার মনি-অর্ডার দিল। কোন এক অজ্ঞাতনামা ভক্ত সাধুসেবার জন্য টাকা পাঠাইয়াছেন, মুখুয্যে মশাই বুঝিলেন। ঐ টাকায় অতিথিভোজন আদি হইয়া গেল। সংসার শ্রীগুরুর। এইরূপে মুখুয্যে মশাইয়ের, নবদ্বীপের

চৈতন্যভক্ত শ্রীবাসের মত, সংসার চলিয়া যাইত। পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও শরণাগতি ছিল। এইজন্য লোকে বলিত, "মুখুয্যে মশাইয়ের বাড়ীর চালে খড় নাই, দেওয়ালে মাটি নাই কিন্তু প্রত্যহ অতিথি, কাঙ্গাল, ফকির প্রভৃতির সেবা চলিত।" সে দিনের সহিত বর্ত্তমান দিনের তুলনা হয় না। সে ভাব জীবের কমিয়া গিয়াছে—সকলে আত্মসুখে সুখী। সকলই কাল ধর্ম্ম। স্মৃতি মাত্র আছে। প্রভু, এ দুর্দ্দিনে এসো—আনন্দের হাট বসাও। জীব আত্মসুখ ভুলিয়া তোমায় দেখিয়া কৃতার্থ হউক। এমন দিন কবে হবে জানি না।

আমাদের ধর্ম্মের একজন গুরুভাই সম্বন্ধে একটু পুণ্য কথা লিখিতেছি। পূর্ব্বে ইঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। এবার তাঁহার সৎকীর্ত্তি ও মহান চরিত্র সম্বন্ধে লিখিব। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, বাড়ী হালিসহর। তিনি হুগলী জর্জ কোর্টের সরকারী উকিল (Public Prosecutor) ছিলেন। মহা বিদ্বান ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। মহা পিতৃমাতৃভক্ত ছিলেন। ক্রোধ কাহাকে বলে জানিতেন না। যেমন দুহাতে রোজগার করিতেন তেমনিই দুহাতে নির্বিচারে দান করিতেন। কাহারও দুঃখ সহিতে পারিতেন না। দয়ার অবতার ছিলেন। মোটের উপর আদর্শ পুরুষ ছিলেন। অসাধারণ

গুরুভক্তি ছিল। তিনি হালিসহর হইতে প্রত্যহ নৌকা করিয়া হুগলী যাইতেন। হালিসহরের বাড়ীতে যত অভ্যাগত ব্যক্তি ও গরীব, দুঃখী, কাঙ্গাল প্রভৃতি আসিত তাহারা প্রাতঃস্মরণীয় হেমবাবুর বাড়ীতে আদরের সহিত, মিষ্ট কথার সহিত খাইয়া যাইত। একটী পাচক ব্রাহ্মণ সকাল হইতে রাত্র অবধি দুবেলা ভাত, কলাইয়ের ডাল ও চচ্চড়ী ঐ সকল অতিথির জন্য রান্না করিত ও তাহাদের খাওয়াইত। সকলেই জানিত যে হেমবাবুর বাড়ী গেলে খাইতে পাইবে। হেমবাবু নিত্য যাহা ওকালতি করিয়া পাইতেন তাহা প্রত্যহ খরচ হইয়া যাইত। এ ত গেল তাঁহার অন্নসত্রের কথা। ইহা ছাড়া তাঁহার দান ছিল। কেহ অভাবগ্রস্ত আসিলে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইত না। অনেককে তিনি মাসিক টাকা পেন্‌সনের মত দিতেন। একজন শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভাইকে তাঁহার অবস্থা খারাপ হওয়ায় মাসে ৩০৲ টাকা করিয়া দিতেন, আমি জানি। সম্মানের সহিত হৃষ্টমনে দিতেন। দেশের অনেক দুঃস্থ ব্যক্তিকে পাঁচ দশ করিয়া টাকা মাসে মাসে দিতেন। সকলে মাসের প্রথম তারিখে আসিয়া টাকা লইয়া যাইত। তিনি দেহ রাখায়, সকলে পিতৃহীন হইয়াছে।

একদিন একটি ব্রাহ্মণ সকালে আসিয়া শ্রীযুক্ত হেমবাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে, সে কন্যাদায়গ্রস্ত, তাই মহাশয়ের

নিকট আসিয়াছে। তাহাতে হেমবাবু বলেন, "অদ্য আমার হাতে কিছু নাই, তবে আপনি যাইবেন না, খাওয়া দাওয়া করিয়া বিশ্রাম করুন। আমি আজ যাহা পাইব তাহাই আপনাকে দিব।" ব্রাহ্মণ তাঁহার ধর্ম্মশালায় আহার করিয়া হেমবাবুর অপেক্ষায় সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে বাহিরে বসিয়া রহিলেন। তখন শীতকাল। সে দিন হেমবাবুর আসিতে অনেক রাত্রি হইল। জজকোর্টে বড় মোকর্দ্দমা ছিল। ব্রাহ্মণ খাইয়া বাহিরে বসিয়া আছে। হেমবাবুকে আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। হেমবাবু বলিলেন, "ঠাকুর, আপনার ভাগ্যে আজ বেশী পাই নাই।" হেমবাবু টাকায় বড় হাত দিতেন না। তাঁহার মুহুরীকে বলিলেন যে, পকেটে যাহা আছে বাহির কর। উক্ত মুহুরী পকেট হইতে নোটে ও গিনিতে প্রায় সাড়ে আট শত টাকা বাহির করিয়া রোয়াকে রাখিল। হেমবাবু কিছু না বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ পিছন পিছন গিয়া বলিল, "বাবু আমি কত লইব।" তাহাতে হেমবাবু বলিলেন "সবই ত আপনাকে দিয়াছি। আমি ত বলিয়াছিলাম, আজ যাহা পাইব তাহা দিব।" ইহাতে ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "বাবু; আমার ত তাহা হইলে বিবাহের সব টাকা পাওয়া হইল।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া ফেলিল। হেমবাবু আর পিছন না ফিরিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। হেমবাবু এত বড় হৃদয়বান, দয়ালু পুরুষ ছিলেন। আরও এইরূপ কত দৃষ্টান্ত

আছে তাহা লিখিতে গেলে একটী গ্রন্থ হইয়া যায়। প্রায়ই আসামীর পক্ষে কার্য্য করিতেন। অনেককে গুরুতর অপরাধ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যে টাকা দিতে পারিত না তাহার নিকট কিছু লইতেন না। তাঁহার মাতার অত্যন্ত দয়া ছিল। অনেকে তাঁহার মাতাকে আসিয়া ধরিত। হেমবাবু সে সব মোকর্দ্দমা বিনা টাকায় করিতেন ও আসামী খালাস করিতেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সদানন্দ ছিলেন।

হেমবাবু শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা করিতেন। তাহাতে আট দশ হাজার টাকা এক দিনে খরচ হইত। বহু কাঙ্গাল, গরীব বহু দূর হইতে আসিত। সকল দরিদ্রনারায়ণকে নিজ হস্তে বস্ত্র, কম্বলাদি দিতেন ও সকলকে পরিতোষ করিয়া নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সমস্ত দিন ও রাত্র অবধি ভোজন করাইতেন। আধুনিক কালের মত বহ্বাড়ম্বর ব্যয় ছিল না। কেবল দরিদ্র ভোজন ও দরিদ্রের দুঃখ মোচনে এত ব্যয় হইত। দুঃখ করিয়া বলিতেন যে টাকার অভাবে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করিতে পারিলেন না, কারণ ৺দুর্গাপূজায় তিন দিন দরিদ্র ভোজন ও বস্ত্রাদি বিতরণে তাঁহার অন্ততঃ ৩০।৪০ হাজার টাকার দরকার হইত। কিন্তু সে অর্থ ছিল না। হেমবাবু এইরূপ পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিয়া শ্রীগুরু আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া সজ্ঞানে

শ্রীগুরু নাম করিতে করিতে দেহ রাখেন। তিনি কোন সঞ্চিত অর্থ রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সকালে তাঁহার নাম করিলে দিন ভাল যায়। হেমবাবু চলিয়া যাওয়ায় গরীব, দুঃস্থ লোক সকল পিতৃহীন হইয়াছে। প্রকৃত সাধু পুরুষ ছিলেন। মুখুয্যে মশাই বলিতেন, *টাকা সঞ্চয়ের জন্য নহে খরচের জন্য।* হেমবাবু তাহা নিজ কার্য্য দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন।

একটী কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। শ্রীযুক্ত হেমবাবু কি রকম ক্ষমাশীল ও অক্রোধী ছিলেন তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। হেমবাবুর পিতা প্রতিবেশীদের সহিত দুপুর বেলায় তাস খেলিতেন। তাঁহার মুহুরীর পিতাও তাঁহার সহিত তাস খেলিতেন। তাস খেলিতে খেলিতে উক্ত মুহুরীর পিতার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া ঝগড়া হওয়ায় উক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে বাপ তুলিয়া গালি দেয়। ইহাতে তিনি খেলা পরিত্যাগ করিয়া ঘরে চলিয়া যান। পুত্র হেমবাবু কোর্ট হইতে বাড়ী আসিলে বলেন যে, "হেম, তুমি আজ হ'তে তোমার মুহুরীকে কার্য্য হইতে বরখাস্ত করিবে, না কর ত আমি কাশী চলিয়া যাইব।" মুহুরীর পিতা তাঁহাকে বাপ তুলিয়া অপমান করিয়াছে বলিলেন। হেমবাবু বলিলেন, "বাবা, আপনার যাহা আজ্ঞা তাহাই

হইবে।” পিতা সন্তুষ্ট হইলেন। পিতা আর তাস খেলেন না। মুহুরীর পিতা অন্যায় করিয়াছে বুঝিতে পারায় ক্ষমা চাহিল, কিন্তু হেমবাবুর পিতা অটল রহিলেন। দুচার দিন পর হেমবাবুর পিতা হেমবাবুকে বলিলেন, “হেম, তুমি ত মুহুরীকে বরখাস্ত করিলে না দেখ্‌ছি, ইহার মানে কি বাপু?” হেমবাবু বলিলেন, “বাবা, একটা কথা বলি। মুহুরী ত আপনারই চাকর। আপনার দৌলতে তাহার পিতার সংসার চলিতেছে। তাহার পুত্র বরখাস্ত হইলে না খাইয়া সব মরিয়া যাইবে ইহা জানিয়া শুনিয়া আপনাকে ঐরূপ গালি দিতে পারে কি? ইহা কি সম্ভব? আমার বোধ হয় ভুল শুনিয়াছেন। “হেমবাবুর পিতা ইহা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “হেম, তোমাকে ত আমি খুব চিনি—তুমি অতি কাপুরুষ। যাক্, আমি আর বাইরে যাব না। ঘরে বসিয়া পুস্তকাদি পড়িব।” হেমবাবু সব বুঝিয়া কিরূপ ধৈর্য্য ও ক্ষমার পরিচয় দিলেন। অক্রোধী নিত্যানন্দ ছিলেন। দয়ার অবতার ছিলেন। এ ধর্ম্মের তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন। আজ তাঁহার কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত প্রাতঃস্মরণীয় নাম আছে মাত্র।

আমাদের সত্য তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য আছে এরূপ অনুভূতি ও গভীর প্রেমের ভাব-প্রকাশক কতকগুলি মহাজন বাক্য নিম্নে

দিলাম যাহা পাঠ করিয়া ও গভীর ভাব উপলব্ধি করিয়া আত্মহারা ভক্তগণ আনন্দ সম্ভোগ করিবেনঃ—

১। এক ফকিরকে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "ফকির সাহেব, এ দুনিয়াতে কি আশ্চর্য্য দেখিয়াছেন।" ফকিরসাহেব বলিলেন, "একটী তাজ্জব দেখিয়াছি যে দুনিয়ায় দুটি দরজা। মানুষ একটি দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছে, আর দৌড়াইতে দৌড়াইতে আর একটী দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। এই দৌড়াইয়া যাইবার মুখে, মানুষ জীবনের সর্ব্ব কার্য্য করিয়া যাইতেছে। লোকে ভাবে, বেশ বিশ্রাম করিতেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। দৌড়াইয়া যাইবার কালীন পথে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া অন্য দরজা দিয়া গন্তব্য স্থানে জীব চলিয়া যায়। এইটি আশ্চর্য্য দেখিয়াছি।"

২। হজরত মহম্মদ অলৌকিক কার্য্য করিয়া লোকের উপকার করিতেন। উৎকট ব্যাধি সব আরাম করিতেন। একদিন আলি প্রভৃতি শিষ্য সহ মক্কায় বসিয়া আছেন, এমন সময় বাগদাদ হইতে একটী গরীব লোক তাহার একটী শিশুপুত্রকে লইয়া হজরতের নিকট আসিল। হজরত তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে কি চাহে। তাহাতে সে ব্যক্তি বলিল

যে তাহার এই শিশুপুত্রটী প্রত্যহ মিঠা (চিনি) না হইলে খাইতে পারে না। সে গরীব মানুষ। প্রত্যহ মিঠা জোগাড় করিতে পারে না। তজ্জন্য তাহার পরিবার তাহার উপর রাগ করিয়া বড় ঝগড়া করে। হুজুর, এই শিশুকে হুকুম করুন যেন আর মিঠা না খায়। হজরত বলিলেন, তুমি এক সপ্তাহ পরে আসিও। পুনরায় এক সপ্তাহের পর উক্ত লোক আসিল। হজরত ঐ শিশুকে নিকটে আনিয়া কোলে বসাইয়া বলিলেন, "বাচ্ছা, তোমার বাপ গরীব, পয়সা নাই তাই চিনি কিনিতে পারে না। তুমি আর চিনি খাইও না।" শিশু বলিল যে, সে আর চিনি খাইবে না। এইরূপ শিশুপুত্র তিনবার বলিল। হজরত বলিলেন যে শিশুকে লইয়া যাও। শিশু জীবনে আর চিনি খাইবে না। সে ব্যক্তি চলিয়া গেল। ইহার পর হজরতের প্রধান শিষ্য ও জামাতা আলি বলিলেন, "প্রভু, এ হুকুম গত সপ্তাহে শিশুকে দিলেই হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া গরীবকে অতদূর হইতে পুনরায় আসিবার আদেশ কেন দিলেন। এত সামান্য ব্যাপার ছিল।" তখন হজরত উত্তর দিলেন, "আলি, এইটার অপেক্ষা আমার দুরূহ ব্যাপার কোনটাই ছিল না। দেখ, আমি চিনি না হইলে খাইতে পারি না, তোমরা জান। সুতরাং সেই চিনি চিরকালের জন্য ছাড়িতে আমার এক সপ্তাহ সময় লাগিল। আমি না ছাড়িলে আর একজনকে

ছাড়িবার জন্য হুকুম দিলে সে হুকুম থাকিবে কেন? আমি মিথ্যাবাদী—আর একজনকে যদি বলি, মিথ্যা বলিবে না, তাহা হইলে সে আদেশ প্রতিপালিত হইবে না। আমি সত্যবাদী হইলে সে সত্যবাদী হইবে জানিও। "এইজন্য মিথ্যা "ধ'ক্কর আদেশ প্রতিপালিত হয় না।" এই শুনিয়া আলি হায় হায় করিতে লাগিল ও বলিল, "আহা, চিনি না খেলে আপনার খাওয়া হবে না ও কত কষ্ট হইবে; আগে জানিলে ঐ ব্যক্তিকে কাছে আসিতে দিতাম না।" হজরত মহাপুরুষ, এই শুনিয়া হাসিলেন। এইরূপ না হইলে তাঁহাকে ঈশ্বরের সখা বলিবে কেন? নিজে পরশপাথর না হলে অপরকে সোনা কি করিয়া করিবে। আত্মসুখে সুখী যারা, তারা শ্রীগুরুর কৃপা লাভ করিতে পারে না। সদা তদ্ভাবে ভাবিত হ'তে হয়। সদা গুরুতে স্থিত হইতে হয়। শ্রীগুরুই সত্য যাহার জ্ঞান হইয়াছে তাহার হুকুমে মরা জীবিত হয়।

৩। হজরত স্বর্গে যাইবার পর হজরতের স্ত্রী ও আলির শাশুড়ি আয়েসা বলিয়াছিলেন যে, "দেখ আলি, হজরত কত বড় সাধক ছিলেন তাহা শুন। আমি প্রৎ" কুমারী—আমাকে বিবাহ করিয়া হজরত প্রথম দিন আমার কুটীরে সন্ধ্যাকালে আসেন। আমার কত আনন্দ যে হজরত আমার নিকট আসিয়াছেন।

হজরত আমার কাছে শয়ন করিয়া যেন অসুস্থ হইয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন। তিনি বৃদ্ধ সে কারণ তাঁহার মনোভাব বলিতে পারিতেছেন না মনে করিয়া আমি বলিলাম, 'প্রভু, আমি আপনার বাঁদী—আপনার কি ইচ্ছা বলুন।' তাহাতে তিনি কিছু বলিলেন না। পুনরায় ঐরূপ ভাব দেখিয়া আমি আবার বলায় তিনি বলিলেন যে, 'আয়েসা, আমি বেশ আছি। কিছু মনে করিও না। আমি নেমাজ পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি।' তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। ইহার পর হজরত মেজেতে বসিলেন ও ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার বদনে জ্যোতি খেলা করিতে লাগিল, চক্ষে ধারা পড়িতে লাগিল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রাতে উঠিয়া দেখি, হজরত সেইভাবে ধ্যানে বসিয়া আছেন। হজরত এত বড় আত্মা ছিলেন। দেহবুদ্ধি ছিল না। সুন্দরী কুমারী স্ত্রীতে মোহিত না হইয়া প্রিয়তম পরমেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইলেন। দেখ আলি, সাধারণ মানুষে ইহা সম্ভব নয়। তিনি সত্য মানুষ ছিলেন। নামরূপে সর্ব্বদা মজিয়া থাকিতেন।"

৪। এক বাদসা সমস্ত দিন রাজ কার্য্য করিয়া মন তিক্ত হইয়া য়াঁহায় মন্ত্রীকে বলিলেন, "আমায় এমন কোথাও লইয়া যাও যেখানে গেলে মনে শান্তি পাবো।" মন্ত্রী মন

বুঝিবার জন্য এক বিখ্যাত পীরসাহেবের নিকট লইয়া গেলেন। পীরসাহেব বাদ্‌সাকে দেখিয়া অনেক খাতির করিলেন। বাদ্‌সা মন্ত্রীকে চুপি চুপি বলিলেন, "অন্যত্রে চল, এখানে শান্তি হবে না।" তখন তিনি সন্ধ্যার পর বাদ্‌সা সহ একটী জঙ্গলে গেলেন। জঙ্গল মধ্যে একটী পর্ণকুটীর দেখিতে পাইলেন। ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। কুটীরের ঝাঁপে আস্তে আঘাত করিতে ভিতর হইতে এক ফকিরসাহেব বলিলেন, "কে, কি চাও? মন্ত্রী বলিলেন, "বাদ্‌সা আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।" ফকিরসাহেব কুটিরের ভিতরের আলো নিভাইয়া দিয়া বলিলেন যে, তিনি বাদ্‌সার মুখ দর্শন করেন না। বাদ্‌সার এখানে কি দরকার? তিনি বাদসার কোন ধার ধারেন না। তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট হইতেছে। বাদ্‌সা এখানে হইতে চলিয়া যাক্। এই শুনিয়া বাদস বলিলেন, মন্ত্রী এখানে আমার শান্তি হবে।

বাদ্‌সা অনেক কাকুতি মিনতি করায় ফকিরসাহেব অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ খুলিলেন। বাদ্‌সা প্রবেশ করিতে ফকির বাদ্‌সার হাতে হাত দিয়া বলিলেন যে, বাদ্‌সা, বড় নরম হাত—দেখো দোজকের (নরকের) আগুণে না এ হাত পুড়িয়া যায়। বাদ্‌সা কাঁদিয়া ফেলিলেন। ফকির বলিলেন, বাদসা কি চাও? বাদ্‌সা বলিলেন, দুটো ভাল কথা শুনিব।

সত্য-স্রোত

পরম সাধক মহাপুরুষ

ডাক্তার শ্রীসুন্দরী মোহন দাস মহাশয়
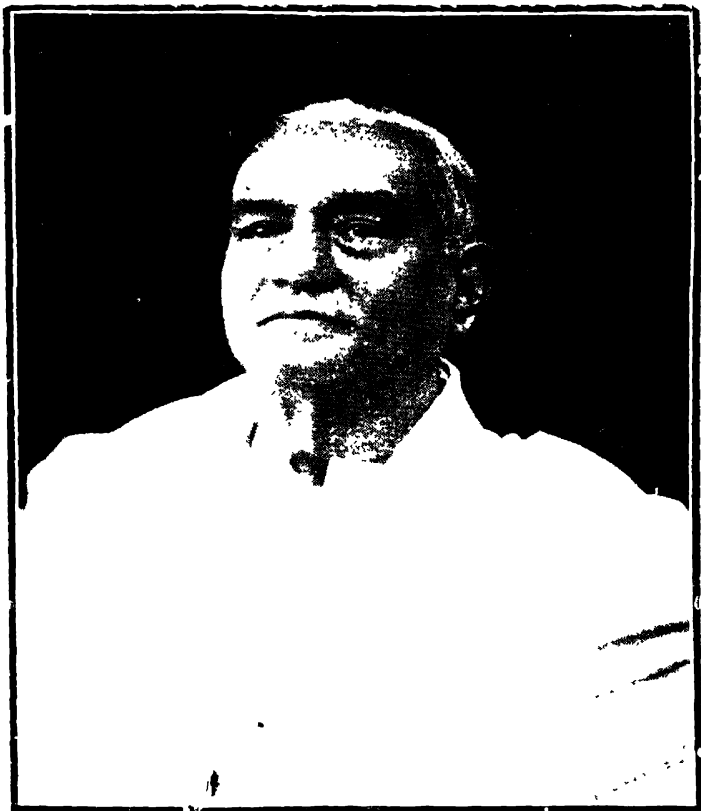
আবির্ভাব — ১২৬০ সাল   তিরোভাব — ১৩৫০ সাল

ফকির সাহেব বলিলেন যে বাদ্‌সা, সবই পুরানো কথা, তবে একটা কথা শোন। ধর একদিন তোমার ইচ্ছা হইল যে সাহারা মরুভূমি দেখিবে। তুমি একদিন প্রাতে কাহাকেও না বলিয়া [illegible]। সাহারা মরুভূমিতে প্রবেশ করিলে। বহুদূর গিয়াছ, কিন্তু বুঝিতে পার নাই যে তুমি মরীচিকায় পড়িয়াছ। মনে হইতেছে, সম্মুখে সরোবর, কিন্তু সরোবরের নিকট যাইতে পারিতেছ না। নিকটে গেলেই মনে হয় আরো দূরে সরোবর আছে। বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছ, প্রখর রৌদ্র মাথার উপরে। ভয়ানক জল তৃষ্ণা পাইয়াছে। তৃষ্ণায় প্রাণ যায়—কেহ কোথাও নাই—কোন উপায় নাই। তুমি মরুভূমির মধ্যে। জল বিনা প্রাণ রক্ষার উপায় নাই। এই সময় ভগবানের কৃপায় কেহ সেখানে আসিয়া তোমাকে যদি সুশীতল জল দেয়, তুমি তাহাকে কি দিবে বল। বাদ্‌সা উত্তর করিলেন, সে যাহা চাহিবে তাহা দিব। প্রাণের অপেক্ষা কিছু বেশী নহে। ফকির সাহেব বলিলেন, বাদসা তোমার কি আছে? বাদ্‌সা বলিলেন যে, আমার রাজত্ব আছে। ফকির বলিলেন, যদি সে অর্দ্ধেক রাজত্ব চাহে? বাদ্‌সা বলিলেন, নিশ্চয় অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব। ফকির বলিলেন, আচ্ছা, তোমায় জল দিল ও তোমার প্রাণ বাঁচিল। তাহাকে তুমি অর্দ্ধেক রাজত্ব দিলে। তাহা হইলে এখন তোমার কি থাকিল? বাদ্‌সা বলিলেন, অর্দ্ধেক রাজত্ব থাকিল।

তখন ফকির সাহেব বলিলেন, দেখ বাদ্‌সা, এই প্রখর রৌদ্রে হঠাৎ জল খাইয়া তোমার সর্দ্দিগর্ম্মী দেখা দিল। আবার প্রাণ যায় যায়। এবার যদি তোমায় কেহ বাঁচাইয়া দেয় তাহাকে কি দিবে? সে যদি ঐ বাকী অর্দ্ধেক রাজত্ব চাহে তাহা হইলে কি করিবে? বাদ্‌সা বলিলেন, অর্দ্ধেক রাজত্বই দিব। ফকির সাহেব বলিলেন, আচ্ছা, অর্দ্ধেক রাজত্বের বিনিময়ে তোমার প্রাণ বাঁচিল। আচ্ছা বাদ্‌শা, এবার তোমার কি থাকিল? বাদ্‌শা বলিলেন, আর আমার কিছু রহিল না। আমি পথের ভিখারী।

"দেখ, খোদার ইচ্ছায় বাদ্‌শা ছিলে," ফকির সাহেব বলিতে লাগিলেন, "আবার ঘটনাচক্রে মূহুর্ত্তমধ্যে ভিখারী হইয়া গেলে। অহঙ্কার বড়ই খারাপ বস্তু। অহং অর্থাৎ দেমাক্ না রাখিয়া রাজত্ব করিবে। এক মূহুর্ত্তে সকলই চূর্ণ হতে পারে। দিন দুনিয়ার মালিক্‌কে সদা স্মরণ করিয়া, গোলাম হইয়া, অনাসক্ত ভাবে অকর্ত্তা হইয়া রাজত্ব করিবে। এই বলিয়া বাদ্‌শাকে বিদায় করিয়া দিয়া ধ্যানে বসিলেন। বাদ্‌শা শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে রওনা হইলেন। এই সব ফকির, দরবেশ প্রকৃত সুফী, মারফতি। ভক্তিমার্গে, রাগমার্গে অবস্থিত। ইহারা গাছের পাতা ছিঁড়িতে কষ্ট বোধ করে। ইহারা সদাই বলেন, "মুরসিদ সত্য (গুরু সত্য)"। আমাদের সত্য ধর্ম্মের সহিত সুফী ধর্ম্মের সাদৃশ্য আছে।

৫। একবার আমি হরিদ্বার যাইতেছি। পথিমধ্যে ট্রেনে আমি যে কামরায় ছিলাম সেই কামরায় একটী ফকির উঠিলেন। খানিক পরে তিনি ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অন্যান্য আরোহীরা চটিয়া গেল ও বলিল যে, মেয়ে মানুষের মত কেন কাঁদিতেছ। ফকির কিছু বলেন না—কেবল কাঁদেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম কাঁদিবার কারণ কি? তাহাতে তিনি বলিলেন, "খোদাকা কুদ্‌রতিসে ট্রেন চল্‌তি হ্যায়।" ইহার অর্থ ভগবানের কৃপায় ট্রেন চল্‌ছে। শ্রীগুরুর ইচ্ছা না হলে কিছু হয় না। সব তাঁর মর্জ্জি। ফকির সাহেব ভাবে আছেন ও শ্রীগুরুর মহিমা সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছেন। ট্রেন চলা দেখিয়া ভাব আসিয়াছে—প্রভুর কৃপায় ট্রেন চলিতেছে। এই মহিমা দেখিয়া তাঁহার প্রেমাশ্রু পড়িতেছে। বহিরঙ্গ অন্য ভাবে ফকিরকে দেখিয়া হাসিতেছে। ফকির সাহেব ভাবে মজিয়া আছেন বুঝিলাম।

৬। আমার যখন ত্রিশ বৎসর বয়স তখন পিতৃদেবকে তীর্থ দর্শন করাইতে যাই। ৺কাশীধাম, প্রয়াগ, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, গোকুল দর্শন করিয়া হরিদ্বার, হৃষিকেশ হইয়া কুরুক্ষেত্র তীর্থে আমরা আসি। কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন হ্রদে স্নান করিয়া, মাতা ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধাদি করিয়া পাণ্ডার সহিত ভদ্রকালী দেবী দর্শন করি। ভদ্রকালীর কোন মূর্ত্তি নাই। একটী গভীর কূপ আছে মাত্র।

উহাকে কুণ্ড বলে। উহাতে মহামায়ার অঙ্গ পড়িয়াছে। ভদ্রকালী দর্শনের অগ্রে পাণ্ডা বলেন যে, ভদ্রকালীর পুরাতন পূজারী ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহাকে লোকেরা ত্যাগ করায় মন্দিরের পূজারী অনেকদিন ছিল না। বর্ত্তমান পূজারী একজন পবিত্র সন্ন্যাসী ও সৎ লোক। ইনি হঠাৎ এখানে সম্প্রতি আসায় আমরা সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পূজারী পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। কাহারও ব্যায়রামাদি হইলে যাহাকে হোমের বিভূতি (ভস্ম) ও ফুল দেন তাহা দ্বারা রোগ ভাল হইয়া যায় ও মঙ্গল হয়। উনি "মহাপুরুষ" বলিলেন। আমি পিতৃদেব সহ মন্দিরে আসিয়া দেখি যে, একটী দীর্ঘকায়, লম্বা, শ্যামবর্ণ, জটাধারী পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন। পাণ্ডা বলিলেন যে, ঐ মহাপুরুষের কথা বলিয়াছিলাম। আমি মহাপুরুষের সম্মুখে গেলাম ও হাত তুলিয়া অভিবাদন করিলাম। তিনি আমায় দেখিয়া আমার নাম ধরিয়া বাঙ্গালায় বলিলেন "কেমন আছেন।" আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "আমায় কি করিয়া আপনি জানিলেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন যে, আমার নাম অমুক—কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা উভয়ে অমুক স্থানে ছিলাম। তখন আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। তিনি পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম অস্পষ্ট লিখিলাম না। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ার পর দুটি ছেলে মেয়েকে শ্যালকের কাছে রাখিয়া মনে বৈরাগ্য হওয়ায় এক

কাপড়ে বিনা সংস্থানে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া, সামান্য ভিক্ষায় জীবনধারণ করিয়া পদব্রজে দ্বারকায় আসেন। দ্বারকায় আসিয়া শ্রীগুরু লাভ হয় ও শ্রীগুরু কৃপা করেন। এক বৎসর পরে শ্রীগুরু আদেশ করেন যে, বৎস, তুমি কুরুক্ষেত্রে গিয়া সাধন ভজন কর ও তথায় থাক। তথায় গেলে তোমাকে সকলে আগ্রহের সহিত ভদ্রকালী মন্দিরের পূজারী পদে প্রতিষ্ঠিত করিবে। আমি শ্রীগুরুর আদেশে কুরুক্ষেত্রে আসি। শ্রীগুরুর বাক্যই সত্য হইল। আসিবামাত্র সকলে এমন কি এই স্থানের ভক্তিমতী রাণীও আমাকে ভদ্রকালী মন্দিরের পূজারীব পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি সেই অবধি মা ভদ্রকালীর পূজা করি ও সাধন ভজন করিয়া দিন কাটাই। রাণীমা প্রত্যহ আমাকে আটা, ঘি, তরকারী প্রভৃতি পাঠাইয়া দেন। আমি বলিলাম যে, তুমিত ভাই মহাপুরুষ। শুনিলাম তুমি যে ফুল-পত্রাদি লোককে দাও তাহা ধারণ করিয়া লোকের রোগ ভাল হইয়া যায়। এই শুনিয়া তিনি হাসিলেন ও বলিলেন যে, হোম করিয়া যে বিভূতি (ভস্ম) ও ফুল থাকে, লোকে ব্যায়রাম আদির জন্য আশীর্ব্বাদ চাহিলে ঐ ভস্ম ও ফুল শ্রীগুরুকে স্মরণ করিয়া দিই। শ্রীগুরুর কৃপায় রোগ সারিয়া যায়। শ্রীগুরুর কৃপায় উহা সঙ্ঘটিত হয় নচেৎ আমার কি ক্ষমতা। তাঁহার গুরুদত্ত নাম হইয়াছে—শ্রীসারদাস্বরূপ ব্রহ্মচারী। ছেলেমেয়ে

ছুটীর তিনি আর খবর রাখেন নাই ও আর পূর্ব্ব জীবনের কোন সম্পর্ক রাখেন না। শ্রীগুরু পদে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শান্তিতে আছেন। এখন শ্রীগুরুই তাঁহার সর্ব্বস্ব। আমাকে পিতা সহ রাত্রে খাইতে বলিলেন ও ছুটী রুটি তৈয়ার করিয়া খাওয়াইবেন বলিলেন, কিন্তু আমাদের থাকা হইল না। রাত্রে অন্যত্র রওনা হইলাম। স্ত্রীর মৃত্যুই তাহার মুক্তির কারণ হইল। কখন কিরূপে প্রভু কৃপা করেন বলা যায় না। সবই তাঁর ইচ্ছা। আর বন্ধুবরের খবর পাই নাই বা লই নাই। আমাদের আদেশ "সংসার রাখিয়া ধর্ম্ম।" কাজেই তাহাই করিতেছি। কবে শ্রীগুরুপদে লীন হইয়া তাঁহার নিকট যাইব জানি না। এই প্রাচীন বয়সে তাঁহার শ্রীমুখ চাহিয়া বসিয়া আছি। সর্ব্বদা মনে হয় কিছুই হলো না। কেবল মনে পড়ে—"এবে পার কর মোর ভাঙ্গা তরণীখানি। জীর্ণ তরী, তুফান ভারী আমি আর বাইতে নারি॥" যাবার সময় তোমায় না ভুলি শ্রীচরণে এই শেষ মিনতি দাসের। জয়গুরু, জয় দয়াময়, জয় অধমতারণ।

৭। আমি হরিদ্বারে গিয়া লালতারা বাগে মহাত্মা ভোলা মহারাজকে দর্শন করিতে তাঁহার আশ্রমে গিয়াছিলাম। ভোলা মহারাজকে দর্শন করিলাম। অনেক ভক্ত গিয়াছে। মহাত্মা

সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, বাবারা, আমাকে কিছু দান দিতে হবে। সকলে ভাবিল টাকাকড়ি দিতে হবে। কেহ বলিল যে, যাহা পারিব তাহা দিব। মহাত্মা বলিলেন, দেখ বাবা, তোমরা প্রাতে উঠিয়া অগ্রে মাতাপিতাকে প্রণাম করিবে ইত্যাদি নীতি-শিক্ষা দিলেন। তারপর বলিলেন যে, মিথ্যাকথা কেহ বলিবে না। এই দান আমায় দিতে হইবে। মিথ্যা কথা যাহাতে নিবারণ হয় তজ্জন্য একটী উপায় বলিতেছি। প্রতিজ্ঞা করিবে, আমার নিকট প্রতি মিথ্যা কথার জন্য প্রত্যহ তোমায় এক আনা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। রাত্রে শুইবার সময় হিসাব করিবে কত মিথ্যা কথা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলে যে, কুড়িটী মিথ্যা কথা বলিয়াছ। তাহা হইলে পাঁচ সিকা জরিমানা তুলিতে হইল। টাকার মার বড় মার। ক্রমশঃ চেষ্টা করিয়া মিথ্যা কথা কমিতে লাগিল। জরিমানাও কম দিতে হইল। যে দিন দেখিলে মিথ্যা কথা আর হয় নাই তখন কত আহ্লাদ। আর জরিমানা দিতে হইল না। জরিমানার টাকা ভিখারীকে দান করিবে। এই ভিক্ষা আমায় দাও। আমি আর কিছু চাহি না। এইরূপ করিয়া সত্য অভ্যাস করিবে। তীর্থ ক্ষেত্রে, সাধু সম্মুখে প্রতিজ্ঞা যখন করিয়াছ তখন তাহা নিশ্চয় পালন করিও। আমাদের এই সত্য ধর্ম্মের প্রধান আদেশ, "সত্য বলিবে। সত্য বল্, সঙ্গে চল্।" সত্য পালন করিলেই শ্রীগুরুর হইলে।

৮। একদিন বৈদ্যনাথ ধামে মহাত্মা বালানন্দ স্বামীর আশ্রমে বসিয়া আছি। সেখানে এক ভদ্রলোককে বলিতে শুনিলাম যে বাবা, যতক্ষণ আপনার নিকট থাকি ততক্ষণ মন স্থির থাকে, পবিত্র থাকে। আবার আশ্রম হইতে বাহিরে গেলেই সব ভুলিয়া যাই ও নানারূপ পার্থিব চিন্তা আসিয়া পড়ে। এই শুনিয়া স্বামীজি হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, সাধু সঙ্গে যে রঙ ধরে তাহা সবটা যায় না, কিছুটা থাকে। দেখ, তুমি দোকানে গিয়া দুই আনা ঘি কিনিয়া বাটি করিয়া লইয়া আসিতেছে, কিন্তু হঠাৎ বাটিটা পড়িয়া গেল ও ঘিও পড়িয়া গেল। ঘি যদিও পড়িয়া গেল কিন্তু বাটির গায়ে যে ঘি লাগিয়া থাকিল তাহা চিক্‌চিক্ করিতে লাগিল। সেই রকম সৎ সঙ্গে বা সাধু সঙ্গ করিলে মনের পবিত্রতা সব চলিয়া যায় না, কিছু হৃদয়ে লাগিয়া থাকে। সাধু সঙ্গ করিতে করিতে রঙ ধরিয়া যায়, সে রঙ মুছে যায় না।" বড় মূল্যবান কথা। এইজন্য সৎসঙ্গ সর্ব্বদা দরকার করে—পরে ভাব স্বভাবে পরিণত হয়।

"ক্ষণমিহ সজ্জন সংগতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥"

৯। আমি সান্তাহারে এক সাধুকে দর্শন করি। তাহার নাম লোহাফকির। তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়।

তিনি মহাত্মা লোক। এক হাকিমের গাড়ীতে সান্তাহার ষ্টেসনে আস্তে আস্তে আসিলেন। ইংরাজ ষ্টেসনমাষ্টার খাতির করিয়া First Class Waiting Room খুলিয়া দিলেন। লোহাফকির হিন্দু সন্ন্যাসী। তাঁহার মাথায় মোটা লোহার টুপি, গলায় মোটা লোহার হাঁসুলি, হাতে ঐরূপ বালা, কোমরে মোটা শিকল, পায়ে মোটা লোহার মল, হাতে মোটা লোহার লাঠি। সর্ব্ব সমেত দেহে আছে একমণের উপর লোহা। কোনটী খুলিবার উপায় নাই। কেবল টুপি খোলা যায়। অতি অমায়িক সাধু ও হাসিমুখ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। তাহাতে বলিলেন যে, তুমি অনায়াসে বলিতে পার। আমি বলিলাম যে, আপনি মহাপুরুষ। তবে এত লোহা ধারণ করিয়া দেহকে কেন কষ্ট দিতেছেন। তাহাতে হাসিয়া বলিলেন যে, "ঠিক বলিয়াছ। তবে কথা হচ্ছে—তুর্ব্বার মন। ইহাকে বিশ্বাস করি না। সে কারণ এই লোহা পরিয়া অঙ্গকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছি। মনে করিলে কিছুই করিতে পারিব না। নচেৎ কি দরকার? চিত্তশুদ্ধি হলে কিছু দরকার হয় না। আমি মনকে বিশ্বাস করি না। এই আমার তপস্যা। ইহা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।" ইনি জ্ঞান মার্গের সন্ন্যাসী। ভাব স্বভাবে পরিণত হলে কিছুই করিতে হয় না।

১০। এই সত্য ধর্ম্ম বেদবিধির অতীত, পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা শাস্ত্রের গণ্ডির ভিতর নহে। ইহা নির্গুণ রাগানুগা ধর্ম্ম। এই রাগানুগা প্রেম সম্বন্ধে একটী গভীর ভাবপূর্ণ সাধুমুখ-নিঃসৃত মহাভাবের কথা নিম্নে লিখিলাম, যাহা পাঠ করিয়া ভক্তগণ গভীর ভাব উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইবেন। যথা—

একদা অর্জ্জুন ভ্রম করিতে করিতে একটী গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া যাওয়া কালীন একটী সরোবর দেখিতে পান। উক্ত সরোবরের নিকট গিয়া দেখেন যে, জলের ধারে একজন যোগীপুরুষ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে চারিটী শাণিত বান জলের ধারে পঙ্কে বিদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া, ইহার কারণ জানিবার জন্য অর্জ্জুন যোগীপুরুষের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে যোগীপুরুষের ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় চক্ষু চাহিয়া অর্জ্জুনকে ঐ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য দাঁড়াইয়া আছে? অর্জ্জুন নিজ পরিচয় না দিয়া বলিলেন, প্রভু! আপনি যোগীপুরুষ হইয়া হিংসার প্রতীক চারিটী শাণিত বান সম্মুখে রাখিয়া কেন তপস্যা করিতেছেন জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। উক্ত যোগীপুরুষ ইহা শুনিয়া বলিলেন, চারিজনা মহাপাপীকে বধ করিবার জন্য এই চারি বান

সম্মুখে রাখিয়া তপস্যা করিতেছি। ঐ চারিজনা আমার প্রাণগোবিন্দকে মহা কষ্ট দিয়াছে। যতদিন না ঐ চারি দুর্বৃত্তকে বধ করিতে পারি ততদিন তপস্যা করিব। এই শুনিয়া অর্জ্জুন বলেন যে, প্রভু, ঐ চারিজন মহাপাপী কাহারা, শুনিতে ইচ্ছা হয়।

যোগীপুরুষ উত্তরে বলিলেন, তবে শুন। প্রথম মহাপাপী হচ্ছে দ্রৌপদী। আমার প্রাণগোবিন্দ দ্বারকায় সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। সেই সময় হস্তীনাপুরে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতেছে। দ্রৌপদী "গোবিন্দ, রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার কচ্ছে। ভাবগ্রাহী গোবিন্দের ঐ চীৎকারে সুখ নিদ্রা ভঙ্গ হলো ও গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে আসিয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেন। অর্জ্জুন বলিলেন যে, দ্রৌপদী মহা ভক্ত সে কারণ গেবিন্দকে বিপদে পড়িয়া ডাকিয়াছিল। তাহাতে যোগীপুরুষ বলিলেন, ভক্ত হ'লে গোবিন্দকে কখনও কষ্ট দিত না—নিজের যা বিপদ বা কষ্ট হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, গোবিন্দ সুখে থাকিলেই তাহার সুখ। এ দরদীভাব দ্রৌপদীর ছিল না। এ দরদীভাব থাকিলে গোবিন্দকে কষ্ট দিত না। নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য, স্বার্থের জন্য গোবিন্দকে কাতরভাবে ডাকিত না। উলঙ্গ করে করুক, যা খুশী হয় হউক, তথাপি ভক্ত হ'লে উহা সহ্য করিত ও প্রাণগোবিন্দকে ডাকিয়া কষ্ট দিত না। দ্রৌপদী

গোবিন্দের উপর আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই। আত্মসমর্পণ করিলে গোবিন্দকে ডাকিয়া কষ্ট দিত না। ভক্ত বড় শক্ত কথা। দ্রৌপদী মহাপাপী। উহাকে আমি বধ করিব।

দ্বিতীয় পাপী অর্জ্জুন। আমার প্রাণগোবিন্দকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুন নিজের স্বার্থের জন্য রথের সারথী করিয়া আহা কত না কষ্ট দিয়াছে। তাহাকেও ছাড়িব না, বধ করিব। এও মহাপাপী।

তৃতীয় মহাপাপী হচ্ছে প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদকে বধ করিবার জন্য, তাহার পিতা হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে হস্তী পদতলে ফেলিয়া, বিষ খাওয়াইয়া, আগুনে ফেলিয়া ইত্যাদি নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু প্রহ্লাদের স্তবে ও কাতরতায় মুগ্ধ হইয়া আমার প্রাণগোবিন্দ ঐ সব ভীষণ কাণ্ড হইতে প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। আহা, প্রাণগোবিন্দের এই জন্য কত না কষ্ট হইয়াছে। প্রহ্লাদ প্রাণগোবিন্দের উপর নিঃস্বার্থ ভালবাসা থাকিলে। কখনও ঐরূপ কষ্ট দিত না। প্রহ্লাদ গোবিন্দতে আত্মনিবেদন করিতে পারে নাই। দরদী হলে এই কষ্ট দিত না। এ মহাপাপী, ইহাকে বধ না করিলে শান্তি পাবো না।

চতুর্থ মহাপাপী হনুমানকে বধ করিবার জন্য চতুর্থ বান রাখিয়াছি। হনুমান সকলের অপেক্ষা পাপী। আমার প্রাণনাথ

সত্য-স্রোত

শ্রীরামচন্দ্রকে বার বৎসর যুদ্ধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিবার কষ্ট মহাপাপী হনুমান দিয়াছে। হনুমান অশোক কাননে সীতাকে দেখিতে পাইয়া কাহারও কোন কথা না শুনিয়া বা কোনরূপ ভয় না করিয়া সীতাকে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট লইয়া আসিলে বার বৎসর শ্রীরামচন্দ্রের এত কষ্ট করিয়া যুদ্ধ করিতে হইত না। হনুমান তাহার অদৃষ্টে যাহা হয় হইত, গ্রাহ্য না করিয়া সীতাকে জোর করিয়া রামচন্দ্রের নিকট লইয়া আসিলে সব শান্তি হইয়া যাইত। হনুমানের রামের উপর সেরূপ ভালবাসা থাকিলে ঐরূপ করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। রামচন্দ্র বা সীতা যদি অসন্তুষ্ট হন এই ভয়ে হনুমান সীতা উদ্ধার করিয়া রামচন্দ্রের নিকট লইয়া আসে নাই। কিন্তু সেরূপ দরদী প্রেম থাকিলে নিজের ভালমন্দ চিন্তা না করিয়া সীতাকে শ্রীরামের নিকট তৎক্ষণাৎ আনিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে শান্তি দিত। রামচন্দ্রের যুদ্ধের কোন কষ্ট পাইতে প্রয়োজন হইত না। হনুমান মহাপাপী। উহাকেও বধ করিবার জন্য তপস্যা করিতেছি। এখন তুমি বুঝিতে পারিলে যে, ঐ মহাপাপীরা আমার হৃদয়নাথকে নিজের স্বার্থের জন্য, আত্মসুখের জন্য অযথা কষ্ট দিয়াছে। এইজন্য আমার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে। উহাদের ঐ কারণে বধ করিবার সঙ্কল্প করিয়া বান সম্মুখে রাখিয়া তপস্যা করিতেছি।

ইহার ভাব এই যে যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র হন, তাঁহার যাহাতে না কষ্ট হয়, যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, আনন্দে থাকেন, শান্তিতে থাকেন, তাঁহার জন্য প্রকৃত প্রেমিক ভক্ত মনে প্রাণে চেষ্টা করেন। সদা দরদী হয়ে থাকেন। নিজের দুঃখ কষ্ট, ভাল মন্দ, স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য চিন্তা করেন না। নিজের স্বার্থের জন্য, আত্মসুখের জন্য, এমন কি মুক্তির জন্যও তাঁহাকে ডাকেন না। তিনি ভাল থাকিলেই ভক্তের সুখ ও আনন্দ। তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া, আত্মনিবেদন করিয়া পরম সুখে ভক্ত অবস্থান করেন। কোনরূপ প্রার্থনা নাই—সদানন্দে থাকেন। সর্ব্ব কার্য্য অনাসক্তভাবে করিয়া যান। গোপিনীদের মত অবস্থা লাভ হয়। ভক্ত শ্রীগুরুকে ভাল বাসিয়াই সুখী, সদা তাঁর সুখে সুখী। তিনি যে বিধান করেন তাহাতেই সন্তোষ। ইহাই গোপীভাব, ইহাই রাগানুগা ধর্ম্ম। সদা দরদী ভাব। ভক্ত সদা রাগমার্গে অবস্থিত। এই ভাব-সঞ্চার হইলে উপলব্ধি হয় ও এই ভাব স্বভাবে পরিণত হয়। তখন তুমি শ্রীগুরুময় হও। আত্ম সুখ তুচ্ছ হয়। তখন পূর্ণ শরণাগতি লাভ হয়। আত্মসমর্পণ করিয়া ভক্ত সুখে নির্ভাবনায় শান্তি ও আনন্দে অবস্থান করে। সর্ব্বত্র সত্যনারায়ণ দর্শন হয়, সর্ব্বত্র তাঁহার অনুভূতি লাভ হয়। ইহাই ভাবের অঙ্গ, প্রেমের গঠন। অহং এই অবস্থায় থাকে না। সর্ব্বদা ভাবে থাকে। জীয়ন্তে মরা হয়।

প্রেমের ঠাকুর জগৎকর্ত্তা কাঙ্গাল রূপে আসিয়া এই নিগুণ প্রেম বিলাইয়াছেন। যে *কাঙ্গাল* সে এই প্রেম পাইয়াছে। তাই তাঁহার নাম হইয়াছে *কাঙ্গালের ঠাকুর।* শ্রীগুরুই সেই কাঙ্গালের ঠাকুর। ভক্ত সদা অন্তরে গুরুরূপ দর্শন করে ও নামানন্দে থাকে। যে ভক্ত সে শ্রীগুরু ছাড়া কিছু জানে না। তাঁহার পূর্ণ আত্মসমর্পণ হইয়াছে। ইহাকেই জীয়ন্তে মরা কহে। দেহ-জ্ঞানবিহীন হয়ে সে অনাসক্তভাবে সকল কার্য্য করে ও সদা যুক্ত অবস্থায় থাকে। জয়গুরু।

১১। একটী পিতৃহীন ব্রাহ্মণ পুত্র মাতার আদেশমত শৈশবকালে মাতার গুরুর নিকট বিদ্যা শিখিতে যায়। গুরুগৃহে সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতে পণ্ডিত হইয়া ২১ বৎসর বয়সে গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে আসেন। গুরু তাহাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। মাতা পুত্রের বিবাহ দেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। সে কারণ বহু স্থানে বহু ধনীর বাড়ীতে ভাগবতের পণ্ডিত হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই তাহাকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন না। বিফল মনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। মাতা দুঃখিত হইলেন। মাতা বলিলেন, "গুরুদেবের কাছে গিয়া নিবেদন কর। তাঁহার আশীর্ব্বাদে নিশ্চয় কোন স্থানে কার্য্য হবে ও অন্নের সংস্থান হবে।"

ব্রাহ্মণপুত্র গুরুদেবের নিকট গিয়া সমস্ত দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। ইহাতে গুরুদেব ব্রাহ্মণকে একটী চশমা দিয়া বলিলেন, "এই চশমা চোখে দিয়া যাহাকে দেখিবে মানুষমূর্ত্তি, তাঁহার নিকট যাইবে ও কার্য্য পাইবে। তুমি যেখানে যেখানে গিয়াছে তাহারা কেহই মানুষ নয়।" ব্রাহ্মণ পুনরায় চশমা লইয়া দূরদেশ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পরীক্ষা করিবার জন্য চশমা চোখে দিয়া দেখেন যে, সাম্‌নে যত মানুষ দেখা যাইতেছে তাহাদের মধ্যে একটীও মানুষ নয়—নানারকম পশুমূর্ত্তি। চশমা খুলিলেই দেখা যায় যে উহারা মানুষ আকৃতি। এরূপে চশমা চোখে বহু গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে একটী চর্ম্মকার ঘরে বসিয়া জুতা তৈয়ার করিতেছে। সে কিন্তু মানুষ, চশমায় দেখা গেল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া চর্ম্মকার উঠিয়া প্রণাম করিল ও বসিতে বলিল। চর্ম্মকার প্রথমেই বলিল, "ঠাকুর মশাই, আপনার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি যে আপনার খাওয়া হয় নাই।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "হাঁ, বাপু, খাওয়া হয় নাই।" তখন চর্ম্মকার ঘর হইতে একটী আধুলি আনিয়া ব্রাহ্মণকে দিয়া বলিল, "ঐ দোকান হইতে কিছু খাইয়া এখানে আসুন।" (ইহা মহাশয় ব্যক্তির লক্ষণ)। ব্রাহ্মণ জল খাইয়া চর্ম্মকারের নিকট আসিয়া নিজের সব বৃত্তান্ত বলিলেন, তবে চশমার কথা বলেন নাই। চর্ম্মকার বলিল, "ঠাকুর, দেখি আমি কি করিতে পারি। আমাদের

গ্রামের জমিদারবাবুর ভাগবতের পণ্ডিত যিনি ছিলেন তাঁহার স্বর্গ গমনের পর হইতে আর কেহ পণ্ডিত নিযুক্ত হয় নাই। আপনি উপযুক্ত লোক। আমি একবার আপনার জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিব।” চর্ম্মকার জমিদারের জন্য একজোড়া ভাল জুতা তৈয়ারী করিতেছিল। ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া চর্ম্মকার ঐ জুতা সম্পূর্ণ করিয়া জমিদারবাবুর বাড়ী রওনা হইল। চর্ম্মকার জমিদারবাবুর নিকট জুতা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জমিদারবাবু জুতা দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। চর্ম্মকাব সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণের কথা বলিল। জমিদারবাবু বলিলেন যে, ব্রাহ্মণকে লইয়া আইস। চর্ম্মকার ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিল। ব্রাহ্মণ দূর হইতে চশমা চোখে দিয়া দেখিলেন যে জমিদারবাবু মানুষমূর্ত্তি। তখন ব্রাহ্মণের সাহস হইল। জমিদার গুণগ্রাহী ছিলেন। ব্রাহ্মণের ভাগবৎ পাঠ ও অর্থ শুনিয়া জমিদাববাবু বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে ভাগবতের পণ্ডিত পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার সংসারের ভার লইলেন। চর্ম্মকার নিজেকে ধন্য মনে করিল।

গুরুকৃপায় ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ হয়। ব্রাহ্মণের মাতার গুরুর উপর অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তাই প্রার্থনা পূর্ণ হইল। সকলে আকৃতিতে হাত পা যুক্ত মানুষ কিন্তু ভিতরটা পশুবৃত্তিতে পূর্ণ। লাখে একটা প্রকৃত মানুষ দেখা যায়। রামপ্রসাদের

গানে আছে—"ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটা কাটে, হেসে দেয় মা হাত চাপুড়ি।" "জীয়ন্তে মরা হওয়া চাই" ও "ভাব স্বভাবে পরিণত করা চাহি," তবে ভাবের অঙ্গ প্রেমের গঠন হয়। মোট কথা Perfect Gentleman হলে আর কিছু করিতে হয় না। সে সদা সত্যতে অবস্থিত হয়।

১২। একবার বাগদাদ সহরে অনাবৃষ্টি হওয়ায় ফসলাদি কিছুই হয় নাই। জল শুখাইয়া গিয়াছে। সকলে হাহাকার করিতেছে। বাগদাদের সকল বৃদ্ধ ধার্ম্মিক লোকেরা পরামর্শ করিয়া সমস্ত রাত্রি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। এরূপ তিন দিন প্রার্থনা চলিল কিন্তু জল হইল না। তখন উহারা এক বিখ্যাত পীরসাহেবের নিকট গেলেন। তিনিও ঐরূপ নেমাজ পড়িলেন অর্থাৎ প্রার্থনা করিলেন কিন্তু জল হইল না। পীর সাহেব বলিলেন যে ইস্তাম্বুলে বাদ্‌শার এক বাইজী আছেন, তিনি নেমাজ পড়িলে বৃষ্টি হইবে। এই শুনিয়া সকল বৃদ্ধলোকেরা ইস্তাম্বুল সহরে গেলেন ও এত্তাল্লা (খবর) দিয়া বাদ্‌শার বাইজীর সহিত প্রায় দিন পনের পরে দেখা করিতে সক্ষম হইলেন। বাইজী অতি সুন্দরী, বয়স প্রায় ২০ বৎসর হইবে। প্রকাণ্ড প্রাসাদে থাকেন। বাহিরে খোজা পাহারা। বাইজী বেশ্যা নহে সচ্চরিত্র—বাদশাকে কেবল নাচ ও গান শোনান। তাঁহাকে

সকলে সম্মান করে। বাইজী বলিলেন, “আপনারা বৃদ্ধ লোক, অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন। বড় কষ্ট হইয়াছে। আপনারা নাচ দেখিবেন, কি গান শুনিবেন, বলুন।” এই কথা যখন হইতেছে তখন বেলা. দ্বিপ্রহর। বৃদ্ধেরা বলিলেন যে, তাঁহারা নাচ গান শুনিবেন না। তারপর দেশের অবস্থা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, “আপনি নেমাজ পড়িলে ও খোদাকে জানালে তবে বাগদাদে জল হইবে ও আমরা রক্ষা পাইব।” বাইজী শুনিয়া হাসিয়া অস্থির হইল ও বলিল যে, “আমি সামান্য বাইজী, আমি নেমাজের কি জানি? আপনারা আমায় ঠাট্টা করিবেন না।” তখন বৃদ্ধেরা পীরসাহেবের কথা বলিলেন ও পীরসাহেবের আদেশ শুনাইলেন। এই শুনিয়া বাইজী যে এত হাসিতেছিল গম্ভীর হইয়া গেল ও বলিল, “পীরসাহেবের হুকুম মানিতেই হবে। তবে আমার আর এখানে বাস হইবে না কারণ আমি প্রকাশ হইয়া গেলাম।” বাইজী বাঁদীকে নেমাজের আলখেল্লা আনিতে বলিল। আলখেল্লা আসিল বাইজী আলখেল্লা পরিল। বৃদ্ধেরা আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। বাইজী জল লইয়া উজু অর্থাৎ হাত, পা, মুখ ধুইতে লাগিল ও চক্ষু বুজিয়া ভাবে গদগদ হইল। বৃদ্ধেরা দেখিল যে আকাশে কাল মেঘ দেখা দিয়াছে। বাইজী নেমাজে অর্থাৎ ধ্যানে বসিল। ধ্যানের মধ্যে মেঘ ঘনিভূত হইয়া ইস্তাম্বুল হইতে বাগদাদ অবধি বৃষ্টি হইয়া জলে ভাসিয়া গেল। বাইজী

২।৩ ঘণ্টার পর ধ্যান হইতে উঠিল। দেখিলে বোধ হয় বাইজী যেন "দেওয়ানা"—বাহ্য জ্ঞান নাই। ক্রমশঃ সম্বিৎ পাইলেন ও বৃদ্ধদের বলিলেন যে, "আমি বেশ ছিলাম, কিন্তু মুরসিদের (গুরুর) হুকুমে আমায় এ কার্য্য করিতে হইল। প্রকাশ হইয়া পড়িলাম। সকলে বিরক্ত করিবে, আমি এ স্থান হইতে চলিলাম।" বাঁদীদের বলিলেন, "আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমরা লও। আমি গোপনে অন্যত্র চলিলাম।"

বৃদ্ধেরা বাইজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার উপর পীরসাহেবের কি করিয়া এরূপ কৃপা হইল ?" বাইজী বলিলেন, "আমি একদিন বর্ষাকালে গভীর রাত্রে বাদশার প্রাসাদ হইতে পাল্‌কী করিয়া আসিতেছি, পথিমধ্যে দেখিলাম যে, একটা কুক্কুরী ৩।৪টা বাচ্ছা প্রসব করিয়া মৃতপ্রায় হইয়া রাস্তার কাদায় পড়িয়া আছে। এই দেখিয়া আমি দয়াপরবশ হইয়া কুক্কুরীকে ও বাচ্ছা চারটীকে পাল্কীর ভিতর লইলাম ও তাহাদের সেবা করিয়া বাঁচাইলাম। আমি এইরূপ প্রায় করিয়া থাকি। পীরসাহেব এই ঘটনা দেখিয়া আমার উপর দয়া করিয়া আমাকে শিষ্যা করেন ও দীক্ষা দেন। তাঁহার কৃপায় আমি এই ক্ষমতা পাইয়াছি ও খোদা দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা শুনেন। সব গুরুর (পীরসাহেবের) দয়া, নচেৎ আমার কি ক্ষমতা ?" বাইজী জীবে দয়া করিত বলিয়াই গুরুকৃপা লাভ করিয়াছিল।

১৩। তিতির নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী আছে। সমুদ্র ধারে তিতির ও তাহার স্ত্রী তিতরাণী একটী ঝোপের ভিতর বাসা করিয়া থাকিত। তাহাদের দুটি বাচ্ছা হয়। বাচ্ছা সহ বাসায় থাকে। একদিন্ সমুদ্র স্ফীত হইয়া তীরে যে সব ঝোপ আদি ছিল তাহা সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যায়। তিতির ও তিতরাণী বাহিরে গিয়া আহার করিয়া বাচ্ছাদের জন্য আহার লইয়া বাসায় আসিয়া দেখে যে বাসা নাই, ঝোপও নাই। বড় গাছের পাখীদের নিকট সন্ধান করিয়া তাহারা জানিল যে সমুদ্র স্ফীত হইয়া ঝোপ আদি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তিতির ও তিতরাণী সমুদ্রকে তাহাদের বাচ্ছা ফিরাইয়া দিবার জন্য বলিল কিন্তু সমুদ্র কোন জবাব দিল না। উহারা অনেক কিচির মিচির করিল কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন উহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে, উহাদের বাচ্ছা ফেরৎ না দিলে সমুদ্রকে বুজাইয়া দিবে। সমুদ্র মনে মনে হাসিল। উহারা প্রত্যহ সামান্য খাওয়া দাওয়া করিয়া সমুদ্রের তীরের বালি ক্ষুদ্র ঠোঁটে করিয়া লইয়া সমুদ্রে ফেলিতে লাগিল কারণ সমুদ্র বুজাইতে হইবে। এই বালি ফেলিতে ফেলিতে উহারা মরিয়া গেল।

বাসনার সীমা নাই। বাসনা না পূর্ণ হওয়া অবধি তিতির তিতরাণী সমুদ্র ধারে জন্ম হইতে লাগিল ও সংস্কারবশতঃ সমুদ্রে

বালি ফেলিতে লাগিল। এইরূপ লক্ষ লক্ষ বৎসর জন্ম হইতে লাগিল ও সংস্কারবশতঃ বালি সমুদ্রে ফেলে। একদিন সমুদ্র দেখিল যে তাহার তলায় বালি পড়িয়া অনেকটা ভরাট হইয়াছে। তখন সমুদ্রের বিবেচনা হইল যে বাসনার সীমা নাই কিন্তু তাহার সীমা আছে। সুতরাং বহুকাল এইরূপ তিতির তিতরাণী বালি ফেলিলে সমুদ্র বুজিয়া যাইবে। তখন সমুদ্র ব্রহ্মার নিকট গিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। ব্রহ্মা বলিলেন, "বাপু, বাচ্ছা না পাওয়া অবধি পাখী ছুটি বালি ফেলিবে, ছাড়িবে না; কারণ বাসনা অসীম। আর তুমি সীমাবদ্ধ।" যাহা হউক ব্রহ্মার অনুরোধে সমুদ্র তিতির তিতরাণীকে বাচ্ছা ছুটী ফেরৎ দিল। উহাদের বাসনা পূর্ণ হওয়ায় উহারা সমুদ্রে বালি ফেলিতে নিরস্ত হইল এবং সমুদ্র রক্ষা পাইল।

এখন কথা হচ্ছে বাসনার সীমা নাই। জীবের বাসনা পূর্ণ না হওয়া অবধি জীবের জন্ম হয় ও জগতে আসা যাওয়া করে। সুতরাং নিষ্কাম বা নির্গুণ না হওয়া অবধি জীবের জগতে আসা বন্ধ হয় না। সর্ব্বদা বাসনাহীন হতে হবে। শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া বাসনাহীন হতে হবে।

১৪। একটী গরীব চাষীর অন্নের সংস্থান ছিল না। সংসারে স্ত্রী পুত্র লইয়া বিব্রত ছিল। যত সাধু সন্ন্যাসী দেখিত

তাহাদের পায়ে ধরিয়া বলিত যে, "বাবা, আমার যাহাতে অন্নের সংস্থান হয় তাহার উপায় করিয়া দাও।" এইরূপ করিতে করিতে একদিন এক সন্ন্যাসী বলিল যে, "তোমাকে বহু টাকা দিতে পারি যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে টাকা সংসারে দিয়া আসিয়া আমার কাছে আসিবে ও আমার শিষ্য হইয়া আমার সঙ্গে থাকিবে।" চাষী সম্মত হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "ঐ গাছ তলায় মাটি খুঁড়িয়া দেখ, ওখানে মোহরের কলসী পাইবে।" চাষী মাটী খুঁড়িয়া তিন চার ঘড়া মোহর পাইল। চাষী অত্যন্ত খুসী হইয়া সন্ন্যাসীর হুকুম মত মোহর সমস্ত লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল, কিন্তু সে আর সন্ন্যাসীর নিকট ফিরিয়া আসিল না।

সন্ন্যাসী তিন চার বৎসর পরে চাষীর বাড়ী আসিলেন। চাষী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "কি হে এইবার চল আমার সঙ্গে।" তাহাতে চাষী উত্তর করিল যে "ঠাকুর, আপনার মোহরে জমি জায়গা বহু কিনিয়াছি। বাড়ীও করিয়াছি। ছেলের বিবাহ দিয়াছি। এখনও ছেলেটার বুদ্ধি হয় নাই, কি করিয়া যাই বলুন। আরও দিনকতক যাক্ তারপর যাবো।" সন্ন্যাসী আচ্ছা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহার পর আবার তিন চার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর পুনরায় চাষীর নিকট আসিলেন ও তাহাকে বলিলেন "বাপু, এইবার চল।" চাষী বলিল, "কি করি বাবা, ছেলের বড় ঘরে বিবাহ দিয়াছি। বউটী ছেলেমানুষ, কিছুই দেখে না। একটু বড় হইয়া বউটী সংসারের ভার লইলেই আমি চলিয়া যাইব।" সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

আবার ৩।৪ বৎসর পরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে চাষী মরিয়া গিয়াছে। চাষীর ছেলে দোতলা বাড়ী করিয়াছে। সে সন্ন্যাসীকে বাড়ীর চারিদিক দেখাইল। সন্ন্যাসী দেখিলেন যে চারিদিকে যে সব ধান, চাল, কলাই পড়িয়া আছে তাহা লোকে একটি বলদের পিঠে বোঝাই দিতেছে ও বলদ আপনা আপনি উহা যথাস্থানে পৌছিয়া দিয়া, পুনরায় ধান চালের স্থানে গিয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ দেখিয়া সন্ন্যাসী ছেলেকে বলিলেন যে, "ভারী চমৎকার বলদ পাইয়াছ।" ছেলে বলিল, "ঐ বলদই ত সংসার রাখিয়াছে। উহার জন্য ধান চাল প্রভৃতি পড়িয়া থাকিয়া নষ্ট হইবার যো নাই।" সন্ন্যাসী ঠাকুর নির্জ্জন পাইয়া বলদের নিকট গেলেন ও বলদকে বলিলেন যে, "বাপু, এইবার ত বলদ হইয়াছ। এইবার আমার সহিত চল।" সেই চাষী মরিয়া বলদ হইয়া সংসারে চাল ডাল প্রভৃতি আগলাইতেছে। বলদ বলিল, "বাবা, কি করিয়া যাই। জমিতে এত চাল ডাল হইয়া খামারে পড়িয়া

আছে। ছেলেরা কেহই দেখে না। তাই কি করি, নিজেই বোঝাই লই ও চাল ডাল নিয়া আসি। ছেলেটার একটু বুদ্ধি হলে আপনার সহিত যাবো।” সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

আবার তিন চার বৎসর পরে সন্ন্যাসী তথায় আসিয়া দেখিলেন যে, সে বলদটি নাই। ছেলে বলিল যে, বলদটি মরিয়া যাওয়ায় বড়ই লোকসান হইতেছে। সন্ন্যাসী লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, একটী কুকুর চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধান চাল পাহারা দিতেছে। ছেলে বলিল, “চমৎকার কুকুর পাইয়াছি। এই কুকুরের জন্য চোর আসিবার যো নাই। সব সম্পত্তি এই কুকুর রক্ষা করিতেছে।” সন্ন্যাসী নির্জ্জন পাইয়া কুকুরকে বলিলেন, “কি হে বাপু, এইবার কুকুর হয়েছ। এইবার আমার সঙ্গে চল। আর মায়ায় বদ্ধ হইয়া থাকিও না।” চাষী এইবার কুকুর হইয়া সম্পত্তি পাহারা দিতেছে। সে বলিল, “কি করিয়া যাই। আমি গেলে সম্পত্তি থাকিবে না। বড় কষ্ট করিয়া এই সম্পত্তি করিয়াছি। আমার যাওয়া এখন হবে না।” এই শুনিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

আবার পাঁচ সাত বৎসর পর সন্ন্যাসী তথায় আসিলেন। এবার ছেলে বড় লোক হইয়া দরোয়ান রাখিয়াছে। তোষাখানা

করিয়াছে। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বলিল, "আপনি উপর তলায় গিয়া তোষাখানা দেখুন। কত জহরতের জিনিষ তোষাখানায় আছে।" সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কুকুরটী কোথায় গেল?" ছেলে বলিল, "আহা, বড় ভাল কুকুর ছিল, এখন মরিয়া গিয়াছে। সে সমস্ত দিন রাত্রি তোষাখানা পাহারা দিত।" সন্ন্যাসী ঠাকুর তোষাখানায় গিয়া দেখিলেন যে তোষাখানার তালা খোলা। তালা দিতে ছেলের বউ ভুলিয়া গিয়াছে। তোষাখানায় ঢুকিয়া দেখেন, এক কোণে এক বৃহৎ জাত সাপ চক্র ধরিয়া বসিয়া আছে। সেই চাষী সর্প হইয়া তোষাখানায় পাহারা দিতেছে। সন্ন্যাসী বলিলেন, "বাপু, এইবার সাপ হইয়াছ। যাহা হউক এইবার চল।" সাপ বলিল, "আর যাওয়া হবে না। আমি চলে গেলে তোষাখানা লুট হইয়া যাইবে। তোষাখানায় তালা অবধি দেয় না। আমার থাকা ছাড়া উপায় নাই।" সাপ বায়ুভূক। বহুকাল বাঁচিবে। সে কারণ উহার সর্পজন্ম উদ্ধার করিবার জন্য সন্ন্যাসী ঠাকুর চীৎকার করিয়া লোক ডাকিলেন ও বলিলেন যে, তোষাখানার ভিতর প্রকাণ্ড জাত সাপ রহিয়াছে। দ্বারবানেরা লাঠী হাতে আসিয়া বহু কষ্টে ঐ সাপটিকে মারিল। সন্ন্যাসী ঠাকুর চাষীর এই উপকার করিয়া চলিয়া গেলেন।

কথা হচ্ছে লোকের বিষয়-বাসনা না কমিয়া ক্রমশঃ বাসনা

বাড়িয়াই যায়। ইহার উপায় অনাসক্তভাবে সংসার করা। আসক্তি থাকিলে পুনঃপুনঃ জন্ম হয়। সদ্‌গুরু লাভ হইলে শ্রীগুরু কৃপায় গুরুতে স্থিত হইয়া জীব নিষ্কাম হইয়া ভবসাগর পার হয়।

১৫। যত্র জীব তত্র শিব। ভগবান নিজে না আসিয়া মনুষ্যের ভিতর দিয়া কার্য্য করেন। এক পিতৃহীন বালকের অবস্থা খারাপ থাকায় স্কুলের বেতন দিতে পারিত না; সেজন্য মাষ্টার তাহাকে স্কুলে আসিতে বারণ করিয়াছিলেন। সে মাকে আসিয়া বলিল, "সকলের পিতা আছে, কিন্তু আমার পিতা কোথায় থাকেন? পিতাকে স্কুলের বেতন দিবার জন্য পত্র দিব।" এই শুনিয়া মা বলিলেন, "তোমার পিতা স্বর্গে থাকেন। তাঁহার নাম পরমেশ্বর।" তখন বালক পিতাকে বেতন পাঠাইবার জন্য একটী পত্র লিখিল ও ঠিকানা লিখিল, "পরমেশ্বর—স্বর্গ।" ডাক্‌ঘরের ডাক্‌বাক্সে পত্র ফেলিতে গেল, কিন্তু ডাকবাক্স উচ্চে থাকায় পত্র ফেলিতে পারিতেছে না দেখিয়া এক ভদ্রলোক বলিলেন, "বালক, আমায় পত্র দাও, আমি বাক্সে ফেলিয়া দিতেছি।" ভদ্রলোক পত্র লইয়া দেখেন যে, শিরোনামায় "পরমেশ্বর—স্বর্গ" লেখা রহিয়াছে। ভদ্রলোক বলিলেন, "পরমেশ্বর তোমার কে হয়?" বালক সব কথা বলিয়া বলিল যে পরমেশ্বর তাহার পিতা হয়। ভদ্রলোক সহৃদয় ছিলেন, বলিলেন যে,

পরমেশ্বর তাঁহার নিকট বন্ধু। তিনি স্বহস্তে এই পত্র পরমেশ্বরকে দিবেন এবং আগামীকল্য হইতে নিয়মমত স্কুলের বেতন পাঠাইবে। বালক সেই হইতে বেতন মাসে মাসে পাইতে লাগিল। মা সব শুনিলেন ও ভগবানকে প্রণাম করিলেন। এইরূপ সরল বিশ্বাস থাকিলে ভগবান তাঁহার প্রতীক মনুষ্যের ভিতর দিয়া কাঙ্গাল, গরীব, আতুরকে সাহায্য করেন—নচেৎ সৃষ্টি থাকিত না।

১৬। একদা গোলোকে ভগবান নিজ পার্ষদগণ সহ বসিয়া আছেন। তথায় নিগুর্ণ পার্ষদগণ ভগবান সন্নিধানে পরামানন্দ ভোগ করিতেছেন। ভক্তগণ মধ্যে একজনের অন্তরে পার্থিব বাসনা প্রবেশ করিয়াছে ভগবান জানিতে পারিয়া উক্ত পার্ষদকে বলিলেন, "তুমি মনে মনে পার্থিব বাসনা পোষণ করিতেছ, অতএব তুমি এখানে থাকিবার উপযুক্ত নও। উক্ত গুণবুদ্ধি যতক্ষণ না তোমার ত্যাগ হয় ততক্ষণ তুমি পৃথিবীতে গিয়া বাসনা ভোগ কর।" এই আদেশ পাইবামাত্র উক্ত পার্ষদ স্বর্গচ্যুত হইল। কিন্তু স্বর্গচ্যুত হইবার পূর্ব্বে সে অনুতপ্ত হইয়া প্রবীণ দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করিল যে, আবার কবে সে গোলোকে আসিতে পারিবে। তাহাতে দেবদূত উত্তর করিল, "যখন তুমি পৃথিবী হইতে কোন *নিকৃষ্ট বস্তু* আনিতে পারিবে সেই দিন গোলোকে প্রবেশের অধিকার পাইবে।"

মহাপ্রাণ সাধক
শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়
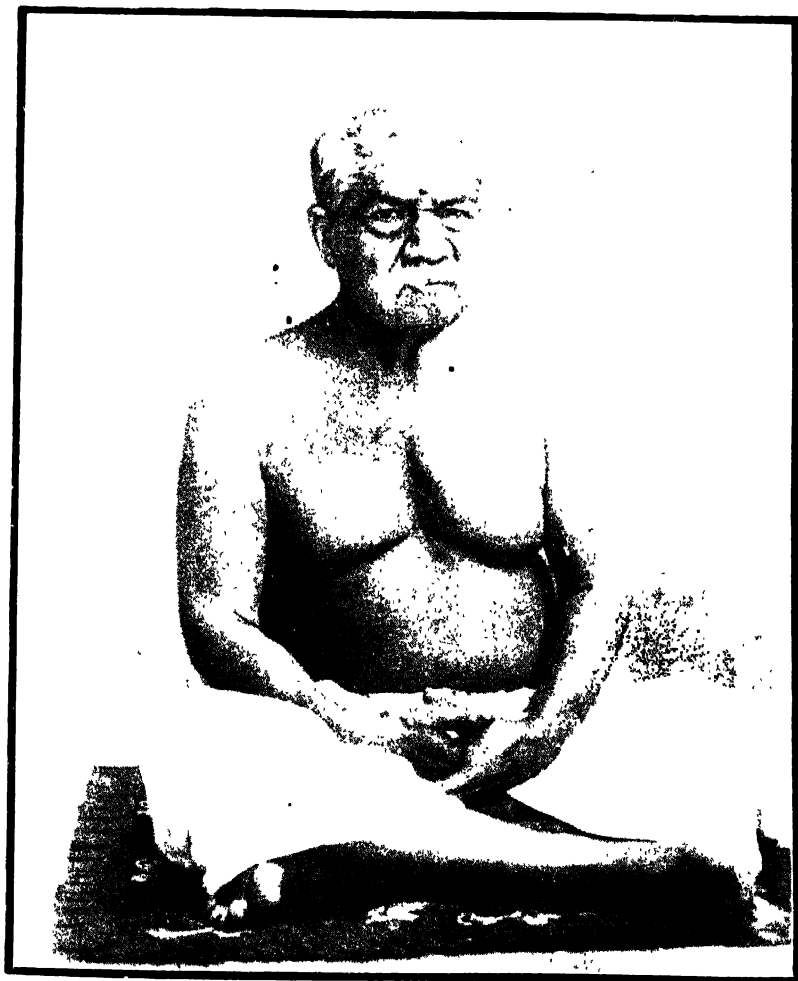
উক্ত পার্ষদ পৃথিবীতে নীত হইয়া গোলোকে শীঘ্র যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া নিকৃষ্ট বস্তুর সন্ধানে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যতপ্রকার অসৎ বস্তু আছে অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতা, শঠের শঠতা, চোরের চৌর্য্যবৃত্তি, ক্রোধীর ক্রোধ, হিংস্রকের হিংসা, নিষ্ঠুরের নিষ্ঠুরতা, বেশ্যার বেশ্যাত্ব, হত্যাকারীর হত্যাবৃত্তি, অহঙ্কারীর অহং প্রবৃত্তি ইত্যাদি যাবতীয় নিকৃষ্ট বস্তু একে একে গোলোকের দ্বারে লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু দেবদূত প্রতিবারই বলিলেন যে, উক্ত সামগ্রী একেবারে নিকৃষ্ট বস্তু নহে। তখন ইহা শুনিয়া স্বর্গভ্রষ্ট পার্ষদ হতাশ হইয়া ভাবিল যে, ঐ সব বস্তু ব্যতীত আর কি নিকৃষ্ট বস্তু হইতে পারে। এমতে তাহার আর স্বর্গে যাইবার উপায় নাই। মহাদুঃখিত চিত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ এক স্থানে অর্থাৎ ধাপার মাঠে পচা বিষ্ঠার স্তূপ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ভাবিল যে, ইহাও একটী নিকৃষ্ট বস্তু, কারণ ইহা অতি দুর্গন্ধময়—ইহার জন্য মানুষ এমনকি পশু পক্ষীও নিকটে যায় না। ইহার খানিকটা লইয়া স্বর্গে যাওয়া যাক্, দেখা যাক্ কি হয়। এই ভাবিয়া গামছায় খানিকটা উক্ত পচা দুর্গন্ধময় বিষ্ঠা বাঁধিয়া লইয়া উক্ত পার্ষদ গোলোকে রওনা হইল।

পথে যাইতে যাইতে সকলে বলে যে ভাই, উহা কি

দুর্গন্ধময় অতি বদ্ বস্তু লইয়া যাইতেছ? পার্ষদ বলে যে, ভাই, উহা একটি নিকৃষ্ট বস্তু, উহা বিষ্ঠা। সকলে ইহা শুনিয়া বলে, আরে ছি ছি, উহা ফেলিয়া দাও। এইরূপ ক্রমশঃ যাইতে যাইতে পার্ষদ স্বর্গে যাইবার জন্য হিমালয়ে আসিয়া পৌছিল। হিমালয়ে নির্জ্জন প্রদেশ দিয়া যাইবাব সময় যখন কেহ নাই, তখন বিষ্ঠা উক্ত পার্ষদকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমায় বরাবর সকলের নিকট পরিচয় দিতেছ যে আমি অতি নিকৃষ্ট বস্তু। ইহার কারণ কি বল দেখি? তুমি গোলোকে থাকিতে, সুতরাং সবই ত জান। বল দেখি, আমি কে ছিলাম? দেখ, আমি অতি পবিত্র জিনিষ ছিলাম, যাহা হইতে নারায়ণের ভোগ হইত। আমি ক্ষীর, ছানা, ননী, উৎকৃষ্ট সন্দেশ, উৎকৃষ্ট ফল আদি ছিলাম যাহা দ্বারা নারায়ণের ভোগ হইত। তবে আমি কিসে নিকৃষ্ট হইলাম? কেবল তোমার সংস্পর্শে আসিয়া, বিষ্ঠায় পরিণত হইয়া নিকৃষ্ট হইলাম। নচেৎ আমি নিকৃষ্ট কিসে? তবে ভেবে দেখ, আমি নিকৃষ্ট না তুমি নিকৃষ্ট?" তখন স্বর্গচ্যুত পার্ষদের জ্ঞান হইল। সে বিষ্ঠাপ্রভুর নিকট ক্ষমা চাহিয়া উহা গামছা সহ ত্যাগ করিয়া রিক্তহস্তে স্বর্গে রওনা হইল। স্বর্গদ্বারে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রধান দেবদূত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পৃথিবী হইতে এবার কি আনিয়াছ?" পার্ষদ কহিল, "আমি এবার নিজেকেই লইয়া

আসিয়াছি। আমার অপেক্ষা নিকৃষ্ট কেহ নাই। ইহা আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।” ইহা শুনিবামাত্র স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গেল ও বিষ্ণুর পার্ষদ বিষ্ণুর পার্শ্বে স্থান পাইল।

এই সুন্দর উদাহরণে বুঝা যায় যে জীবের অহং ত্যাগ না হইলে শ্রীগুরুর হইতে পারে না। নিজেকে তাঁহার দাসানুদাস মনে ভাবিতে হইবে। সেইজন্য বলে “তদ্ দাস দাস দাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভু।” “তৃণাদপি সুনীচেন” হওয়া চাহি।

১৭। আর একটী ঐরূপ উদাহরণ দিব। অনুতপ্ত হইলেই জীব বলে যে, *প্রভু, অপরাধ মার্জ্জনা কর।* প্রভু এত দয়াময় যে অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া চরণে স্থান দেন।

গোলোকে এক দেবদূতের অন্তরে পার্থিব ভোগ বাসনা উদয় হওয়ায় ভগবান উহাকে পৃথিবীতে গিয়া উক্ত বাসনা সকল ভোগ করিতে আদেশ করেন। তাহাতে সে কবে পুনরায় আসিতে পারিবে জিজ্ঞাসা করায় আদেশ পাইল যে, যবে কোন উৎকৃষ্ট বস্তু পৃথিবী হইতে লইয়া আসিতে পারিবে তখন স্বর্গে স্থান পাইবে। উক্ত স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূত পৃথিবীতে আসিয়াই উৎকৃষ্ট বস্তুর সন্ধানে চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া যত সব উৎকৃষ্ট

বস্তু অর্থাৎ যোগীর সাধনা, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মভাব, সতীর সতীত্ব, জননীর স্নেহ, শিশুর হাসি, প্রেমিকের প্রেম, যোদ্ধার শৌর্য্য, সুন্দরের সৌন্দর্য্য, ন্যায়পরায়ণের ন্যায়পরতা, সত্যবাদীর সত্যবাদীতা ইত্যাদি যাবতীয় উৎকৃষ্ট বস্তু একে একে লইয়া স্বর্গদ্বারে বহুবার উপস্থিত হইল। কিন্তু প্রধান দেবদূত বলিল যে, উহার মধ্যে একটিও উৎকৃষ্ট বস্তু নাই। তখন স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূত নিরাশ হইয়া পৃথিবীতে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং ভাবিল যে স্বর্গে যাইবার আর উপায় নাই। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে একস্থানে দেখে যে একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছে। তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল যে, সে বেশ্যা—অতি নারকী। এজন্য তাহার অত্যন্ত অনুতাপ হইয়াছে; সেইজন্য তাহার কি উপায় হইবে ভাবিয়া কাঁদিতেছে। দেবদূত দেখিয়া ভাবিল যে ইহা ত একটা ভাল দ্রব্য। এই ভাবিয়া অনুতাপের অশ্রুজল লইয়া স্বর্গদ্বারে কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইল ও বলিল যে, সে এবার অনুতপ্ত হইয়া অনুতাপের অশ্রুজল লইয়া আসিয়াছে। ইহা বলিবামাত্র স্বর্গদ্বার খুলিয়া গেল ও ভগবানের পদতলে স্থান পাইল।

সেইজন্য বলিতেছি যে, আমরা নিত্য অপরাধী জীব—সদা *"অপরাধ মার্জ্জনা কর, প্রভু"* বলিতে হয়। তাঁকে ভুলিলেই

জীব জগতে নীত হয়। শ্রীগুরু স্মরণ না করিলেই অপরাধ হয়। নামে রুচি চাহি। সদা নামানন্দে থাকা চাহি। প্রকৃতি ত্যাগ করিয়া জীবন্তে মরা হইলে শ্রীগুরুপদে বসতি হয়।

আসল কথা হচ্ছে শ্রীগুরুতে শিষ্যের অবিচলিত ভক্তি বা ভালবাসা ও দৃঢ়বিশ্বাস থাকা চাহি। ঐরূপ হইলে উক্ত ভাব স্বভাবে পরিণত হয়। শ্রীগুরুতে মনুষ্য জ্ঞান থাকিবে না। শ্রীভগবানই দয়া করিয়া জীব উদ্ধার করিবার জন্য ও লীলার জন্য শ্রীগুরুরূপে জগতে আসেন ও নিত্য পার্ষদের সহিত গুরু-শিষ্যরূপে লীলা করেন। শিষ্য ভয়, ভক্তি, সেবা, বিশ্বাস ও আনুকুল্য এই পঞ্চ আজ্ঞা ও পঞ্চ নিষেধ যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি নির্ব্বিকার হইয়া প্রতিপালন করিয়া শ্রীগুরুর হয় এবং এইরূপে জীবন্তে মরা হইলে শ্রীগুরুও তাঁহার হন ও উভয়ে একাঙ্গী হইয়া আনন্দে ভাসমান হয়। ইহা ভাবের ভাবী যে হয় সেই বুঝিবে। পূর্ণ প্রেমের সঞ্চার হলে তবে ভাব উপলব্ধি হয়। সংস্কার-বিহীন হইয়া ভক্ত সদা ভাবে ডুবিয়া থাকে। নামরূপ সদা স্মরণ, মনন ও নিরীক্ষণ করিতে হয়। বহির্ভাগে ব্যবহারিক হিসাবে কার্য্য করিবে এইরূপ অবস্থা হইলে শ্রীগুরু-ভগবানে জীবের বসতি হয়। জয় গুরু! জয় দয়াময়!

গুপ্তবাণী

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভাই ও দরদী বন্ধু শ্রীযুক্ত ৺ক্ষীরোদ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আমাকে ও আমার শ্রদ্ধেয় গুরুভাই শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়কে যে সকল পত্র লিখিতেন তাহা গভীর ভাবে পরিপূর্ণ। পড়িলে মনে হয় যেন তাঁহার বাণীগুলি জীবন্ত হইয়া কথা কহিতেছে। আমি তাঁহার পত্রের সেই গভীর ভাবপূর্ণ অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা করি ভক্তেরা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিবেন।

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়কে যে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার ভাবপূর্ণ অংশগুলি নিম্নে দিলাম :—

১। বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদ হইতে অবসর লইবার পর এই পত্র লেখেন।

জয় গুরুজীর জয়!

ভাই গোষ্ঠ,

তোমার সহানুভূতিপূর্ণ চিঠিখানা পড়ে বড়ই আনন্দ পাইলাম। দরদী না হ'লে দরদ আর কে করবে। ...শুনেছিলাম

টেঁকিতে কুটবে,

কুলোতে ঝাড়বে,

হাতে রগড়াবে,
তারপর উড়িয়ে দিবে।
তবু বলিতে হবে, শুধু তোমারি, শুধু তোমারি।
জীবনে তোমারি, মরণে তোমারি,
সম্পদে তোমারি, বিপদে তোমারি।

•

যাক্ ভাই আরো শুনেছিলাম—
সাপ হ'য়ে কাটি আমি রোজা হ'য়ে ঝাড়ি।
হাকিম হ'য়ে হুকুম দেই প্যায়দা হ'য়ে মারি॥

আশীর্ব্বাদ করো ভাই, এই সব বাণী যেন বিস্মৃত না হই। এখন পর্য্যন্ত কর্ত্তার দানেই চল্‌ছে। বাকি জীবন যেন কর্ত্তার অন্নই খেয়ে যেতে পারি। সাংসারিক আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের কাছে যেন মাথা হেঁট না করতে হয়। প্রতি গ্রাস অন্ন যেন তাঁর প্রসাদই খেয়ে যেতে পারি। যে অন্নে তাঁর নাম লিখা নেই সে অন্ন যেন মুখে না দিতে হয়। .... ছেলে উপযুক্ত হ'য়েছে। সাহায্য করতে চেয়েছিল। মানা করেছি। যতদিন স্বোপার্জ্জিত ধন হাতে আছে ততক্ষণ কারু কাছে কিছু নেবো না। তুমি গুরুভাই—তোমার কাছে মন খুলে বলি। এ সব কথা অন্যের অশ্রাব্য। বসে বসে গাই:—

বেদনা যদি দেওগো প্রভু শকতি দিও সহিতে।
হৃদয় আমার যোগ্য করগো তোমার বাণী কহিতে॥

তোমার গুরুভাই।”

২। প্রিয় বন্ধুবর গোষ্ঠ,

চিঠিখানা পেয়ে খুবই খুশী হলেম। আপদে পড়েছিলে—গুরু কৃপায় তা দূর হয়েছে শুনে নিশ্চিন্ত হইলাম। এ সব যমরাজের বিজ্ঞাপন। শ্রীগুরুদেবের মুখে Bibleএর একটা কথা প্রায় শুন্‌তাম। তুমিও শুনে থাক্‌বে—

Oh Death! Where is thy sting?
Oh Grave! Where is thy victory?

গানটী অবশ্যই মনে আছে ঃ—

“কি ভয় মরণে আমাব যদি তুমি সঙ্গে রও।
চাহিলে দেখি তোমায় জিজ্ঞাসিলে কথা কও॥”

দেহ ছাড়বার পূর্ব্বে তিনি যে “চির সাথী” এই উপলব্ধিটা যেন হয়, তাঁর চরণে অধমের এই প্রার্থনা।

জয় গুরুজীর জয়! গাও গুরুজীর জয়!
শোকের হোক্ ক্ষয়, মৃত্যুর হোক লয়!

গাও গুরুজীর জয়!
নাহি শোক নাহি ভয়!

আশা করি আমাদের গুরুভগিনীটি সুস্থই আছেন এবং তাঁর সাধন ভজন ভালই চল্‌ছে। তাঁহাকে এ বাড়ীর ভগ্নীদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইও।

তোমার সতীর্থ।

৩। ভাই গোষ্ঠ,

তোমার দরদপূর্ণ চিঠিখানি প'ড়ে পরমানন্দ লাভ করলাম। "মন্ত্রের স্বরূপ হন অখিলের পতি, সেই মন্ত্র সিদ্ধ হলে এক ধাম প্রাপ্তি।" —এই ত গুরুমুখে শোনা। .... একবার সাধন পথ নিয়া একটী শিষ্যের সঙ্গে গুরুদেবের মতভেদ হয়। এক বৎসর সে আর আসে না। তারপর আবার আস্‌লে পর শ্রীগুরুদেব তাকে বলেছিলেন, "তিনি কাউকে ছাড়েন না। যার কানে শ্রীনাম গিয়াছে তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি নেই। কারণ সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদীর প্রণয় এরূপই হয়। মানুষ মিথ্যাবাদী—চঞ্চল মতি—এ ত জানা কথা। কিন্তু সত্যস্বরূপ যাকে একবার গ্রহণ করেছেন তার ত আর মিথ্যা হবে না—হতে পারে না।"—এই মর্ম্মে তাকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। ......যে সংসারে দুটী লোক আকৃতিতে এক নয় সেইরূপ

প্রকৃতিতেও এক নয়। বিচিত্রতাই সংসারের স্বরূপ। পার্থক্য সত্ত্বেও ভালবাসতে হবে সবকে এই ত হ'ল আদেশ, এই হ'ল সাধনা। আশীর্ব্বাদ কর ভাই, শত্রু-মিত্র, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, সাধু-অসাধু, সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন করে ব্রহ্মের ন্যায় সাম্যভাব লাভ করে যেতে পারি।

ভবদীয়।

৪। সুহৃদবরেষু, ভাই গোষ্ঠ,

তোমার চিঠি পাইলাম।............দয়া করে এসে তুমি ও হারাধন ভায়া সঙ্গ দান করে যাবে। অসুবিধা না হ'লে আগামী রবিবার এলেই সুখী হব। "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা" —শ্রীগুরুদেবের এই বাণী কানে সর্ব্বদাই ধ্বনিত হচ্ছে। দুঃখের বিষয় তাঁর উপদেশমত সাধু সঙ্গে সর্ব্বদা শ্রীনাম "শ্রবণ, কীর্ত্তন, ও স্মরণ" করে যেতে পাইলাম না। তাই বলি ভাই, এসো— সঙ্গ দান করে আমাকে পবিত্র করে যেও। তোমার পত্রের আশায় রহিলাম। প্রাণভরা প্রীতি নিও।

তোমাদের অকিঞ্চন।

৫। সুহৃদবরেষু, ভাই গোষ্ঠ,

আগামী সোমবার শিবচতুর্দ্দশীতে আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মদিন। জীবত্বের মধ্যে শিবত্ব ফুটাইবার পথ

এই মূর্ত্ত শিবের নিকটই আমরা পেয়েছি। তাঁহার জন্ম দিনে হারাধন ভায়াকে নিয়ে সন্ধ্যায় "নবীন আশ্রমে" এলে পরমানন্দিত হবো। আশা করি বাসনা পূর্ণ করিবে।

তোমাদের প্রীতিমুগ্ধ।

৬। ভাই দরদী, গোষ্ঠ,

অনেকদিন দেখা নাই। এ স্বার্থপর সংসারে কেবলই স্বার্থেরই কথা। প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। তাঁর কথা কেউ বলে না—শোনেও না। তাই কদিন পর পর তোমাদিগকে দেখবার জন্য প্রাণটা আকুল হয়। আগামী রবিবার হারাধন ভায়াকে নিয়ে এলে আনন্দ হবে। সুবিধা হবে কিনা এক ছত্র লিখে জানিও। আর কি বল্‌বো ভাই,

"সে মানুষ কোথায় মিলে?
যার নাইকো রোষ, সদা সন্তোষ,
মুখে গুরু গুরু বলে॥"

মানুষ দেখবার জন্য প্রাণ হা হা করছে। দেখা দিও। প্রীতি সম্ভাষণ জেনো।

তোমাদের।

আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি পত্রের ভাবপূর্ণ অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা"

৭। সুহৃদবর,

চিঠি পেয়ে সমাচার অবগত হইলাম। ……ভাই, কিসে কল্যাণ হয় কিসে অকল্যাণ তা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের বুঝে উঠা কঠিন। তাই পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব এ সব বিষয়ে প্রায়ই বলতেন "তাঁর মর্জ্জি" যা হয় তাই হোক। বৃদ্ধ বয়সে ভেবে চিন্তে দেখছি শ্রীগুরুবাক্যই সত্য। জরা, মরণ, রোগ, শোক এ ত মানব মাত্রেরই নিত্য সাথী। এসব আপদ আছে বলেই লোক ধর্ম্মপথে আসে। আবার এরা যে সাধনার বিঘ্ন এটাও অস্বীকার করা যায় না। কাজেই আপদে বিপদে পড়লে বিপদভঞ্জনের পায়ে কাঁদতে হবে একথাও শ্রীগুরু বলে গেছেন। এখন কথা হচ্ছে, প্রার্থনা করবো কিসের জন্য? আপদ আমার কাছে না আসুক, এটা প্রার্থনীয় হতে পারে না। কারণ ঈশা, মুশা, পীর, পয়গম্বর কেউ ত জরা, মরণ, শোক, তাপ একেবারে এড়াইতে পারে নাই। তবে প্রার্থনা করবো কিসের জন্য? যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় এ সব আপদ যেন চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট না করতে পারে এরূপ শক্তি

পাবার জন্যই শ্রীগুরুর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। বিছা সংসারে থাক্‌বেই। মাঝে মাঝে বিছার কামড় খেতেও হবে। তবে কামড়ে যেন জ্বালা না হয়, সেই জন্যই বৈদ্যের কাছে যাওয়া। সেইরূপ যতদিন দেহ থাকে, রোগ শোক জরা ব্যাধি এ সব আপদ থাক্‌বেই! তবে তারা যেন চিত্তের শান্তি নষ্ট ক'রে সাধনার বিঘ্ন না করে, সেই জন্যই শ্রীগুরুর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। তাঁর কৃপায় বেদনা যেন হয় সাধনা—আপদ যেন হয় সম্পদ। —এই হবে আমাদের প্রার্থনা। আমাদের প্রেমভক্তির পথ। আপদেই প্রেমের পরীক্ষা। শ্রীগুরুকৃপায় এই তত্ত্ব হৃদয়ে সঞ্চারিত হ'লেই আপদের শান্তি। আপদ হতে উদ্ধার হবার অন্য পথ নাই। আপদে, বিপদে, সম্পদে, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র গাইতে হবেঃ—

"যাবত দেহে প্রাণ রবে আমি তোমারি, আমি তোমারি।
রাখ তোমারি, মার তোমারি—তবু তোমারি, শুধু তোমারি॥
বিপদে তোমারি, সম্পদে তোমারি,
জীবনে তোমারি, মরণে তোমারি, শুধু তোমারি॥"

তবে প্রেমের সিদ্ধি।

গীতায় আছে "মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম্‌" অর্থাৎ আমার ভক্তেরা পরস্পরের নিকট আমার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ পাবে।

শ্রীগুরুদেব বলতেন,

"সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
না করিও অন্য অভিলাষ।"

শ্রীগুরুবাক্য যা বুঝেছি তা শাস্ত্র ও সাধুদের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই নিশ্চিন্ত। তাই আপনাদের মত সাধুর কাছে সাধনার কথা না বল্লে মনে তৃপ্তি পাই না। আপনাদের সায় পেলে মনে কত জোর ও আনন্দ পাই তা বলা যায় না। আশা করি, আপদ সম্বন্ধে যা বলিলাম তা আপনার অনুভূতি সমর্থন কর্‌বে। সকলের কাছে সকল কথা বলা যায় না। সকলের সাধনা এক অবস্থার নয়। প্রবর্ত্ত সাধকসকল নানা জন নানা স্তরে থাকে। তাই অধিকারী ভেদে ভাবের আদান প্রদান। আপনাকে আমি উচ্চাধিকারী মনে করি। তাই শ্রীনামের একটী পদ নিয়া মনের ভাব কিছু ব্যক্ত করিলাম। অধিক লিখিবার নেই। আশা করি সকল কুশল। প্রাণভরা ভালবাসা জান্‌বেন। আগামী মাসে আবার দর্শন পাবো এই আশায় রহিলাম।

আপনাদের প্রীতিমুগ্ধ।

৮। জয় গুরুজীর জয়,
নাহি শোক নাহি ভয়।

সুহৃদবর,

আপনার চিঠিতে আপনার বিরহের অবস্থার আভাষ পেয়ে প্রাণে পরমানন্দ লাভ করিলাম। শ্রীগুরুর কাছে প্রার্থনা করি এই ভাবটি স্থায়ী হ'য়ে থাক্। এ ধর্ম্মের যা একটু বুঝেছি তাতে মনে হয় এইটাই সাধনের শেষ অবস্থা। অবশ্যই এটা স্থায়ী হওয়া চাই। পূজ্যপাদ গাঙ্গুলী মহাশয় এ অবস্থার কথাই বল্‌তেন, "গোপীদের মত না হলে হয় না।" পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবের মুখেও একটী গান শুনেছি,

"আমি ঝাঁপ দিলাম সুধাসিন্ধু হেরি,
এখন বিষের জ্বালায় জ্বলে মরি।"

অনন্ত দেবতার সঙ্গে কারবার। এত সহজে তৃপ্ত হবার নয়। অনন্তের ক্ষুধাও যে অনন্ত। তাই পাওয়ার সঙ্গে একটা না পাওয়া ভাব থাক্‌বেই—বিরহে মিলন আবার মিলনে বিরহ—এই অবস্থাই বাতুলের বা বাউলের বা ক্ষ্যাপার ভাব। তাই প্রার্থনা করি, ভাবটা স্থায়ী হোক্। সাংসারিক ভাব এসে যেন এই মধুর ভাবটী মলিন না করে দেয়। শ্রীগুরু কৃপাহি কেবলম্।

আপনার প্রীতিমুগ্ধ।

৯। জয় গুরুজীর জয়

প্রিয় বন্ধুবর,

২।১ দিন যাবৎ ভাব্‌ছিলাম চিঠি লিখি। আজ চিঠিখানা পেয়ে বড়ই আনন্দ পাইলাম। প্রথম কথা আপনি সুস্থ হয়েছেন। তারপর চিঠিখানার ভাব বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর লাগিল। আপনি গুরুগত প্রাণ, গুরুভক্তির কথা শুনে আনন্দ পাইয়াছেন। আমরা সেই সব কথায় খুবই তৃপ্তি পাইলাম। ভাই কি বল্‌বো, আজকাল গ্রামে গ্রামে অবতার—সহরে সহরে নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, নূতন নূতন গুরুর আবির্ভাবের কথা শুনে থাকি। কারু নামের পূর্ব্বে ১০৮, কারু নামের পূর্ব্বে ১০০৮টা শ্রী। কারু নামের পর স্বামীজী, কারু নামের পর আনন্দ। কত রকমারী ব্যাপার। কেউ অবলানন্দ, কেউ কারণানন্দ, কেউ প্রতিষ্ঠানন্দ—আনন্দের ছড়াছড়ি।

কিন্তু পূজ্যপাদ মুখুয্যে মহাশয়, পূজ্যপাদ রায় মহাশয়ের কিম্বা পূজ্যপাদ গাঙ্গুলী মহাশয়ের মত নির্গুণ, নিরাভিমানী, নিরাশী, নির্ম্মম নিরহংকারী মহাপুরুষের দেখা ত এ সংসারে মিলে না। বক্তৃতা নাই, মঠ নাই, শাস্ত্র ব্যাখ্যা নাই, গুণকর্ম্মের লেশ মাত্র নেই। অহং বুদ্ধি একেবারে লোপ। কর্ত্তা ভিন্ন “আমার” বল্‌তে এ জগতে আর কিছু ছিল না। দয়াময়ের দয়া স্মরণ ভিন্ন অন্য কিছু করবার ছিল না। হায়! হায়! এমন গুরুর

আশ্রয় পেয়েও তাদের গুরুত্ব বুঝ্‌লাম না। নির্গুণ শুদ্ধাভক্তির কথা আর কোথাও শুনি না। তাই কোন স্বামীজী বা আনন্দের দলে যাই না। আপন মনে অকিঞ্চণ গুরুদেবের কথা ভাবি। জয় গুরু। "গুরু যে চিনেছে সে মজেছে, সে কভু জীয়ন্ত নয়। গুরু চেনা সহজ নয়।"

প্রীতিমুগ্ধ।

১০। প্রিয়বরেষু,

চিঠি পেয়ে কিছু নিশ্চিন্ত হইলাম।......সাধুরা বলে থাকেন যাদের কর্ম্ম প্রায় শেষ হয়ে আসে, দেহের রোগ দিয়া শ্রীগুরু তাদের কর্ম্মফল একেবারে নিঃশেষ করিয়া নেন। তাই পরমহংসদেবেরও শেষটায় Cancer রোগে জীবনলীলা শেষ করতে হয়। যাক্, এ সব রহস্য যার জানবার তিনিই জানেন। আমরা রোগে শোকে, সুখে দুঃখে, লাভে ক্ষতিতে "গুরুর জয়" দিয়া যেন যেতে পারি, তাঁর চরণে এই ভিক্ষা। নীরবে বেদনা সহ্য করাই সাধনা। রবীবাবুর একটী গান আছে, "দুখের বেশে এলে বলে, ভয় করি কি হরি?" গুরুমুখে শুনেছি "সাপ হয়ে কাটি আমি, রোজা হয়ে ঝাড়ি।" তিনিই সাপ তিনিই রোজা। সত্য-সত্য, সত্য একমদ্বিতীয়ম্। একজন ছাড়া দুই কর্ত্তা এ সংসারে নেই।

আপনার।

১১। প্রিয় বন্ধুবরেষু,

ক্রমশঃ সুস্থ হচ্ছেন জেনে পরমানন্দ লাভ করিলাম। ৺ঠাকুর জীবনের আবার নূতন Lease দিলেন। কাজেই আর সময়ের অপব্যবহার করা হবে না। বাকি দিনগুলিতে শ্রীগুরুর কথা শুন্‌তে হবে আর বল্‌তে হবে। কানে আর কিছু শুনবো না, মুখে আর কথা বল্‌বো না। তাঁর জন ছাড়া আর কারু সঙ্গ করবো না।

"জ্যান্তে মরিয়ে যে জন ভজে,
সেই সে ভকত শূর।"

পূজ্যপাদ গাঙ্গুলী মহাশয়ের ঋণ এখনও শোধ হয় নাই। প্রাণ ভরে সেবা করে ঋণ শোধ করে যেন যেতে পারেন, ঠাকুরের চরণে আমাদের এই প্রার্থনা। জানি এ ঋণ অপরিশোধনীয়— A debt of endless obligation, তবু চেষ্টা করতে হবে। সাধন রাজ্যে "ভাবই লাভ"। চেষ্টায় ঠাকুর তুষ্ট। শ্রীগুরুর ইচ্ছা আপনার জীবনে জয়যুক্ত হউক। জয় গুরু, গুরুজীর জয়।

১২। প্রিয় বন্ধুবরেষু,

চিঠিখানা পড়ে খুব আনন্দ পাইলাম। আপনার লেখা চিঠি ক্রমেই মধুর থেকে মধুর হচ্ছে। এতেই

বুঝি সাধনাও ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে; মনে হয় গুরু আপনার বাহির বন্ধ করে অন্তর্মুখী করবার জন্যই রোগের ফাঁদ পেতেছে। আমরা কি বলবো? তাঁর ইচ্ছারই জয় হউক। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী বা গুরুমুখী করাই ত সাধনার শেষ কথা। আপনার জীবনে শ্রীগুরু-সাধনা সফল হোক্। আমরা দেখে চোখ জুড়াই। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু বল্‌তেন যে, ভক্তের "যাহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফূরে"। অর্থাৎ ভক্ত সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র কৃষ্ণ দর্শন করে থাকেন। আপনি শয়নে স্বপনে সাধুসঙ্গ করবেন, এতে আশ্চর্য্য কিছুই নেই।

নরেন্দ্রবাবু নিষ্ঠাবান ভক্ত। "কমলি যখন একবার ধরেছে আর ছোড়েঙ্গা নেহি।" শ্রীনাম ত আর একটা কথার কথা নয়। একটা জ্বলন্ত জীবন্ত শক্তি। কানের ভিতর দিয়া একবার যার মরমে পশেছে তাকেই পাগল করে ছাড়বে। আপনি তার গুরু। যতদিন আপনার আশীর্ব্বাদের বল থাকবে ততদিন তার ভয় নাই। সাধন রাজ্যের এই নিগূঢ় রহস্য। পূজ্যপাদ গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁর বীজ নষ্ট হতে কিছুতেই দিবেন না।

১৩। প্রিয় বন্ধুবরেষু,

ভাই হারাধনবাবু, তাহার শ্রীগুরুদেবের তিরোধান উপলক্ষ্য করে সাধুসেবার জন্য অবনীর মাতা যে যে পাঠিয়েছেন তা পেয়েছি এবং তাহার ইচ্ছানুসারে সাধুসেবায় খরচ করিব।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে লেখা আছে যে জীবের একমাত্র পুণ্য হচ্ছে "স্মৃতি"। আর একমাত্র পাপ হচ্ছে "বিস্মৃতি"। বিস্মৃতি পশুধর্ম্ম, স্মৃতি একমাত্র মানবধর্ম্ম। কৃতজ্ঞ যারা তারা মনে রাখে। অকৃতজ্ঞ যারা তারা ভুলে যায়। মানুষ আমরা সাধারণতঃ পশুর মত সব ভুলে যাই। কার কাছে কি পেয়েছি, কার কাছে কি শিখেছি কিছুই মনে থাকে না। রাখ্‌তে ইচ্ছাও করি না। স্বার্থপর মন কৃতজ্ঞ হতে চায় না। শ্রীমান অবনীর মাতা যে বৎসর বৎসর তার দীক্ষাদাতা শ্রীগুরুকে "স্মরণ" করে সাধুসেবা করান তা দেখে মনে বড়ই আনন্দ হয়। তাহার কৃতজ্ঞতা ও শ্রীগুরুভক্তি প্রশংসনীয়। পরম গুরু শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তার গুরুভক্তি অচলা হোক্, গুরুদত্ত নামে বিশ্বাস দৃঢ় হউক, আর শ্বাসে শ্বাসে শ্রীগুরুদত্ত নাম স্মরণ করিয়া নাম সাধনে সিদ্ধ হইয়া তাহার গুরুর সঙ্গে এক লোকে স্থান পান।

"নামের স্বরূপ হন অখিলের পতি,
সেই নাম সিদ্ধ হলে একধাম প্রাপ্তি।"

শ্রীগুরুর এই সত্যবাণী তাহার জীবনে সত্য হোক্, সত্য হোক, সত্য হোক্।

আপনারা উভয়ে শ্রীনামানন্দে দিন যাপন করুন, আপনাদের সহযাত্রীর এই আন্তরিক কামনা জানবেন। জয় শ্রীগুরু।

১৪। জয় গুরুজীর জয়।
নাহি শোক নাহি ভয়।
গুরু অশোক অভয়।

ভাই হারাধনবাবু,

চিঠি পেয়েছি। ৺নরনারায়ণবাবুর সঙ্গে অল্পদিনের আলাপ। তবু বুঝেছিলাম লোকটী সংযমী, বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান। সতীর্থ বলে, বিশেষ বয়সে কিছু বড় ছিলেম বলে, বড়ই শ্রদ্ধা করতো। তাই তাঁর অকস্মাৎ তিরোধানে আমিও প্রাণে খুব ব্যথা পাচ্ছি। জরামরণশীল সংসারে মৃত্যু অনিবার্য্য জেনেও মনটা এক একবার ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। যাক্, লীলাময়ের লীলার সাথী আমাদের হতেই হবে। সুখে দুঃখে তাঁর ইচ্ছার জয় দিতেই হবে। নিত্যধামে গিয়ে নিত্য লীলায় প্রবেশ করে তাঁর আত্মা নিত্য শান্তিলাভ করুক, শ্রীগুরুর চরণে এই আমাদের প্রার্থনা।

"তোমারই ইচ্ছা হোক্ পূর্ণ করুণাময় স্বামী।"
জয় গুরুজীর জয়, মৃত্যুর হোক ক্ষয়
শোকের হোক লয়।

হ্যাঁ, গোষ্ঠভায়া, আপনি ও আমি সকলেই মৃত্যুর আইলে দাঁড়াইয়া আছি। তলব হলেই হাজিরা দিতে হবে। "জয় গুরু,

জয় গুরু” বলে যেন শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পারি এই প্রার্থনা। এখন কবির এ গানটাই সর্ব্বদা মনে জাগে—

“ওরে যেতে হবে, আর দেরী নাই,
পিছিয়ে পড়ে র'বি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই।”

প্রতিদিন প্রাতে উঠে ভাবি, ঠাকুর। আর “একদিন” দিলে। মনে যেন তোমাকেই ভাবি, চোখ যেন সর্ব্বদা তোমাকেই দেখে, কান যেন তোমার নামই শোনে, জিহ্বা যেন তোমার নামই গান করে—তোমার কাছে এই নিবেদন। আজ যাই।

১৫। ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদে উন্নত হওয়ায় ক্ষীরোদবাবুকে আমি যে আনন্দের পত্র দিই তাহার উত্তরে তিনি এই পত্র দেন:—

প্রিয় হারাধনবাবু,

চিঠি পাইলাম। শ্রীগুরু আশীর্ব্বাদ ও আপনাদের শুভেচ্ছায় উচ্চ পদ পেয়েছি। শ্রীগুরু বল্‌তেন, “তোমরা যে যেখানে থাক্‌বে, উচ্চ হয়েই থাক্‌বে।” গুরুবাক্যই সত্য। গুরুরই জয়। আপনার কাছে কি বল্‌বো। আপনিও নিজের জীবনে উপলব্ধি করে থাক্‌বেন যে শ্রীগুরুই একমাত্র সত্য, তাঁর বাক্যই সত্য

আর তাঁর অসীম দয়াই সত্য। তা ছাড়া সব ফাঁকি—সব মিথ্যা। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেন। ছেলেদের আমার ভালবাসা জানাবেন।

১৬। প্রিয়বরেষু,

একদিন কাঁচড়াপাড়া থেকে পরের দিনই চলে আসিয়াছিলাম। স্থানটি খুব নির্জ্জন, সাধন ভজনের যোগ্য স্থানই বটে। তবে "সাধু সঙ্গে কর সদা নাম সংকীর্ত্তন।" সাধুর সমান না হলে "নির্জ্জন স্থান" ভাল লাগে না। অন্তরঙ্গ ২।১টী লোক না হলে সাধন ভজনের সুবিধা হয় না। আর কি বল্‌বো। গুরুদেব গান গাইতেন,—

"দরদী দরদী বিনে প্রাণ বাঁচে না,
মনের কথা কইব কোথা সে কইতে মানা,
দরদী পাই কোথা।"

১৭। প্রিয়বরেষু,

চিঠি পেয়ে বিশেষ সুখী হলাম। একবার যাবো যাবো বলে আপনার ওখানে যাওয়া হয় নাই। আপনারাই আসবেন জেনে সুখী হলাম। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগাঙ্গুলী মহাশয় আমাদের ধর্ম্মের সিদ্ধপুরুষ। এই মহাপুরুষের একখানা Photo

বাড়ীতে রাখ্‌তে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। আপনি নিয়ে আস্‌বেন। আশা করি গোষ্ঠভায়া আপনার সঙ্গে আস্‌বেন।

১৮। প্রিয়বরেষু,

দাদা, চিঠি পাইলাম। দেহের ধর্ম্ম মাঝে মাঝে বিগড়ে যাওয়া। খাওয়া দাওয়ার নিয়মেও কিছু গলদ হয়েছিল। তাই একটু ভুগে উঠলুম। আপনাদের আশীর্ব্বাদে ভালই আছি। চিন্তা করিবেন না। ঔষধ পথ্য "নাম সাধন"—এটা যে ভুলে যাই দাদা, তাই ত কষ্ট। ....ঔষধ বন্ধ করবার পরই ভাল হয়েছি। এত দেখেও ত দাদা, নামে প্রাণসমর্পণ করে থাকৃতে পারছি না। এ রোগের ঔষধ কি? আপনাদের আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আর উপায় নাই। গুরুকৃপাহিকেবলম। নামই মূলাধার, গুরুকৃপা না হলে এ বিশ্বাসটা হয় না দেখছি।

১৯। প্রিয়বরেষু,

ভাই হারাধনবাবু, আপনার চিঠি পড়ে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। আপনার শুভেচ্ছা এই দীনের জীবনে সফল হউক। যেন সজ্ঞানে শ্রীগুরু স্মরণ ও দর্শন কর্‌তে কর্‌তে এই লীলা শেষ করতে পারি। ....মৃত্যুর আইলে দাঁড়িয়ে আছি। আশীর্ব্বাদ করবেন যেন শ্রীনাম ও শ্রীগুরুরূপ বিস্মরণ না হয়ে

যায়। শেষ নিঃশ্বাসে যেন তাঁর দেওয়া প্রাণ তাঁর শ্রীচরণে উৎসর্গ করে যেতে পারি।

"শেষের সময় হে দয়াময় দিও নাকো ফাঁকি,
তখন হয় কি না হয় মনে উদয় এখুনি বলে রাখি।
আমায় দিওনাকো ফাঁকি।"

২০। প্রিয়বরেষু,

বৌমার শ্রীগুরুভক্তি প্রশংসনীয়। ত্যাগ ও সেবা দ্বারাই শ্রদ্ধা জাগিয়ে রাখতে হয়। বৎসর বৎসর শ্রীগুরুর প্রীত্যর্থে এই সাধু সেবার জন্য দান তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধারই পরিচয়। আমরা তাহার স্বধর্ম্মের জন। ৺ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তাহার শ্রীগুরুতে ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ় হোক্ এবং ফলে নিত্যানন্দ ও নিত্য শান্তি লাভ করুন।

২১। প্রিয়বরেষু,

শ্রীগুরুকৃপায় আপদ বিপদ কেটে যাবে, চিন্তা করিবেন না। শ্রীগুরুকৃপা যতই আকর্ষণ করতে থাকে ততই সংসারে আসক্তি কম্‌তে থাকে। আপনার তাই হচ্ছে। আসক্তি ক্ষয়ে "গুরুরই জয়"। আমরা দেখে সুখী। তিনি

সত্যবাদী। তাঁর জিনিষ তিনি নেবার বেলা ঠিক করে নিবেনই। যাবার বেলা যেন হাসতে হাসতে এই দুনিয়াটাকে ক্ষমা করে, দুনিয়ার কাছ থেকে ক্ষমা পেয়ে "জয়গুরু শ্রীগুরু" বলে যেতে পারি, তাঁর শ্রীচরণে আমাদের এই প্রার্থনা।

"যাবার কালে একথাটি বলে যেতে চাই।
যা পেয়েছি, যা শিখেছি তার তুলনা নাই॥"

তাঁর অশেষ কৃপায় কতই ভোগ করিলাম, কতই শিখলাম তা ভাবিলে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরে উঠে। আমাদের অক্ষমতা, অযোগ্যতা যতই হোক্ না, তাঁর দয়া, তাঁর করুণা অসীম। তাঁরই জয়, তাঁরই জয়গান করিতে করিতে যেন চোখ বুজতে পারি, আপনাদের কাছে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। দয়াল গুরুর কৃপায় আপনার সাধনা সিদ্ধ হউক, তাঁর চরণে এই আমার বিনীত প্রার্থনা।

২২। সুহৃদবরেষু,

অবস্থা দুজনেরই সমান। প্রাণ ভিতর থেকে কেবলই কেঁদে উঠছে "হলো না, হলো না" বলে। শ্রীগুরু বল্‌তেন—

আমি ঝাঁপ দিলেম সুধাসিন্ধু হেরি।
এখন বিষের জ্বালায় জ্বলে মরি॥

বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলে, এই বিরহের কান্নাই সাধনের শেষ অবস্থা। ইহাই না কি "গোপীভাব"। হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, হা গুরু, কোথায় গুরু, বলে হা হুতাশ। এখন আর কি করবো বলুন। চলুন বসে বসে গান গাই—

অসাধ্য সাধন সম্পন্ন হবার নয়,
একমাত্র ভরসা তুমি নিজে দয়াময়।

২৩। সুহৃদবরেষু,

ভক্তের কল্যাণ ভগবান সর্ব্বদাই করেন। তবে সাংসারিক বিষয়ে মঙ্গলামঙ্গল ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, সব সময়ে বুঝি না বলে এ সব বিষয় তাঁর পায়ে ফেলে দেওয়াই সঙ্গত। সাংসারিক অভাব অভিযোগের উর্দ্ধে, অতি উর্দ্ধে, প্রেম ভক্তির স্থান।

২৪। বন্ধুবরেষু,

তীর্থ দর্শনে আনন্দ পাইতেছেন শুনে আনন্দিত হইলাম। "শ্রীকৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা।" নরলীলার মধ্যে আবার গুরু-শিষ্যরূপে যে লীলা তাহা অনুপম। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সেই লীলা প্রকট হয়নি। আপনারা সেই ক্ষেত্রে বাস করিয়া আনন্দ পাইতেছেন ইহা সৌভাগ্যের কথা। ভগবানের লীলা-রহস্য শ্রীগুরু কৃপায় আপনার হৃদয়ে স্ফুরিত হউক শ্রীগুরুচরণে আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা।

২৫। প্রিয়বরেষু,

যে বস্তু ইষ্টকে স্মরণ করাইয়া দেয় তাই ভক্তের প্রিয়। কাঁচরাপাড়ার বাড়ীতে আমাদের ইষ্টদেবতা পদার্পণ করিয়া বাড়ী পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। আপনারা সেই বাড়ীর ধূলি স্পর্শ করিয়া আনন্দলাভ করিয়া আসিয়াছেন। আপনারা ধন্য। তবে সশরীরে না পারলেও আধ্যাত্মিকভাবে আপনাদের সঙ্গে সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম জানবেন। "যে যস্য হৃদি নহি তস্য দূরম্" —এই বাক্য সত্য। "সংসারে সন্ন্যাস" এই ত ক্ষ্যাপার ধর্ম্মের মূলকথা। এই ধর্ম্মের কথা লোকে শুনুক, বুঝুক্ ও গ্রহণ করুক—তাঁর শ্রীচরণে আমাদের এই নিত্য প্রার্থনা।

২৬। সুহৃদবরেষু,

চিঠি পেয়ে সমাচার অবগত হইলাম। গোষ্ঠবাবুর স্ত্রীর যথেষ্ট বয়স হয়েছে। এই রক্তমাংসের খাঁচার মধ্যে বেঁধে রাখার জন্য ৺ঠাকুরকে জানান কেন? আলো যাঁর আঁধারও তাঁর; জীবন যাঁর মরণও তাঁর। দুটোই কর্ত্তার দান—দুটোই প্রিয় জেনে গ্রহণ করতে হবে। দ্বন্দ্বাতীত হতে হবে।

যেই নাম সেই বস্তু ভজ নিষ্ঠা করি।
এই নাম সিদ্ধ হলে এক ধাম প্রাপ্তি॥

শ্রীগুরুর সঙ্গে একই নিত্যধামে বাস করে তাঁর নিত্য সেবালাভই আমাদের সাধন। ইহলোক যাঁর পরলোকও তাঁর। এক কর্ত্তা। নির্ভয়চিত্তে কর্ত্তার দয়া ও ক্ষমার উপর নির্ভর করিয়া হাসতে হাসতে যেন তিনি এই নশ্বর দেহ ছেড়ে দিব্য জন্ম লাভ করতে পারেন, চলুন আমরা সে প্রার্থনাই করি। তিনি গোষ্ঠবাবুর যথার্থ সহধর্ম্মিনী। শ্রীগুরু তার মনোবাসনা পূর্ণ করুন এই আমার প্রার্থনা। ঠাকুর তাকে এ সংসারে রাখতে হয় রাখুন, এখান থেকে নিতে হয় নিন, "তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক" এই আমাদের প্রার্থনা। তিনি যেন ৺গোষ্ঠবাবুর প্রিয় এই গীতটীর গান—

কি ভয় মরণে আমার যদি তুমি সঙ্গে রও।
চাহিলে দেখি তোমায় জিজ্ঞাসিলে কথা কও॥

ওগো ঠাকুর! ওগো দয়াল! ওগো চিরসাথী! মৃত্যুর ভিতর দিয়া আমাদিগকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও। জয় গুরুজীর জয়, নাহি শোক নাহি ভয়।

২৭। বন্ধুবরেষু,

আগামী ২৫শে ফাল্গুন মঙ্গলবার আমার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মোৎসব। তিনি আপনার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। আপনি সস্ত্রীক ও সশিষ্যে সেদিন অপরাহ্নে "নবীন আশ্রমে"

উপস্থিত হইলে পরমানন্দ লাভ করিব। আপনি নিষ্ঠাবান গুরুভক্ত। সৎগুরুতে যেন আমার অচলা ভক্তি হয়, এই আশীর্ব্বাদ করিবেন। সাধন ভজন কিছুই করিতে পারিলাম না। সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপা ও আশীর্ব্বাদই একমাত্র সম্বল।

২৮। প্রিয়বরেষু,

অনিত্য সংসার, কখন কার কি হয় বলা যায় না। রক্ষাকর্ত্তা একজন। .... "দারুণ সংসার বিচিত্র দেখিয়ে পরাণে লেগেছে ভয়" সংসারের গতিবিধি দেখে প্রাণে শান্তি নাই। চারিদিকে কেবল রোগ শোক নানা বিভীষিকা। তাঁর চরণে না যাওয়া পর্য্যন্ত "অভয়" নেই। "বেদনা যদি দাওগো প্রভু শকতি দিও সহিতে।" দিনরাত এই প্রার্থনাই করছি। জীবের আর কর্ত্তব্য নাই।

আশা করি আপনি ও আপনার জন সকলেই ভাল আছেন। আর সর্ব্বদা দয়ালের শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতে পারিতেছেন। আশীর্ব্বাদ করিবেন, দাদা, যেন সুখে দুখে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর জয় দিয়ে যেতে পারি। সংসারের মায়ায় যেন তাঁকে অবিশ্বাস না করি। জয় গুরু। অসার সংসারে তুমিই সার—এই শিক্ষা নিয়ে যেন এ স্থান হতে বিদায় নিতে পারি।

২৯। সুহৃদবরেষু,

দিন ত শেষ হয়ে এলো। এখন কর্ণধার নৌকা ছাড়লেই হয়। ইহকালে যিনি পরকালেও তিনিই মালিক, মহাপ্রভু— এই দৃঢ় প্রত্যয় যেন্ থাকে, আপনাদের কাছে এই প্রার্থনা করি। এখন দেখতে পারছি, সাধন ভজন আর কিছুই না, বিশ্বাসই মূল কথা। সর্ব্বাশ্রয়, মঙ্গলময় কর্ত্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস হলেই সব হলো। ······পলকের ভরসা নাই। তবুও মানুষ অহঙ্কার করে বেড়ায়। যাক্, আজব দুনিয়ায় আজব কারখানা দেখে ভয় লাগে। কর্ত্তার অভয়বাণী না শোনা পর্য্যন্ত স্থির হওয়া যায় না।

কি ভয় ভাবনা রে মন লয়েছ যার আশ্রয়।
সর্ব্ব শক্তিমান তিনি অনন্ত করুণাময়॥

দয়াল কৃপা করুন এই ভিক্ষা। শ্রীগুরু কৃপাহি কেবলম্।

৩০। বন্ধুবরেষু,

সাগরের ঢেউ থাম্‌বে না, এরই মধ্যে জীবনের কাজ করে যেতে হবে। কৌশল শ্রীগুরুই জানেন, তাই গুরু গুরু ডাক্‌ছি। অন্ধকারে তিনিই আলো, পথপ্রদর্শক, নেতা, নায়ক। আউলিয়া

খৃষ্টের নাম "Light of the World"। আউলিয়ারা না থাকলে দুনিয়া আঁধার। তাই শাস্ত্রে বলে ঃ—

মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

৩১। প্রিয়বরেষু,

৭০ বৎসরে পদার্পণ করিলাম। কোন্ দিন তিনি ডাকিবেন জানি না। আশীর্ব্বাদ করিবেন শ্রীগুরুর শ্রীনাম জপতে জপতে যেন দেহত্যাগ করিতে পারি। সাধুর আশীর্ব্বাদই এ পথের একমাত্র পাথেয়।

"যাবার কালে একথাটি বলে যেতে চাই,
যা শিখেছি যা পেয়েছি তার তুলনা নাই।"

ধৈর্য্য তাঁর অসীম, প্রেম তাঁর অপার, কৃপা তাঁর অনন্ত—ধন্য তিনি, ধন্য তাঁর শ্রীনাম, ধন্য তাঁর ভক্ত। তাঁর কৃপায় অনেক দেখিলাম, অনেক শিখিলাম, অনেক পাইলাম। জয়, জয়, তাঁহারই জয়। তাঁর চরণে, তাঁর ভক্তদের চরণে বার বার প্রণাম।

৩২। প্রিয়বরেষু,

অধিক লিখিবার নাই। আশা করি সাধন ভজন ভালই চল্‌ছে। দিন ত ফুরিয়ে এলো। ভাই, কিছুই ত করা গেল না।

আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার,
একমাত্র ভরসা প্রভু, করুণা তোমার,
করুণা তোমার।

৩৩। বন্ধুবরেষু,

"গোপীদের মত গুণহীন ভক্তিই আমাদের সাধ্য।" পূজ্যপাদ গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই বাণী হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবার যোগ্য। পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেবও গাইতেন :—

শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক ব্রজাঙ্গনা,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এদের নাহিক কামনা।

কাঁচরাপাড়ার কর্ত্তার উপর ভার পড়লো নিগুণ ধর্ম্মযাজনের। ·····শিষ্যের জীবনে শ্রীগুরুর জয় ইহাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য।

৩৪। সুহৃদবরেষু,

তীর্থদর্শন করিয়া মঙ্গলমত ফিরে এসেছেন জেনে সুখী হইলাম। চিঠি পড়ে বেশ বুঝতে পারিলাম, তীর্থ দর্শন সফল হয়েছে। ইতিহাস আমাদের সম্প্রদায়কে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের শাখা বলিয়াই গণ্য করে। কাজেই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাভূমি দর্শনে আপনাদের ন্যায় শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে ভগবৎ প্রেম স্ফূর্ত্ত হওয়া

অতি স্বাভাবিক। স্থানের মাহাত্ম্য স্বীকার করতেই হবে। যা হোক্ আপনারা দুজনেই আনন্দ পাইয়া আসিয়াছেন শুনে আমরা আনন্দলাভ করিলাম। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যে অদ্ভুত প্রেমরস বাঙ্গালীর জন্য রেখে গিয়েছেন এবং গুরুপরম্পরা যা আমরা পেয়েছি বলে বিশ্বাস করি, তাহা আমাদের মধ্যে স্থায়ী হোক। শ্রীশ্রীগুরু চরণে এই দীনের নিত্য প্রার্থনা।

৩৫। সুহৃদবরেষু,

আপনার চিঠি পড়ে পরম প্রীতিলাভ করিলাম। আপনার শুভেচ্ছা এই দীনের জীবনে সফল হউক।

মহাপ্রভু বল্‌তেন :—

"যাহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম,
তাঁহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান।"

বাস্তবিক যার সঙ্গে অশান্ত মন শান্ত হয়, অস্থির মন স্থির হয় সেই সাধু। ঐদিন আপনার বাসায় ৩।৪ ঘণ্টা বেশ শান্তিতে ছিলাম। বড়ই আনন্দে সময়টা কেটেছিল। আপনার ও আপনার ছেলেদের মিষ্ট ব্যবহারে বড়ই আপ্যায়িত হইয়াছি। আপনার "শ্রীগুরুধাম" যেন গুরুধামই থাকে, তাঁর চরণে এই প্রার্থনা।

যখন যে ভাবে রাখেন সে ভাবে থেকেই "তোমার, তোমার" জপতে হবে। আমাদের ত অন্য গতি নাই। ১৮ই কলেজ খুল্‌ছে। কবে যে গোলামী থেকে অব্যাহতি পাবো জানি না। গোলামী না গেলে যে সাধন ভজনও হচ্ছে না। আশীর্ব্বাদ করবেন, গোলামী যেন শীঘ্রই শেষ হয়।

৩৬। প্রিয়বরেষু,

নিত্যসিদ্ধ আউলিয়াগণ ছাড়া কেউ ভগবানের নামে ত্যাগ স্বীকার করে নাই। পূজনীয় শিশিরবাবু বল্‌তেন মরার সময় সকলেই দে'খবেন ভগবানের কাছে সকলেই ঋণী রইলেন, তাঁকে কেউ ঋণী করতে পারলে না। কারণ সকলেই স্বীকার করবে সংসারে এসে যা পেলেম, যা ভোগ করলেম তা নিজের যোগ্যতা হিসাবে অনেক বেশী। We have received more than we dreamt. কবীন্দ্র রবীন্দ্র ঠিকই বলেছেন :—

যাবার সময় এ কথাটা বলে যেতে চাই,
যা পেয়েছি, যা শিখেছি তার তুলনা নাই।

রজনীকান্তের কথাটাও মনে পড়ে :—

অকৃতি অধম জেনে কম করে ত দেননি,
যা কিছু দিয়েছ তার অযোগ্য ভাবিয়ে ফিরিয়ে ত নেননি।

বন্ধু, কি আর বল্‌বো ? পরমদাতা, প্রাণদাতা, পালনকর্ত্তা, মোক্ষ-দাতা, ত্রাণকর্ত্তা, তিনি "সর্ব্বং"। We owe Him a debt of endless obligation. অনেক কাল ধরে এই ঋণের বোঝা বইতে হবে। জয়গুরু, জয়গুরু বলে অনন্তকাল এই ঋণ শোধ করতে হবে। কৃষ্ণ বল্‌তেন, "জয়রাধে"। আমরা বলবো "জয়গুরু" অনন্তকাল।

৩৭। বন্ধুবরেষু,

আমরা কাজের বাইরে গেছি, কাজেই খোঁজ খবর আর কেউ নেয় না। আপনি পরপারের বন্ধু ও সাথী তাই খবর নিয়েছেন দেখে পরমানন্দ পাইলাম। আছি বন্ধু এখনও বেঁচে আছি। ঠাকুর আর কদিন রাখবেন জানি না। আশীর্ব্বাদ চাই যেন যে কটা দিন এখানে তিনি রাখেন, তাঁর কথা ছাড়া আর কিছু বলি না—শুনি না। তাঁর দয়া ছাড়া আর কিছু জানি না, মানি না। কর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা একজন, দুইজন নেই—হতে পারে না। তখন আর দুমনা হবার প্রয়োজন নেই। এক এক এক। ঠাকুর বলতেন আগে গীতার একটা শ্লোক শিখে রেখেছি, "সর্ব্ব ধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" ভাই, এসব কথার অর্থ এত দিনে কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে। দরদী ভাই, কি আর বলবো! আপনি গুরুভক্ত, গুরুধাম বাসী;

শ্রীগুরুর চিন্ময় নাম জপতে জপতে, চিন্ময়মূর্ত্তি ভাব্‌তে ভাব্‌তে তাঁর চিন্ময়ধামে নিত্যবাসী। নিত্যানন্দ লাভ করুন তাঁর চরণে এই দীনের প্রার্থনা। জয় গুরুজীর জয়।

৩৮। সুহৃদবরেষু,

জরামরণশীল দেহ। হাজার যত্ন ও চেষ্টায়ও ওকে চিরকাল রাখা যাবে না। দেহ গেহ ধন জন সবই ত দুদিনের—মিথ্যা। একমাত্র চিরসাথী পরম দয়াল শ্রীগুরুই নিত্য ও সত্য তাঁকে যখন চিনেছেন, তাঁহাকে যখন জীবন দিয়ে ভজেছেন, তাহাতে যখন মজেছেন, তখন আর আপনার জন্য ভাবি না। যখন ডাক আস্‌বে তখন "জয়গুরু শ্রীগুরু" বলে চলে যাবেন ভবপারে—এই বিশ্বাস রাখি। জীবনে স্বাস্থ্য, সম্মান, সম্পদ যথেষ্ট ভোগ করা হয়েছে। সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী বেঁচে। পিতৃভক্ত পুত্র, অনুরক্ত শিষ্য বর্ত্তমান। অর্থাৎ জীবনের সব ঋণই একরকম শোধ করা হয়েছে। এখন যার ঋণ কখনও শোধ হবার নয়, হয় না, তাঁর শ্রীচরণে তাঁরই দেওয়া প্রাণ উৎসর্গ করে মানব জীবন সার্থক করুন। আপনার সতীর্থ আমাদের এই আন্তরিক কামনা জানবেন।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ থেকো তুমি॥

এই গান গাইতে গাইতে যেন এই রক্তমাংসের দেহ ত্যাগ করতে পারি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করবেন।

৩৯। প্রিয়বরেষু,

চিঠিখানা পড়ে হর্ষ ও বিষাদ দুইই হলো। এতে যে Self-Surrenderএর ভাব প্রকাশ হয়েছে তা অপূর্ব্ব, বড় সুন্দর, বড় মধুর। জীবনের ও সাধনের শেষ কথা আত্ম-সমর্পণ। যার তা হলো সেই সার্থক। তাই চিঠি পড়ে বড়ই আনন্দ পাইলাম। রবীবাবু প্রতিভাশালী কবি, তাঁর মুখে আত্ম-সমর্পণের বাণী সুন্দর ভাবেই ফুটেছে—অতি সত্য। তবে কবি ও ঋষির ভেদ এই। কবি বলতে পারে, আর ভক্ত জীবনে উপলব্ধি করে। তবে সুখের বিষয় রবীবাবু একাধারে কবি ও ঋষি। তাঁর শেষ বাণীর আপনাকে আনন্দ দেওয়া স্বাভাবিক। আমরাও পাঠ করে কৃতার্থ হইলাম। আশীর্ব্বাদ করবেন এই আত্ম-নিবেদনের ভাব নিয়ে শেষ শ্বাস ফেলতে পারি। জয়গুরু।

তারপর চিঠিখানার মধ্যে একটা বিদায়ের আভাষ রয়েছে। তাই চিঠিখানা পড়ে মনটা বড়ই বিষণ্ন হয়েছে। এমন ভাবে চিঠি কেন লিখেছেন? শরীর কি খুব খারাপ বোধ হচ্ছে? আপনার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা জানবার জন্য উৎসুক রহিলাম। পত্রপাঠ কুশল জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিবেন।

জানি মালিকের মর্জ্জি মতই সব কাজ হচ্ছে। তবুও ছাড়াছাড়ি হবে মনে হলে প্রাণটা কেমন কেঁদে উঠে। মায়া—মায়া। কৃপা করে ঠাকুর এই আপদ—শোক, হৃদয়দৌর্ব্বল্য—হতে রক্ষা করুন তাঁর পায়ে এই প্রার্থনা। তাঁর আদরের জিনিষ তাঁর কাছে যাবে—আরাধ্য দেবতার সঙ্গে ভক্তের চির-মিলন হবে, এতে ত আনন্দ হওয়ারই কথা। যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, ভয় নাই, অত্যাচার নাই, অবিচার নাই, সেই আনন্দলোকে গুরু-শিষ্য, ভক্ত-ভগবানের চিরমিলন সেই ত সুখের সেই ত সুন্দর, সেই ত মধুর। তবে বিষাদ কেন? মায়া মিথ্যে, শ্রীগুরুই একমাত্র সত্য। তাঁরই জয়।

৪০। বন্ধুবরেষু,

বিপদভঞ্জন ভক্তের বিপদ অবশ্যই খণ্ডন করিবেন। আমরা যে কত দুর্ব্বল ও অসহায়—এ কথাটা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই আপদ বিপদ উপস্থিত হয়। কুন্তী প্রার্থনা করতো, "ঠাকুর, আমি যেন বিপদেই থাকি।" কথাটা এখন বুঝিতেছি।

৪১। প্রিয়বরেষু,

দুঃখ রইল যে জন্য আসা তারও কিছু করে যেতে পারলুম না। শাস্ত্রে সিদ্ধির লক্ষণ দেখতে পাই "ত্রিগুণাতীত"

হওয়া—নির্দ্বন্দ্ব হওয়া (গীতা ১৫ অঃ ৫ শ্লোক)। জীবন মরণ, লাভ ক্ষতি, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ যখন সমভাবে গ্রহণ করা যাবে তখন হবো নির্দ্বন্দ্ব। মৃত্যু যে অমৃতের সোপান দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই একটু ভয় ভয় করে। আপনারা গুরুভাই। আশীর্ব্বাদ করুন যাতে "প্রসাদাত্মা বিশতভীঃ" হয়ে এই মানবদেহ পরিত্যাগ করে তাঁর শ্রীপদে আশ্রয় ও বিশ্রাম লাভ করতে পারি। এই পথে সাধুর আশীর্ব্বাদই সম্বল।

৪২। সুহৃদবরেষু,

সংসারে সবই মিথ্যা, ভাবই সত্য। নিষ্ঠাতেই শ্রদ্ধার প্রকাশ। নিষ্ঠাতেই শ্রদ্ধার পরীক্ষা। সাধু, গুরুতে আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর শ্রদ্ধা অচল অটুট থাকুক এই তাঁর চরণে আমাদের নিত্য প্রর্থনা। আশীর্ব্বাদ করিবেন আপনাদের শ্রদ্ধা যেন কিছু আমরাও পাই।

গোষ্ঠ ভায়ার খবর পাই না। আশাকরি আপনি পেয়ে থাকেন এবং ভালই আছেন। সহধর্ম্মী আপনারা দুজনেই আছেন। আপনাদের সঙ্গে চলতে পারি, শ্রীগুরু বল দিউন, এই প্রার্থনা। "সত্য বল, সঙ্গে চল"—এই ত আদেশ পেয়েছিলাম। শেষ পর্য্যন্ত যেন চলতে পারি এই আশীর্ব্বাদ আপনাদের নিকট চাই। জয়গুরু।

অধিক কি লিখিব? আশা করি "নাম রস" পান করিয়া আনন্দেই দিন কাটাইতেছেন। নামামৃত পানে অমর হবার কথা। নামেই যে অমরত্ব লাভ—এই বোধ নিজের ও গুরুভাইদের সকলের হৃদয়ে জাগুক্ তাঁর চরণে এই প্রার্থনা করে বার বার নমস্কার করিতেছি। জয় গুরুজীর জয়!

৪৩। বন্ধুবরেষু,

জরাজনিত একটু কষ্ট পেতেই হবে। দেহের ধর্ম্ম। তবে ঠাকুরের পায়ে প্রার্থনা যেন তাঁর কৃপায় বিস্মৃতি না হয়। তিনি যে অনন্ত করুণাময়। তাঁর স্মরণ নিলে বিনাশ নেই—"নমেভক্ত: প্রণশ্যতি।" এই বাক্য যেন ভুল না হয়ে যায়। নিজের জন্য এবং স্বধর্ম্মের লোকের জন্য এই প্রার্থনা।

৭২ বৎসর প্রায় হয়ে এলো। শরীরটা ক্রমশই ভেঙ্গে পড়ছে। ৺ঠাকুর আর কদিন এখানে রাখবেন জানি না। আশীর্ব্বাদ করবেন যেন তাঁর শ্রীচরণ স্মরণ করতে করতে, তাঁর জয় দিতে দিতে, সকলকে ক্ষমা করে, সকলের কাছ থেকে ক্ষমা পেয়ে ইহলোক ত্যাগ করতে পারি। জয়গুরু!

৪। প্রিয়বরেষু,

মা মহামায়ার সংসারে এসে যথেষ্ট ভোগ করিয়া

গেলাম। এখন দয়া করে তিনি মোহবন্ধন ছিন্ন করে দিন, আজ ৺বিজয়ার দিনে তাঁর চরণে এই প্রার্থনা করিয়া কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি এবং আপনাদের সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীনাম রস পানে আনন্দে বাকি দিন কয়টা কেটে যাউক আপনার জন্য তাঁর চরণে এই প্রার্থনা রইলো।

৪৫। প্রিয়বরেষু,

পরলোকগত মুক্তাত্মার অনন্ত উন্নতি প্রার্থনা করি। আমাদের সুখ দুঃখ, জীবন মরণ, ভাল মন্দের মূলে সেই একজন এই জ্ঞান তাঁর চিত্তে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হোক্।

৪৬। বন্ধুবরেষু,

দাদাভাই, ঠিকই বলেছেন তাঁর "পতিতপাবন" নামটিই আমাদের ভরসা। সাধন ভজন করে তাঁকে পাবো সে আশা রাখি না। কৃপা, তাঁর কৃপাই আমাদের মত জীবের একমাত্র আশার স্থল।

অনেক দেবতা আছেন সাধু তরিবারে,
পতিত উদ্ধার করেন ঠাকুর বলি তারে।

আপনি সত্যই বলেছেন, ঠাকুরের কৃপাই আমাদের শেষ সম্বল "পথের সম্বল তোমার নামটি কেবল।" আশীর্ব্বাদ করবেন যে

কয়টা দিন বাকি আছে যেন দয়ালের "দয়াল" নামটি সর্ব্বদা মনে থাকে।

রবীন্দ্রনাথও গান গেয়ে গেছেন,

আমি নীরবে যাবো, হৃদয়ে লইয়া
ঐ মূরত্তি তব, ওহে জীবন বল্লভ।

যিনি ছুনিয়ার মালিক, জগতের কর্ত্তা তিনি দয়াল, অধমতারণ, পতিতপাবন, তবে আর ভয় কি?

৪৭। সুহৃদবরেষু,

চিঠি পেয়ে সুখী হইলাম। ৺গোষ্ঠবাবুর শেষ কাজ মঙ্গলমত হয়ে গিয়েছে শুনে আনন্দ পাইলাম। সৎ লোকের কাজ সুসম্পন্ন হতে বাধ্য। তাঁর আত্মা নিত্যধামে প্রবেশ করে নিত্য শান্তি লাভ করুক শ্রীগুরুচরণে আমাদের এই প্রার্থনা।

সংসার অনিত্য, অশান্তিপূর্ণ—শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর শান্তির পথ নাই। একথা কেউ শুনবে না, কেউ মানবে না। উপায় নাই। মানুষ কলে কৌশলে শান্তি আন্‌তে চায়। তা কি হয়? জীবের সুবুদ্ধি হোক্, শ্রীগুরুর পায়ে আমাদের এই নিবেদন।

অধিক কি লিখিব, সময় হয়ে এলো। বাকি দিনকটা যেন তাঁরই নাম শুনতে শুনতে, তাঁরই গুণ কীর্ত্তন করতে করতে, অতিবাহিত হয়, এই আশীর্ব্বাদ করবেন। সাধুর আশীর্ব্বাদই শেষ ভরসা।

৪৮। বন্ধুবরেষু,

ঠাকুর! যে লোকে অবিচার নাই, অত্যাচার নাই, অনাচার নাই তোমার সেই অভয়ধামে নিয়ে যাও। আমাদের আর দাঁড়াবার স্থান নেই। তুমি আশ্রয় দাও—ওগো রক্ষাকর্ত্তা রক্ষা কর।

"রক্ষ মাং ত্রাহি মাং"

"তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার এই মৃত্যু আধার ভবে।" তোমার শ্রীনাম ছাড়া আর সব ভুলিয়ে দাও, সমস্ত আপদ হতে রক্ষা কর, রক্ষা কর, ওগো ত্রাণকর্ত্তা! ওগো রক্ষাকর্ত্তা!

রক্ষ মাং রক্ষ মাং রক্ষ মাং
ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং

গুরুধামে বসে শ্রীগুরু নাম জপে শ্রীগুরুর চরণে স্থান পান এই ৺বিজয়ার প্রার্থনা।

৪৯। প্রিয়বরেষু,

দেহের ধর্ম্ম সকলেরই সহ্য করতে হবে। দেহের উপর উঠে যেন পরমগুরু পরমাত্মার জয় দিতে পারি এই শক্তি দিনরাত প্রার্থনা করিতেছি। দয়াল গুরু আমাদের সহায় হউন। জয়গুরু!

৫০। বন্ধুবরেষু,

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে একজনই রক্ষাকর্ত্তা এ বিশ্বাস নিয়ে বসে থাক্‌বো। আমাদের মত লোকের আর কৃত্য দেখি না।

"সবা প্রতি কহে প্রভু যদি মোরে চাও।
সবে তবে নিরন্তর কৃষ্ণ গুণ গাও॥"

আশীর্ব্বাদ করুন তাঁর কথা শুনতে শুনতে, তাঁরই মহিমা কীর্ত্তন করতে করতে যেন জীবনলীলা শেষ হয়। জয় গুরু!

৫১। সুহৃদবরেষু,

বাঁচা মরার কর্ত্তা একজন একথা ভুলে আমাদের সর্ব্বনাশ হচ্ছে। যাক্, কালের স্রোত বন্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আশীর্ব্বাদ করবেন, ভূতে বিশ্বাস করে ভগবানে বিশ্বাস না হারাই। জীবন মরণের মালিক একজন বই দুইজন নাই—এই বিশ্বাসে যেন অটল হয়ে থাক্‌তে পারি।

কাঁচরাপাড়া বেড়িয়ে এলেন শুনে সুখী হইলাম। ঠাকুর সর্ব্বত্র আছেন এ বিশ্বাস ধরে আছি। "Ye are the Temple of God." যত্র জীব তত্র শিব—দেহ মন্দিরই যথার্থ মন্দির।

৫২। প্রিয়বরেষু

চিঠি পেয়ে আনন্দ পাইলাম। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—আমার শরণাপন্ন ভক্তের নাশ নাই। বিশ্বাস হারাবেন না। সব মঙ্গল হবে। All things work together for the good of those that love God. (Bible) কর্ত্তায় যেন অবিশ্বাস না আসে এই প্রার্থনা। অবিশ্বাসই আপদ। "সত্য বল সঙ্গে চল।" যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই রক্ষাকর্ত্তা—তিনি সীমা শেষে ত্রাণকর্ত্তা। চলুন ভাই, কর্ত্তার উপর নির্ভর করিয়া একেবারে নির্ভয় হয়ে যাই। জয় গুরুজীর জয়! কিসের শোক কিসের ভয়!

গোষ্ঠ ভায়ার ছেলেটি আসে কিনা জানি না। যাতে ধর্ম্মের মর্ম্মকথা বোঝে সে চেষ্টা করবেন। বুঝতে চাইবে না—তবুও বোঝাবেন। যে দিন দীক্ষা নিয়েছেন সে দিনই দায় নিয়েছেন। এভাবেই আমাদের শ্রীগুরুর ঋণ শোধ। শ্রীগুরু আপনাকে বোঝাবার শক্তিও দিয়েছেন—এ আমার বিশ্বাস। আপনার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

৫৩। বন্ধুবরেষু,

চিঠিখানা পেয়ে খুব আনন্দ পাইলাম। গুরুর উপর নির্ভর করে শ্রীগুরুধামে বসে থাকুন নির্ভয়ে। তিনিই আমাদের ভরসা।

সংসারের অসারতা ৺ঠাকুর খুব বুঝিয়ে দিলেন। যে রাজ্যে অবিচার নাই, অনাচার নাই, অত্যাচার নাই সেই শান্তি-নিকেতনে যাবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠছে। আশীর্ব্বাদ করবেন যেন বৈরাগ্যভাব স্থায়ী হয়।

৺গোষ্ঠ ভায়ার ছেলেটী আপনার সঙ্গ কচ্ছে শুনে খুব সুখী হইলাম। সত্য সনাতন ধর্ম্মের বীজ সংসারে থাকুক এইটাই চাই। শ্রীগুরু তাঁর শ্রদ্ধা দৃঢ় করুন এই প্রার্থনা।

নরেনবাবুর কল্যাণ নিত্য প্রার্থনীয়। শ্রীগুরু তাঁর সাধন সুসম্পন্ন করুন এই প্রার্থনা।' Many are called, few are chosen. নরেনবাবুকে তিনি choose করেছেন বিশ্বাস করি। তাকে আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জানাবেন। "যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সেই মোর প্রাণ রে।" আউলিয়া যীশু বল্‌তেন, "যে আমার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করে সেই আমার মাতা, সেই আমার ভ্রাতা, আর কাউকে চিনি না।" অধিক লিখিবার নাই। কর্ত্তার কৃপায় জগতে শান্তি আসুক তাঁর চরণে এই নিবেদন!

৫৪। সুহৃদবরেষু,

বর্ত্তমানে সহরে শান্তি এসেছে, সুখের বিষয়। ইহা যেন স্থায়ী হয় এই বর্ত্তমানে আমাদের আন্তরিক কামনা। কর্ত্তার ইচ্ছায় সব হচ্ছে এই বিশ্বাস নিয়া বসে আছি এবং থাকিব। ভাল মন্দ তিনি জানেন। তাঁর ব্যবস্থা মাথায় করে নিবার শক্তিটুকু যেন তিনি দেন তাঁর পাদপদ্মে এই প্রার্থনা।

৫৫। বন্ধুবরেষু,

আপনাদের আশীর্ব্বাদে সত্যেন্দ্র একটু ভাল আছে। বড়ই ভুগিতেছে। কর্ম্ম যেন শেষ হয়ে যায় ঠাকুরকে জানাবেন। আপদের আর শেষ নাই।

অধিক আর কি লিখিব। শ্রীগুরু মুখে শুনেছি "যাহা মুস্কিল তাহাই আসান।" কর্ত্তারই এক নাম "সত্যনারায়ণ" এক নাম "সত্যপীর", এক নাম মুস্কিল-আসান, তাঁরই নাম বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন। বিপদে আপদে যেন আপদতারণ শ্রীহরি নাম না ভুলে যাই—এই আশীর্ব্বাদ করবেন।

আমাদের অসহায়ের সহায় একজন—তাঁকে ধরে থাকি, যা হবার হবে। জয় গুরুজীর জয়! নাহি শোক নাহি ভয়! ভালবাসা জানবেন। নামানন্দে মজে থাকুন ঠাকুরের চরণে এই নিত্য প্রার্থনা।

৫৬। প্রিয়বরেষু,

দেহ ছাড়া চলে না আবার দেহ হইয়াই যত দুঃখ। তাই হিন্দু তিন বেলা জপ করে,

"অহং ব্রহ্মাস্মি"
"নাহং দেহাস্মী"

আমি দেহ নই—দেহ নই—দেহ নই। আমি দেহী—আত্মা ব্রহ্মের অংশ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—অচ্ছেদ্য, অদাহ্য নিত্য সত্য সনাতন। জরামরণ ব্যাধির উপরে আমার স্থান। ব্যাধিকে মৃত্যুকে ভয় করিব না। না-না-না। আমি প্রশান্ত বিগতভিঃ হয়ে থাকি। অশোক অভয় হয়ে যেন এখান হতে বিদায় নিতে পারি, ঠাকুরের পায়ে আমাদের সকলের এই প্রার্থনা হউক। অনেক দেখিয়া গেলাম, অনেক শিখিয়া গেলাম, এখন তাঁর জিনিষ সব তাঁরই চরণে উৎসর্গ করে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাউক। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

৫৭। বন্ধুবরেষু,

আপনার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ দেয় টাকা পাইলাম। তাঁহার প্রীতির জন্য সাধু সেবায় খরচ করিব। ধর্ম্ম যখন মানি তখন আত্মার অমরত্ব অবশ্যই বিশ্বাস করি। পুত্র, কন্যা বা শিষ্যের শ্রদ্ধা প্রকাশে যে

পরলোকগত আত্মা শান্তি ও প্রীতিলাভ করে তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। অবনীর মাতার গুরুভক্তি ও পিতৃভক্তি প্রশংসনীয়। শ্রীগুরু কৃপায় তাহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইক—গুরুর গুরু পরম গুরুর পায়ে এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

আপনার আশীর্ব্বাদে সত্যেনের মাতা আরোগ্যলাভ করিয়াছে। সত্যেনও অনেকটা ভাল আছে। তিনি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু। ভক্তের আশীর্ব্বাদই আমাদের সম্বল।

শ্রীগুরু কৃপায় এই অধমের দিন একরূপ কেটে যাচ্ছে। প্রার্থনা করবেন যেন বাকী দিন কটা তাঁর শ্রীপাদ পদ্মের ধ্যান ধারণা করে যেতে পারি।

দিনত গেল সন্ধ্যা হল
পার কর আমারে,
ঠাকুর! পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা জেনে বার্ত্তা
ডাক্‌ছি হে তোমারে॥

বসে বসে এ গান গাই আর কি করবো? সাধন ভজন ত আর কিছুই জানি না। শিখি নাই। ভবসাগর একমাত্র তিনিই পার করতে পারেন—তাই কর্ত্তার শরণ লইয়া দিবা রাত্রি তাঁর কৃপাই স্মরণ করিতেছি। সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁর শরণই সাধনা।

৫৮। সুহৃদবরেষু,

শুনিলাম শিবপ্রসাদের পুত্রটি মারা গিয়াছে। দুঃখের কথা। অনিত্য সংসারে এ সব কারবারে বড়ই কষ্ট দেয়। তবে তাঁর ইচ্ছা মান্‌তেই হবে। পরপারে গিয়ে এ সব সমস্যার মীমাংসা হবে। ইহকালে মাথা পেতে নিতেই হবে।

অধিক কি লিখবো? জীবন শেষ হয়ে এলো। কাহাকেও কষ্ট না দিয়ে নিজেও কষ্ট না পেয়ে শ্রীগুরুর জয় দিতে দিতে যেন চক্ষু মুদ্রিত করতে পারি, ভাই, এ আশীর্ব্বাদ করবেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদই এ পথে একমাত্র সম্বল। ভক্তের হৃদয়েই ভগবানের বাস। ভক্তমুখেই তিনিই আশীর্ব্বাদ করেন। ভক্তাধীন ভগবান। ভগবান সত্য—ভক্ত সত্য—ভাব সত্য। এই ত্রিসত্য যেন শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করে যেতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। ছেলেপিলে নিয়ে নামানন্দে বিভোর হয়ে থাকুন, বন্ধুর এই আন্তরিক কামনা জান্‌বেন।

৫৯। প্রিয়বরেষু,

চিঠি পেয়ে আনন্দ পাইলাম। দুজনেই জীবন সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছি।

"যখন যে ভাবে রাখ সে ভাবেই থাকিব।
সহিতে না পারি যদি পায়ে পড়ে কাঁদিব॥"

দুজনেরই এই প্রার্থনা হউক। আর বলিবার কিছু নাই। কর্ত্তার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে।

৬০। সুহৃদবরেষু,

দীর্ঘায়ু হওয়াটা বড় সুবিধের নয়। বেঁচে থাকলেই নানা দুশ্চিন্তায় ভুগতে হয়। ভগবানের চিন্তা ছেড়ে ভূতের চিন্তা আর ভাল লাগে না। সংসারে থেকে চিন্তা না করেও চলে না। এ যে বড় খারাপ অবস্থা। ঠাকুর এর থেকে উদ্ধার করুন তাঁর শ্রীচরণে এই প্রার্থনা। এর মধ্যে একদিন ৺গোষ্ঠ ভায়ার ছেলেটি এসেছিল। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম ধর্ম্ম রাখতে পারবে। শ্রীগুরু তাহার কল্যাণ করুন।

অধিক লিখবার নাই। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানবেন।

৬১। বন্ধুবরেষু,

শেষটা বড় ভাল যাচ্ছে না। আশীর্ব্বাদ করিবেন সজ্ঞানে তাঁর নাম করতে করতে যেন দেহরক্ষা করতে পারি। ভালবাসা জানবেন।

৬২। প্রিয়বরেষু,

আপনি শীঘ্র শীঘ্র সুস্থ ও সবল হয়ে উঠুন। যে কদিন আরও তিনি এই কর্ম্মভূমিতে রাখেন তাঁরই গুণগান

করতে করতে যেন কেটে যায় এই তাঁর শ্রীচরণে প্রার্থনা। আর আপনার সঙ্গ পেয়ে আমরাও যেন ধন্য হই, এই আন্তরিক কামনা। জয় শ্রীগুরুর জয়। সুখে দুঃখে, রোগে শোকে, সম্পদে বিপদে, তাঁরই হোক্ জয়। তাঁরই হোক জয়!

আপনার পরপারের সহযাত্রী।

৬৩। বন্ধুবরেষু,

আমারও শরীরটা তত ভাল যাচ্ছে না। ৭১ হ'ল; আর কদিন ঠাকুর এখানে রাখবেন জানি না। তাঁর ইচ্ছা যেন অবনত মস্তকে আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে পারি এই আশীর্ব্বাদ করবেন। এ পথে আপনাদের আশীর্ব্বাদই এক মাত্র ভরসা। নরেনবাবুর মতি দৃঢ় হোক্। বিশ্বাসও তাঁরই অমূল্য দান। আপনার আশীর্ব্বাদ থাক্‌লে তার সব হয়ে যাবে। "গুরুকৃপাহি-কেবলম।" "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তজনে।" শাস্ত্র বাক্য কখনই মিথ্যা নয়। দুর্লভ মানবজীবন পাইয়া গুরুকৃপা বলে জগৎ গুরুময় দেখে যেতে পারলেই সাধন সিদ্ধি। নতুবা মিছে আসা—মিছে যাওয়া। নরেনবাবু গুরুকৃপা পেয়েছে, নতুবা আপনার হৃদয়ে এই কল্যাণ কামনা জাগতো না। জয় গুরুজীর জয়! জয় মঙ্গলময়!

৬৪। প্রিয়বরেষু,

আত্মা দেহাতীত বস্তু। ভগবানের অংশ। গোলা-গুলি তাঁকে স্পর্শও করিতে পারে না এই বিশ্বাস যেন হারা না হই ও না হন শ্রীগুরুর কাছে এই প্রার্থনা। জয়গুরু, জয়গুরু, জয়গুরু।

দীন গুরুভাই।

৬৫। সুহৃদবরেষু

আপনি গুরুগতপ্রাণ। তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত। আপনার সব মঙ্গল হবে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বাইবেল শাস্ত্রে আছে; All things work for good to them who love God. সত্য, অতি সত্য।

গোষ্ঠভায়ার একখানা চিঠি আমিও পেয়েছি। সে খুব আনন্দেই আছে। অধিক লিখবার নেই; ৺দোলে কাঁচরাপাড়া না গেলে বিকালের দিকে একবার "নবীন আশ্রমে" এলে আনন্দ পাবো। আন্তরিক ভালবাসা জান্‌বেন।

৬৬। বন্ধুবরেষু,

গোষ্ঠ ভায়ার ছেলেটী সৎপাত্র বলে আমারও ধারণা হয়েছে। শ্রীগুরু তাহার সহায় হউন। আগামী সপ্তাহে এখানে আস্‌বার মনস্থ করেছেন শুনে বিশেষ আনন্দ পাইলাম। তবে

বয়স হয়েছে, শরীরও তত ভাল নয়, একা আসেন এটা আমি ইচ্ছা করি না। সাথী পেলে আস্‌বেন। নতুবা আসার দরকার নাই। দূরের রাস্তা। প্রাণের যোগই যোগ। সুস্থ থাকুন। দিনরাত দয়াল ঠাকুরের নাম কীর্ত্তন করুন, স্মরণ করুন, শ্রবণ করুন এখন এই চাই। কি বলেন?

অধিক কি লিখিব। আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানবেন।

আপনার গুণমুগ্ধ,
ক্ষীরোদ গুপ্ত।

ভগবদ্ভজন পরম ভক্ত ও সাধক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বাড়ুয্যে মহাশয় যে সকল গভীর ভাবপূর্ণ পত্র তাঁহার শ্রীগুরুদেবের নিকট লিখিয়াছিলেন তাহার কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি ভক্তগণ পড়িয়া আনন্দলাভ করিবেন।

১। বাবা,

এখন বেশ বুঝতে পারছি যে আমার Self-Surrender হয় নাই অর্থাৎ শ্রীগুরুতে (অর্থাৎ আপনাতে) পূর্ণ শরণাগতি বা আত্মসমর্পণ আসে নাই। "আমিত্ব" এবং "আমার" সংজ্ঞা লোপ পায় নাই, নামে রতি হয় নাই। আমিত্ব তথা আমার সংজ্ঞা

লোপ না হলে Self-Surrender অর্থাৎ শরণাগতি আস্‌তে পারে না এবং শরণাগতি না হলে "নামে" রতি হতে পারে না। নামে রতি হওয়া মানে "নামে এক লক্ষ্য হওয়া" অর্থাৎ নাম যে প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে দেহেতে প্রবাহিত হইতেছে এবং এমন কি প্রত্যেক লোমকূপ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে অর্থাৎ নামই যে প্রাণস্বরূপ এই পঞ্চ ভৌতিক দেহকে ধারণ করে রয়েছে এবং ক্রিয়াশীল করে রেখেছে সেই নামের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম, শরণাগতি ব্যতীত হৃদয় জাগে না এবং শ্বাস প্রশ্বাসে নামেতে এক লক্ষ্য হওয়া যায় না। বিষয় এসে নামের লক্ষ্য হইতে মনকে বিচ্যুত করে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, নামকে ত চক্ষে দেখা যায় না তবে নামেতে শরণাগতি সম্ভবে কি প্রকারে? ইহার উত্তর যে নামই শ্রীগুরু, শ্রীগুরুই পরমাত্মা, শ্রীগুরুই ভগবান এবং শ্রীগুরুই ব্রহ্ম। সেই জন্যই "নাম ব্রহ্ম"। পরমাত্মা শ্রীগুরুর সাকার মূর্ত্তি। শ্রীগুরু রূপে দয়া করিয়া জগতে আসিয়া প্রেমিক ভক্তদের সহিত মধুর লীলা করেন ও ভক্তরা তাহা বর্ত্তমান দেহে আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হয় ও শ্রীগুরুতে আত্মহারা হইয়া দেহবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সদা শ্রীগুরুতে অবস্থিত হয় এবং ব্যবহারিক রূপে সংসারের সব কার্য্য অনাসক্ত ভাবে করেন। "শ্রীগুরুই সত্য"—এই জ্ঞানই সর্ব্বদা পোষণ করে এবং শ্রীনাম ও শ্রীগুরু রূপ সর্ব্বদা স্মরণ, মনন ও নিরীক্ষণ করে।

শ্রীগুরু হইতে তাঁহার নাম আলাদা করা যায় না। শক্তিমান হইতে শক্তি আলাদা করা যায় না যেমন, আগুণ আর তার দাহিকা-শক্তি আলাদা করা যায় না। নাম নামী অভেদ। নিরাকারের সাধনা হয় না, নিরাকারে মন মজে না। নামরূপই শ্রীগুরু (পরমাত্মা) জীব উদ্ধার হেতু ভক্তের কাছে সাকার রূপে দেখা দেন ও ভক্ত তাঁহার সহিত আত্মহারা হইয়া প্রেম করে। জীব এই অবস্থায় সর্ব্ব সংস্কারের অতীত হইয়া এক শ্রীগুরুতে মজিয়া থাকে। তখন ভক্ত বা শিষ্যর শ্রীগুরুর নিকট কিছুই বলিবার বা চাহিবার থাকে না। তখন পূর্ণ শরণাগতি লাভ করিয়া বোবা হইয়া বসিয়া থাকে। কেবল নাম ও গুরুরূপ স্মরণ করে। তাহার সর্ব্বত্র শ্রীগুরুরূপ স্ফূরণ হয়। এই অবস্থায় সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, মোহ-শোক, আপন-পর কিছুই থাকে না। তখন তার কাছে জগতের সবই আপন, আবার কিছুই তার নয়। তখন তার কাছে কেবলমাত্র শ্রীগুরু তথা নামই সত্য।

জীব সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বহু ভাগ্যবলে সে যখন ভগবানের সাকার মূর্ত্তি শ্রীগুরুর দর্শন পায় ও শ্রীগুরুর নিকট নাম শ্রবণ করিয়া যখন আত্মদর্শন হয় তখন জীব (শিষ্য) নবজীবন লাভ করিয়া এই দেহেই জীবনমুক্ত হয় এবং শ্রীগুরুর সঙ্গ করিয়া তাহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হয় ও

হৃদয় মধ্যে এবং সর্ব্বত্র শ্রীরূপ দর্শন করিয়া ধন্য হয়। নামে সাধন সময়ে এবং সর্ব্বত্র সর্ব্ব আপদ দূরীভূত হলে মন স্থির হয় ও আনন্দে ভাসাইয়া দেয়। আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই আনন্দ সর্ব্বদা আস্বাদন করি ও আপনার শ্রীচরণ বিস্মরণ না হই। অনেক ভাগ্যে আপনার কৃপা লাভ করিয়া জীবন ধন্য হইয়াছে। সদাই আপনার শরনা-গতি প্রার্থনা করি ও আশীর্ব্বাদ করুন যেন শেষ সময়ে আপনার শ্রীচরণ না ভুলি। আমি নিত্য অপরাধী, আমার সর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

২। বাবা,

আমার জ্ঞানে এই স্থির হইয়াছে যে আত্মসমর্পণ হলে মানুষ "জীয়ন্তে মরা" হয়ে থাকে। প্রকৃতি ত্যাগ হয় ও ইন্দ্রিয় বুদ্ধি তখন থাকে না। জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মপ্রসূত ফল সকলই তাঁহার ইচ্ছা কিম্বা তাঁহার দান বলিয়া সাদরে শিরোধার্য্য করিতে পারে এবং সেই হেতুই আত্মসমর্পিত ব্যক্তিতে জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মপ্রসূত ফল বিকার উপস্থিত করিতে পারে না। জীবের সুকৃতি দুষ্কৃতি দুইই আছে। আমার বহু জন্মার্জিত সুকৃতির ফলে আপনার কৃপায় আপনার নিকট হইতে যে মন্ত্র পেয়েছি তাহাই জগতে একমাত্র "আত্মসমর্পণ মন্ত্র"। প্রার্থনার প্রয়োজন আছে। জীবের আপদ-বিপদ ভজন সাধনের

বিঘ্ন ঘটায় যথা,—ষড় রিপু, অহঙ্কার, অভিমান ইত্যাদি। আত্ম-সমর্পণ হলে ঐ সব আপদ বিপদের শান্তি হয়। জীয়ন্তে মরা হইলে শান্তি উপলব্ধি হয় ও পার্থিব বিষয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। সেইজন্য আপদ বিপদে শান্তির জন্য প্রার্থনা দরকার ও শান্তির জন্য তাঁহার দোহাই দিতে হয় বুঝিলাম।

পার্থিব সম্পদ ও বিপদের সম্বন্ধ দেহের সহিত এবং দেহ-ত্যাগেই ইহার শেষ। এবং দেহধারণ হেতু কর্ম্মপ্রসূত এই সম্পদ, বিপদ, জন্ম, মৃত্যু হইতে রেহাই পাবার জন্যই অর্থাৎ কর্ম্মফল হইতে রেহাই পাবার জন্য পরমার্থের প্রয়োজন। এই পরমার্থই শ্রীগুরু এবং শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণই একমাত্র পাথেয়। শ্রীগুরুই একমাত্র সত্য, নিত্য ও বুদ্ধ। অতএব পার্থিব সম্পদ বিপদের বিষয় লইয়া শ্রীগুরুর নিকট উপস্থিত হওয়াটা একেবারে যুক্তিযুক্ত নহে কারণ পার্থিব সম্পদ বিপদাদি দেহাভিমান মাত্র ও মিথ্যা। একমাত্র শ্রীগুরুই সত্য।

আমার জন্মজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলে আপনার শ্রীচরণ কৃপায় আপনার নিকট হইতে যে অমূল্য ধন পাথেয় স্বরূপ পেয়েছি, সেই পাথেয় এবং পন্থা অবলম্বন করিয়া যাহাতে আপনার শ্রীচরণে লীন হইতে পারি তাহার সাধন সতত করিতেছি। সকলই আপনার কৃপাসাপেক্ষ। আপনার শ্রীচরণে দাসের শরণাগতি একমাত্র প্রার্থনা।

৩। বাবা,

আপনি লিখিয়াছেন যে, "তিনি যাহা ভাল বুঝিতেছেন তাহাই করিতেছেন।" ভারী খাঁটি কথা। যার শ্রীগুরুতে পূর্ণ শরণাগতি হইয়াছে তাহারই এই বেদবাক্যের অনুভূতি হয়। যাহার শ্রীগুরুতে শরণাগতি হইয়াছে তাঁহার কাজে মঙ্গলামঙ্গল সবই সমান এবং সে অমঙ্গলের মধ্যেও পূর্ণ মঙ্গলের সন্ধান পায় বলিয়াই অমঙ্গলকে, দুঃখকে "শ্রীগুরুর দান" বলিয়া সাদরে বরণ করিতে পারে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই অবস্থা এ দীন লাভ করিতে পারে ও দেহবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সদা যুক্ত অবস্থায় অবস্থিত হইতে পারে।

৪। বাবা,

বড়ই আক্ষেপ হয় যে আমি অতি দুর্ভাগা। আমার কিছুই হলো না। নামে মজিলাম না, রূপেতে মজিলাম না, তবে কেন আগুনে ঝাঁপ দিলাম। আপনি দেহেতে অবস্থানকালীন আপনাতে মজিলাম না তবে আপনার দেহরক্ষার পরে কি ভাবে আপনার জন্য প্রাণে বিরহ উপস্থিত হবে ভাবিয়া পাই না। মিলন ও বিরহ এই দুইয়ের মধ্যে মিলন অপেক্ষা বিরহ শ্রেষ্ঠ। বিরহে সদাই হৃদয়বল্লভকে দেখিবার ইচ্ছা হয়, বিরহে সদাই সঙ্গ করিবার অভিলাষ হয়, না দেখিলে প্রাণ বাঁচে না।

পরম ভক্ত

শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দে মহাশয়

তখন শ্রীগুরুরূপ সর্ব্বত্র স্ফূর্ত্ত হয়। সর্ব্বদাই সকল বস্তুতে শ্রীগুরুরূপ দর্শন হয়। আপনাকে পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে ইচ্ছা হয় তবুও প্রাণে তৃপ্তি পাই না। বিদ্যাপতির এই পদটী মনে বড়ই তৃপ্তি ও আনন্দ দেয়, যথা—

"সখী কিঁ পুছসি অনুভব মোর।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনিনু,
শ্রুতি পথে পরশ ন গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝিনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া না জুড়ল গেলি॥

শ্রীগুরুরূপ দর্শন করিয়া ও হৃদয়ে ধারণা করিয়া কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। সদা রূপসাগরে ডুবিয়া থাকি ইচ্ছা হয়। বিরহ অবস্থায় এই ভাব আরও বর্দ্ধিত হয়। এই ভাব শ্রীরাধিকার ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের হইয়াছিল। সকলই আপনার কৃপাসাপেক্ষ। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, গোপিনীরা আত্মহারা হইয়া লতাগুল্ম

প্রভৃতিতেও শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করিতেন। এই অবস্থায় শ্রীগুরুতে জীব পাগল হইয়া যায়। কবে আপনার কৃপায় এ অধমে এই অবস্থা হবে জানি না। বহু সুকৃতিতে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া শ্রীগুরু কৃপায় এই অবস্থা হয়। জীবন্তে মরা কবে হবো জানি না। দেহবুদ্ধি থাকিতে হবে না। গুরু কৃপাহি কেবলম্।

৫। বাবা,

শ্রীগুরু কখনও মানুষ নহেন। তিনি পরমাত্মা। দয়া করিয়া জগতে আসেন ও জীব উদ্ধার করেন। প্রভু, আপনি এ অধমকে, এ পতিতকে দয়া করিয়া "শ্রীনাম" দিয়া জন্ম দিলেন ও সর্ব্ব কলুষ হইতে উদ্ধার করিলেন। এই দেহে, এই প্রাণের "মালিক" ও "কর্ত্তা" আপনি। আমার সর্ব্ব সংস্কার ছিন্ন করিয়া প্রভু, আমাকে দয়া করিয়া আত্মসাৎ করিয়া "আপনার" করিয়া লউন। এমনি পাজী মন সুবিধা পেলেই দূরে চলিয়া যায়। প্রভু, আপনার দয়া ছাড়া উপায় নাই। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার চিত্ত আমার প্রাণ সদা শ্রীচরণ পঙ্কজে লাগিয়া থাকে। প্রভু, আপনি ছাড়া আমার বলিয়া কিছু নাই। বাবা, আপনার শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, মুখুয্যে মশাই বলিতেন, "পুত্র অপেক্ষা শিষ্য শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র, কারণ শিষ্যের জন্ম শ্রীগুরুর মুখ হইতে।" এ অধম আপনার কৃপায় সেই পবিত্র জন্ম আপনা হইতে লাভ

করিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন সেই মহান পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারি ও শেষ সময়ে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আপনাতে লীন হই। আমাকে পাতকী জানিয়াই যখন গ্রহণ করিয়াছেন তখন কৃপা করিতেই হইবে। জয় গুরু, জয় দয়াময়, জয় পতিতপাবন, জয় অধমতারণ, সাধনাদুর্লভ প্রাণবল্লভ।

৬। বাবা,

মনে হয় আপনার শ্রীচরণ বহুদিন দর্শন করি নাই। মানসে দর্শন করিয়া তত আনন্দ পাই না যত প্রত্যক্ষে পাই। আপনার শ্রীমুখে শুনিয়াছি "লবণবিহীন ব্যঞ্জন, ভক্তিবিহীন ভজন" এই দুই বস্তুরই কোন আস্বাদ বা মূল্য নাই। এ দাসের ভক্তিহীন জীবনে তাহাই হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার শ্রীচরণে এ দাসের অচলা ভক্তি হয় ও দাসকে কৃপা করিয়া "আপনার" করিয়া লউন। আপনার নিকট আরও শুনিয়াছি যে গোপিনীদের মতন না হলে "তাঁর" হওয়া যায় না। যখনি ইহা মনে হয় তখন ভাবি আমার কিছু হলো না। কৃপাময় আপনার কৃপাই এ দাসেব একমাত্র সম্বল। আশীর্ব্বাদ করুন যেন নামে রুচি হয়, সদা নামরূপে মজিয়া থাকি ও ভাবে ডুবিয়া থাকি। জয় গুরু, জয় অধমতারণ।

আপনার শ্রীচরণ আশ্রিত চিরদাস

নরেন

যৌগিক তত্ত্ব

কুণ্ডলিনী চৈতন্য করিবার কৌশল—সাধক চিত্ত স্থির করিয়া অর্থাৎ চিত্ত শ্রীনামে ও শ্রীগুরুরূপে যুক্ত করিয়া নির্জ্জনে গোপনীয় গৃহমধ্যে সিদ্ধাসনে বা সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় নাসাপুট দ্বারা নাম সহ প্রাণ বায়ুকে ভিতরে আকর্ষণ করিয়া গুরু উপদেশে নাভির নীচে অপান বায়ুতে যুক্ত করিবে এবং ইহার দ্বারা গুরু কৃপায় সুষম্নার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া সঞ্চার হইবে ও সাধক আনন্দে ডুবিয়া যাইবেন, আপনার সত্বাও ভুলিয়া যাইবেন। এই ক্রিয়া গুরু সাক্ষাতে সহজে উপলব্ধি হয়। এই আনন্দের তুলনা নাই। ইন্দ্রিয়সুখ তুচ্ছ হয়। এ কারণ সাধকগণ জীয়ন্তে মরা হইয়া সদা এই আনন্দে ডুবিয়া থাকেন।

সুষম্নার ক্রিয়া যখন হয় তখন পৃষ্ঠদেশের মেরুদণ্ড মধ্যে পিপীলিকা পরিভ্রমণের ন্যায় শির শির করিবে এবং কুণ্ডলিনী শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তি উর্দ্ধে গমন করিবেন। সঞ্চার হইলে হাস্য, ক্রন্দন, কম্প, হুঙ্কার, দন্তপ্রতিঘাত, দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইবে।

এই ক্রিয়া চিত্ত নির্ম্মল না হলে হয় না। গুরু আজ্ঞা

ও নিষেধ-বিধি পদে পদে প্রতিপালন করিতে হইবে। যত শ্রীগুরুতে বিশ্বাস ও ভক্তি গাঢ় হইবে এবং নামেতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা হইবে তত এই ক্রিয়া সাধকের অতি সহজে হইবে ও সহজে হ্লাদিনী শক্তির আবির্ভাব হইয়া তাঁহার অনুভূতি হইবে ও সঞ্চার হইবে। সাধনকালে বিষয়ে মন নিযুক্ত থাকিলে ক্রিয়া হইবে না। এক মন হওয়া চাহি। ক্রমে একমনে নাম স্মরণেই প্রেমের সঞ্চার হবে ও আনন্দ হবে।

সাধন—উভয় নাসাদ্বারা নাম সহ নিঃশ্বাস (প্রাণবায়ু) নাভির নীচে আনিয়া গুহ্য-প্রদেশ হইতে উত্থিত অপান বায়ুর সহিত যোগ করিলে কুণ্ডলিনী সুষম্নার দ্বার পরিত্যাগ করেন এবং প্রাণবায়ু সুষম্নায় প্রবেশ করেন। এই ক্রিয়া মন চঞ্চল হইলে হইবে না। শ্রীগুরুপদে নজর রাখিতে হবে।

চিত্তের একাগ্রতাই সাধনে সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়। প্রাণবায়ুকে নাভির নীচে নামরূপ স্মরণ করিয়া পুনঃপুনঃ নামাইতে হয়। এইরূপ কৌশলে সঞ্চার হয় ও পরমানন্দ লাভ হয়। সদা বাহ্য বস্তুর অনুভববিহীন হলে চিত্ত নির্ম্মল হয়।

রাধাকৃষ্ণ—ভাবকৃষ্ণ, প্রাণ-রাধা অর্থাৎ ভাব ও প্রাণের উপরে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া সাধন করিতে পারিলে ভাব ও প্রাণ যুগলরূপে হৃদয়ে উদিত হয়। মন প্রাণ ঐক্য করিয়া নাম করিতে হয়।

মুক্তি—(১) মন বৃত্তিশূন্য হইলে লোকের বাসনা, দেহবুদ্ধি বা সংস্কার থাকে না। বাসনা ক্ষয় হইলে নির্ব্বাণ হয় ও বন্ধন থাকে না। ঐ অবস্থাই এই দেহেই মুক্তি। যাহার হৃদয়ে কোনরূপ বাসনা বা সংস্কার নাই ও সমস্ত শ্রীগুরুপদে অর্পণ করিয়াছে সে এই জীবনেই মুক্ত। সে শুভ অশুভ, মঙ্গল অমঙ্গল, আপদ বিপদ কিছুই জানে না অর্থাৎ শ্রীগুরু ছাড়া কিছুই জানে না।

(২) চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেই সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগের কারণস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের বহির্মুখতার নিবৃত্তি হইয়া যায়। এইরূপ নিবৃত্তি হওয়ার নাম মুক্তি। সংসারে ঐকান্তিক অনাশক্তির নাম মুক্তি। দেহ-জ্ঞানবিহীন হইয়া সদা যুক্ত অবস্থায় থাকার নাম মুক্তি।

সাংসারিক ভোগ অভিলাষ পূর্ণ না হইলে নিবৃত্তি হয় না। সদা গুরুপদে মতি রাখিয়া আসক্তিশূন্য হইয়া কার্য্য করিলে নিবৃত্তি আসে।

চিত্ত জয় করিবার উপায়—মন যদি ইষ্টদেবতার ধ্যান-কালীন কোন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হয় তাহা হইলে সেই বিষয় আত্মানুভাবে সম রস বোধে সর্ব্বত্র ইষ্টদেব অথবা ব্রহ্মময় ভাবিয়া চিত্ত ধারণা করিবে। এইরূপ করিলে বিষয় ও ইষ্টদেব কিম্বা বিষয় ও ব্রহ্ম-ভূমা বা একত্ববোধে চিত্তের ধারণা বৃদ্ধি পাইয়া অতি সত্বরেই চিত্ত জয় হইবে। এই ব্যতীত চিত্ত জয় করিবার

সুগম পন্থা নাই। সর্ব্বদা নাম করা ও শ্রীগুরুরূপ নেহার করিলে চিত্ত জয় হয় ও বিষয় বুদ্ধি নষ্ট হয়। সদা বাহ্য বস্তুর অনুভববিহীন হবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুকে অন্তরে প্রবেশ করিতে দিবে না।

ভূমা—যখন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এক হয়ে যাবে।
সেবা, সেব্য, সেবক এক হবে।
সাধ্য, সাধন, প্রয়োজন এক হবে।
তখন গুরুময় জগৎ দর্শন হবে।
সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম জ্ঞান হবে।

নেতি--সর্ব্বদা নেতি নেতি করিবে। অর্থাৎ ন-ইতি ন-ইতি করিতে করিতে শেষে বুঝিবে একমাত্রই তিনিই "ইতি"।

কারণ শরীর—সদা সন্তোষ শরীরের নাম কারণ শরীর।

দয়া—সর্ব্বজীবে ভালবাসার নাম দয়া।

পণ্ডিত—যে সমদর্শীন তিনিই পণ্ডিত। "মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা" জ্ঞান হয়। পর বলিয়া কেহ নাই।

অহিংসা—মন, বাক্য ও দেহদ্বারা সর্ব্বভূতে পীড়া উপস্থিত না করার নাম অহিংসা। সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন করিলে কে কার

হিংসা করিবে? ভেদবুদ্ধি যতক্ষণ ততক্ষণ হিংসা। যেখানে দ্বৈত নাই সেখানে হিংসা নাই। ভেদজ্ঞানবিহীন হলে সব আপন হইয়া যায়। "পরের আনন্দে আনন্দ অনুভব করার নাম অহিংসা"।

সত্য—মন, মুখ যেখানে এক এবং সরল চিত্ত ও অকপট বাক্য তাহাকে সত্য বলে।

সমাধি—চিত্তের ধ্যেয় বস্তুতে তন্ময়তা তাহার নাম সমাধি। ধ্যান গাঢ় হইলে ধ্যেয় বস্তু ও আমি এইরূপ জ্ঞান থাকে না। চিত্ত তখন ধ্যেয় বস্তুতে লীন হয়। তদাকারম: সেই লয় অবস্থা সমাধি।

ধারণা—বিষয়ান্তর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তকে আরোপণ করার নাম ধারণা। ধারণা স্থায়ী হইলে ধ্যান হয়। তৎপরে সমাধি।

প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ ভোগ্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। সেই বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রতিনিবৃত্ত করার নাম প্রত্যাহার।

প্রাণায়াম—প্রাণ ও অপান বায়ুর যোগকে প্রাণায়াম বলে। সুখাসনে বসিয়া মেরুদণ্ড, ঘাড় ও মস্তক সোজাভাবে

রাখিয়া হৃদয়মধ্যে শ্রীগুরুরূপ, নাম সহ ধ্যান করিতে হয়। ইহাকে রাজযোগ বলে।

দুইপ্রকার সমাধি—(১) **সবিকল্প,** যথা জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এই পদার্থত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্প সমাধি। পাতঞ্জল ইহাকে "সম-প্রজ্ঞাত" সমাধি বলেন।

(২) **নির্ব্বিকল্প সমাধি**—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এই পদার্থ-ত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের অভাব হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম নির্ব্বিকল্প সমাধি। পাতঞ্জল ইহাকে "অসম-প্রজ্ঞাত" সমাধি বলেন। এই অবস্থায় "ভূমানন্দ" হয়।

রাজযোগ—দ্বৈত বর্জ্জিত হইলে রাজযোগ হয়।

ব্রহ্মজ্ঞান—বাসনা, কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মনোবৃত্তি শূন্য না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান সমুদ্ভব হয় না। অথবা ভেদবুদ্ধিবিহীন বোধস্বরূপ হইয়া অবস্থানের নাম ব্রহ্মজ্ঞান।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব—শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ স্থাপন করেন, যথা—ব্রহ্ম হইতে জীব পৃথক করেন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বলেন। কিন্তু রামানুজ বলেন যে, ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক

নহেন। যেমন, সূর্য্য ও সূর্য্য-কিরণ, ফুল ও ফুলের গন্ধ, নদী ও নদীর হিল্লোল এক বস্তু। তবে আশ্রিতভাবে মাধুর্য্য আছে যেমন ব্রহ্মের জগৎ, অথবা জগতের ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও জগৎ দুই-ই সত্য। কেহ মিথ্যা নহে। উভয় উভয়ের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ।

তাঁর ইচ্ছা—সব "তাঁর ইচ্ছা" মনে করিলে সব গোল চুকিয়া যায়।

"সব তুঁহু হ্যায়" ও "সব তেরা হ্যায়"—এইরূপ মনে করিলে আর ভেদবুদ্ধি থাকে না।

শান্তি—"নামসে পেট ভরগিয়া" নামে পেট ভরিয়া থাকিলে সর্ব্বদাই শান্তির অবস্থা অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা শ্রীগুরুর নাম লয়েন তাঁহাতে শান্তি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। কোনই আকাঙ্ক্ষা নাই।

দয়া—সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতই জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ। জীবের চৈতন্য সম্পাদন জন্য দয়াময়ই নিষ্ঠুরতা সৃজন করিয়াছেন।

নির্ব্বাণ মুক্তি (কৈবল্য মুক্তি)—আত্মা (মন) যখন চৈতন্যে (শ্রীগুরুতে) প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন বিকার দর্শন হয় না। ঐরূপ নির্ব্বিকার বা কেবল হওয়াকে নির্ব্বাণ বা

কৈবল্য মুক্তি বলে। যখন ভেদবুদ্ধি ত্যাগ হইয়া অর্থাৎ দেহবুদ্ধি ত্যাগ হইয়া একমাত্র নিরুপাধি পরমাত্মাতে অর্থাৎ শ্রীগুরুতে প্রতীতি হইবে তখন হৃদয়-আকাশে অদ্বিতীয় পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হওয়াকে কৈবল্য মুক্তি বলে। তখন শুভ বা অশুভ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়। সকলই তাঁহার দান ও দয়া বলিয়া জ্ঞান হয়। সর্ব্বদাই আনন্দে অবস্থিত। সর্ব্ব বস্তুতেই শ্রীগুরুকে দর্শন হয়। সকলই ব্রহ্মের বিভূতি, ব্রহ্মের বিকার সর্ব্বত্র জ্ঞান হয়। সকলই তাঁহার ইচ্ছা, সকলই তাঁহার প্রসাদ জ্ঞান হয়। সর্ব্ব অবস্থাতেই আনন্দ—ইহাই নির্ব্বাণ অবস্থা। তাঁহার সুখে সুখী ভাব। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাব পোষণ করিলেই বদ্ধজীবে পরিণত হইবে। যে অনুগত সন্তান সে কখনও পিতামাতার বিরুদ্ধে যায় না। পিতামাতা যে ব্যবস্থা করেন সে তাহাতেই সুখী। যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, যে শরণাগত হইয়াছে, সে এই দেহেই জীবনমুক্ত। সদা গোপীভাব (আত্মহারা ভাব) পোষণ করিতে হয়।

চতুর্ব্বেদের সার তত্ত্বঃ—

(১) সামবেদ—“তত্ত্বমসি।”

(২) ঋগ্‌বেদ—“প্রজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম।”

(৩) যজুর্ব্বেদ—“অহং ব্রহ্মোস্মি।”

(৪) অথর্ব্ববেদ—“অয়মাত্মা ব্রহ্ম।”

এক অদ্বিতীয় শক্তি—এক অদ্বিতীয় শক্তিবিশেষকে ঋষিগণ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই পরমাত্মাই "সচ্চিদানন্দম্" এবং "জ্ঞানমনন্তম্"। তিনি আছেন বলিয়া "সৎ"; চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া "চিৎ"; এবং স্বয়ং পরিপূর্ণ বলিয়া "আনন্দম্"; তিনি পূর্ণ প্রজ্ঞাস্বরূপ বলিয়া "জ্ঞানমনন্তম্"। তিনি বিশ্বজগতের কর্ত্তা কিন্তু বিশ্বজগৎ রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন (বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ)। এই বিশ্বই তাঁহার রূপ। তিনি ভিন্ন জগতের অন্য কোন কর্ত্তা নাই। জগতে যাহা কিছু সেই পরমাত্মারই বিকাশ। অজ্ঞানতা বা ভ্রমবশতঃ আমরা জগতকে পরমাত্মা হইতে পৃথক জ্ঞান করি। কিন্তু বিবেক, বৈরাগ্য বা যোগ দ্বারা ব্রহ্ম ও জগতবস্তু এই প্রকার অজ্ঞান বা ভ্রম দূর করিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই সত্য যাহার চিত্তে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি সুখ দুঃখের অতীত মুক্তপুরুষ। তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না।

ব্রহ্ম—"যাহা হইতে জগত জন্মিয়াছে, যাহাতে স্থিতি করিতেছে এবং যাহাতে লীন হইবে তাহাই ব্রহ্ম।—বেদান্তদর্শন

প্রকৃতি ও পুরুষ—পরমাত্মার প্রকৃতি ও পুরুষ নামে দুইটী পৃথক ভাব আছে। প্রকৃতি সগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, ও তম

গুণাত্মক ; এবং পুরুষ নির্গুণ অর্থাৎ ত্রিগুণের অতীত এবং উভয়েই অনাদি। বিকারসমূহ ও গুণসকল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়।

প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত যথা—

(১) একভাগ **জড়াত্মক** এবং (২) অপর ভাগ **চেতনাত্মক**। এই চেতনাত্মক প্রকৃতি প্রাণিগণের দেহে জীবাত্মারূপে অবস্থিতি করে।

এই জড়াত্মক সগুণ প্রকৃতিই জগৎ কারণ বা জগতের স্রষ্টা এবং নির্গুণ পুরুষ উহার দ্রষ্টা ও ভোক্তা এবং প্রকৃতিকে জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারে প্রেরণ করেন।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট প্রকারে প্রকৃতি বিভক্ত। পরমাত্মার অধিষ্ঠানবশতঃ প্রকৃতি এই জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন।

সৃষ্টি—ব্রহ্ম চঞ্চল হইলে সৃষ্টি হয়। ব্রহ্ম কেন চঞ্চল হন তাহা তিনিই জানেন।

নির্গুণ উপাসনা—নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা উচ্চ অধিকারী ও জ্ঞানীদিগের জন্য। নিম্ন অধিকারীরা ও অজ্ঞানীরা ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বরকে উপাসনা করেন। সগুণ ঈশ্বরের

উপাসনায় চিত্ত নির্ম্মল হইলে পর তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি পান।

জীব জন্ম—২০ লক্ষ জন্ম—স্থাবর
৯ লক্ষ জন্ম—জলজ
৯ লক্ষ জন্ম— কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, কুর্ম্মাদি
১০ লক্ষ জন্ম—পক্ষী
৩০ লক্ষ জন্ম—পশু
৪ লক্ষ জন্ম—বানর

---

৮২ লক্ষ জন্মের পর মানুষ জন্ম।

মনুষ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকে। জীব পরে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয় এবং শেষে সৎকর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মযোনী প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞান—শাস্ত্র পাঠে যে জ্ঞান হয় তাহা মিথ্যা প্রলাপ মাত্র। উহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। বহির্মুখীন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে সমস্ত বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া (বাহ্য বস্তুর অনুভব-বিহীন হইলে তবে ইহা সহজ হয়) অন্তর্মুখীন করতঃ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতে সংযোগ করার নাম প্রকৃত জ্ঞান।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও

হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু, উপস্থ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহপূর্ব্বক সংগুরুর উপাসনার দ্বারা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন (ধ্যান) সহকারে ঘট-পট-মঠাদি যাবতীয় বিকারময় দৃশ্য পদার্থে নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া তৎ তৎ বস্তুব বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত একমাত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুমাত্র সত্য পদার্থ নাই—এইরূপ অনুভাবাত্মক যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, তাহার নাম জ্ঞান।

শুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের উচ্চস্তরে এক বস্তু বলিয়া প্রতীত হইবে। ভূমায় উপস্থিত হইলে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এক হইয়া যায়। দেহবুদ্ধিবিহীন হইয়া ভাবে ডুবিয়া যায়। "আমি কে" সে জ্ঞান থাকে না। নামরূপও ডুবিয়া যায়।

যোগ—জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগই যোগ। সদা নামে যুক্তই পরম যোগ।

গুরু বীজ—ঐং।

জ্ঞান তত্ত্ব

প্রণব—অ, উ, ম যোগে প্রণব।

অ —— নাদরূপ

উ —— বিন্দুরূপ

ম —— কলারূপ

"ওঁ" কার—— জ্যোতিস্বরূপ

সাধক প্রথম সাধন সময়ে নাদ-লুব্ধ হন, পরে বিন্দু-লুব্ধ হন, তৎপরে কলা-লুব্ধ হন ; সর্ব্বশেষে জ্যোতি-দর্শন। "ওঁ" নাদের প্রতীক।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি—ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই তিন নামে বিভক্ত হইয়া সর্ব্ব শরীরে চক্রে চক্রে ভ্রমণ করেন। এই শক্তি জীবনী শক্তি।

অজপা—২১৬০০ বার অজপা গায়ত্রী জপ জীব করিয়া থাকে। হংস শব্দ অজপা রূপ। শ্বাস পরিত্যাগকালে হং শব্দ হয় অর্থাৎ শিবস্বরূপ মৃত্যু সং শব্দ করে। ইহা শক্তিস্বরূপ
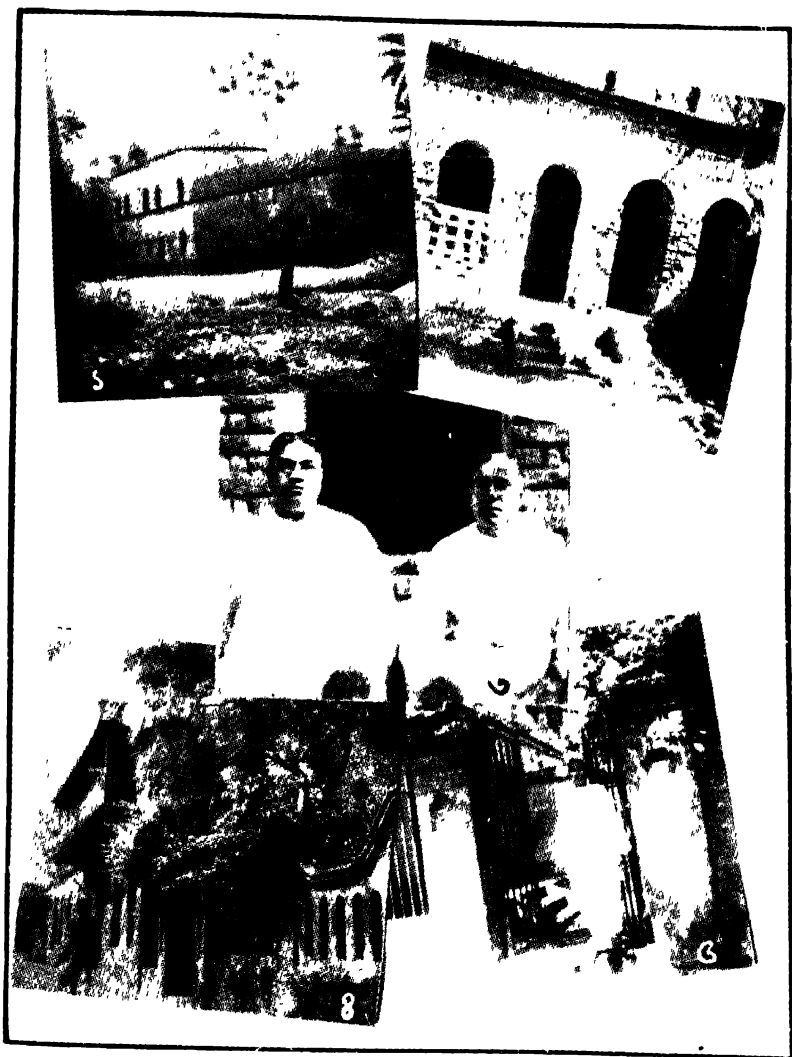
১
৩
৪
৫

হংস শব্দ সর্ব্বদা হইতেছে। "হংস" বিপরীতে "সোহং" শব্দ জীব সর্ব্বদা করিতেছে। ভক্তিমার্গে "তদীয়তা মদীয়তা" ভাব, ভাবসাগরে সকলই উল্টা। সেখানে বেদবিধি নাই। "উজান পথে করে আনাগোনা।"

নামে রুচি হইলে শ্বাস প্রশ্বাসে হরদম নাম অন্তরে আপনা-আপনি চলিবে। সদাই ভক্তের শ্রীগুরুকে স্মরণ, মনন ও নিরীক্ষণ হইবে।

যৌগিক কৌশল

দীর্ঘায়ু হইবার উপায়— ১। দিবাভাগে বাম নাসিকায় নিশ্বাস ও রাত্রিভাগে দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহা চাহি। যেদিকে নিশ্বাস বহিতেছে, সেদিক ফিরিয়া কাৎ হইয়া শুইলে একটু পরে অন্য নাকে নিশ্বাস বহিবে।

দীর্ঘ জীবন— ২। জিহ্বার অর্দ্ধেক ভাগ দন্তে চাপিয়া আধঘণ্টা প্রত্যহ রাখিবে। মুক্ত পদ্মাসনে বসিতে হয়।

৩। মুখে কাকচঞ্চু করিয়া নিশ্বাস লইয়া ঢোক গিলিয়া নাভিতে নিশ্বাস ধারণ করিয়া আস্তে আস্তে নিশ্বাস ত্যাগ করিলে হজম হয় ও দীর্ঘ জীবন হয়। মুক্ত পদ্মাসনে বসিতে হয়।

বিপদ—চিৎ হইয়া শুইতে নাই। শুইলে সুষম্নায় নিশ্বাস বহে ও কতপ্রকার বিপদ হয়।

বিভূতি—সাধকের বিভূতি আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠে কিন্তু তাহাতে মুগ্ধ হইতে নাই, বা অহঙ্কার করিতে নাই। তাঁর কৃপা মনে করিতে হয়। যে ভক্ত সে বিভূতি চাহে না, গুণকার্য্য করে না ও গুণে মোহিত হয় না। সে নির্ব্বিকাব ও শরণাগত। সদা শ্রীগুরুপদে স্থিত।

হজম—রাত্রে আহারের পর বামদিকে কাৎ হইয়া শুইলে ও দিবসে ডান দিকে শুইলে হজম হয়। এই কৌশলে উদরাময় ও অজীর্ণ হয় না।

দন্তরোগ—প্রত্যহ যতবার মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে ততবার দুই পাটি দাঁত একত্র করিয়া একটু জোরে চাপিয়া ধরিয়া রাখিবে। এইরূপে দাঁত দৃঢ় হইবে ও কোন দন্তরোগ হইবে না।

চক্ষুরোগ—(১) প্রত্যহ প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে মুখের ভিতর যত জল ধরে তত জল রাখিয়া অন্য জল দ্বারা চক্ষুতে বিশবার ঝাপট দিয়া ধুইয়া ফেলিবে।

(২) প্রত্যহ দুইবেলা আহারের পর আঁচাইবার সময় ঐরূপ অন্ততঃ সাতবার জল চক্ষুতে দিবে।

(৩) প্রত্যহ স্নানের সময় তৈল মর্দ্দন সময়ে আগে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখ তৈল দ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে তৈল মাখিবে। ইহাতে দৃষ্টিশক্তি সতেজ হয় ও চক্ষের পীড়া হয় না।

নীরোগ—সর্ব্বদা যাহার চিত্ত শুদ্ধ ও শ্রীগুরুতে যুক্ত এবং ইন্দ্রিয় সংযত, তাহার স্বাস্থ্য অটুট থাকে ও শীঘ্র বৃদ্ধ হইবে না।

বাঁশ বাজী—সংসারে অনাসক্তভাবে বাঁশবাজীর ন্যায় কার্য্য করিবে। ব্যবহারিকভাবে সব কার্য্য করিবে কিন্তু লক্ষ্য শ্রীগুরুতে রাখিবে। এক শ্রীগুরুই সত্য—আর সব অবস্তু।

দান—দান না দিলে অর্থাৎ "আত্মসমর্পণ" না করিলে বৃন্দাবনে প্রবেশ নিষেধ। যে "আত্ম-নিবেদন" করিয়াছে সে সর্ব্বদা আনন্দসাগরে ভাসমান।

দর্শন—এক মহাপুরুষ সর্ব্বদাই "শ্রীগুরুকে" চারিদিকে দর্শন করিতেন। সর্ব্বদা ভাবে থাকিতেন। কেবলই বলিতেছেন "ঐ গুরু"। আহা, এমন ভাব কবে হইবে!

চিত্তশুদ্ধি—সদা বাহ্যবস্তুর অনুভববিহীন হতে হবে।

শ্রীগুরুরূপ ও তাঁহার ধ্যান

১। "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি।
শান্তম শিবমদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।"

২। ওঁ ভূঃ ভুবস্ব তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোধীমহি ধীয়োয়ন প্রচোদয়াৎ ওঁ।"

৩। "মন শান্ত না হলে সত্যের উপলব্ধি হয় না। মন শান্ত হলে ভাব আসে, তারপর ধ্যান, তারপর সঞ্চার।" তখন শ্রীগুরুই সত্য জ্ঞান হয়। তিনি সত্যস্বরূপ।

৪। Light, more Light—"গেটে"

৫। অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিবে।

৬। "বাহ্যবস্তুর অনুভববিহীন হলে মন শান্ত হয় ও নামরূপে ডুবিয়া থাকে।"

"সদা গুরুকে নজরে রাখিতে হয় ও নাম জিহ্বায় লাগিয়া

থাকা চাহি। ইহার একমাত্র উপায় শ্রীগুরুর উপর ঐকান্তিক ভালবাসা ও নামে রুচি।

৭। "জীয়ন্তে মরা হইলে গুরুময় জগৎ দর্শন হয়।"

৮। **শিষ্যের লক্ষণ**—যে গুরু-আজ্ঞা, ভয়, ভক্তি, সেবা, বিশ্বাস, আনুকুল্য ও নিষেধ-বিধি প্রাণপণে প্রতিপালন করে ও একান্তভাবে নাম করে ও সদা শ্রীগুরুরূপ দর্শন করে সেই প্রকৃত শিষ্য।

৯। "পূর গৃহস্থ, চূর ফকির হবে।"

১০। "গোপিনীদের মতন না হলে হয় না।" গোপিনীরা আত্মসুখে সুখী নয়। সদা কৃষ্ণসুখে অর্থাৎ গুরু সুখে সুখী। তাহারা স্বর্গ বা নরক জানে না। বন্ধন বা মুক্তি জানে না। ইহাই আত্মনিবেদন ও শরণাগতি। সদা গুরুসুখে সুখী হ'তে হবে। তিনি যা বিধান করেন তাহা সন্তোষ চিত্তে অবিচলিত ভাবে গ্রহণ করিতে হবে। সুখ দুঃখ সকলি তাঁহার দান।

১১। "বহির্মুখীন ইন্দ্রিয়েরা ভোগ চাহে কিন্তু গুরু-কৃপায় ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখীন হলে, প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তিমার্গে আসিলে মন শান্ত হয় এবং নামরূপে ডুবিয়া যায়।"

মন্ত্রবাণী

বৌদ্ধ ধর্ম্মের "সেবাব্রত ভিক্ষু" ভক্তদের ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রার্থনার মন্ত্রবাণী ঃ—

হে বর্ণগন্ধ গুণের আকর মুণীন্দ্র ভগবান শ্রীগুরু! আমার সকল দোষ, ক্রুটি দিয়ে তোমার পূজা করি। তুমি আমায় শুভ্র কর—সুন্দর কর। আমার পূর্ব্ব জীবন, আমার পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি তোমায় সাক্ষ্য করে বিসর্জ্জন দিলাম। আমার এই নিষ্কলুষ নিষ্কাম দেহ, মন গ্রহণ কর তুমি। আমার সকল সত্ত্বা, আমার সমস্ত চেতনা তোমার দৃষ্টিতে, জ্যোতিতে আচ্ছন্ন হোক। আমি তোমার তুমি আমার। তুমি আমার স্বামী—ইষ্ট; আমি তোমার সেবিকা দাসী। পীড়িত আর্ত্তের সেবা করে, আমি তোমার সেবা কর্ব্বো প্রভু! কামচঞ্চল সংসারের আকর্ষণে কোন দিন বিচলিত হব না। ······হে বুদ্ধ, হে ধর্ম্ম, হে সঙ্ঘ! আমি তোমাদের শরণাগত! (আমার সর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা কর)।

ইহার পর ভগবানের পায়ে ক্ষমা চাহিয়া ১, ২, ৩নং মন্ত্র পড়িতে হয়।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ।
ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন।

শ্রীগুরু কৃপা করিলে তবে দর্শন হয়। তবে অনুভূতি হয়।

১। নমো বুদ্ধায় গুরবে,
নমো ধর্ম্মায় তারণে।
নমো সঙ্ঘায় উত্তমে।

২। বুদ্ধোয়ো স্খলিতো দোষো,
বুদ্ধো ক্ষমতু তং মম।

৩। নমো বুদ্ধ দিবাকরায়।
নমো গৌতম চন্দিমায়।
নমো 'নন্ত গুণন্নরায়।
নমো সাকিয় নন্দনায়। ......"মিলন পদ্ম"

পরিশিষ্ট

আমার অগ্রজ গুরুভাই সাধকপ্রবর শ্রীযুক্ত ৺গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়ের কথা গ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর আমি *"গভীর উচ্ছ্বাস"* নাম দিয়া তাঁহার একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-জীবন লিখিয়াছিলাম। উহা পড়িলে এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক নিগূঢ় বিষয় জানা যায়। আমি ঐ ক্ষুদ্র ধর্ম্ম জীবনী এই গ্রন্থের সহিত সন্নিবেশিত করিলাম। ভক্তগণ ইহা পড়িয়া আনন্দিত হইবেন।

গভীর উচ্ছ্বাস

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং কলিকাতার ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ,ওয়ার্কস লিমিটেডের প্রধান পরিচালক ও উপদেষ্টা মহাপ্রাণ শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয় ১৩৫৩ সাল, ১২ই শ্রাবণ, রবিবার ৮২ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়া আনন্দ-ধামে গমন করিয়াছেন ও শ্রীশ্রীগুরু পদে লীন হইয়াছেন। তিনি কোন মহাপুরুষের শিষ্য ছিলেন ও সত্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গোপনে সাধন ভজন করিতেন। উক্ত মহাপুরুষ ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহর নিবাসী মহাযোগী ও সাধকপ্রবর শ্রীশ্রীঠাকুর রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট যোগ সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঐ অঞ্চলে "মুখুয্যে মশাই" নামে খ্যাত।

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারীর গুরু-ভক্তি অতুলনীয় ছিল, সর্ব্বদা নামরূপে মজিয়া থাকিতেন। ১২ই শ্রাবণ তারিখে তিনি ভোরে নিদ্রা হইতে উঠিয়া সাধন ভজন করতঃ সকলের সহিত মিষ্ট ব্যবহার করিয়া আহারাদির পর নিয়ম মত কর্ম্মস্থলে যান ও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া বসেন। পরে সকলকে কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশাদি

দেন ও সরলভাবে সকলের সহিত সৎ আলাপ করেন। তিনি প্রত্যহই বৈকালে তাঁহার ঐ সাধন-ঘরে তাঁহার আসনে বসিয়া শ্রীগুরু স্মরণ করিতেন ও প্রাণায়াম আদি যোগক্রিয়া করিতেন। ঐদিন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময় তিনি নিয়মমত সাধনে বসেন ও পরমানন্দে গুরু-ব্রহ্মে যুক্ত হইয়া দেহরক্ষা করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্র ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সংবাদপত্র দিতে আসিয়া দেখেন তিনি সাধনে বসিয়া নিঃশব্দে দেহরক্ষা করিয়াছেন। জীবনে তাঁহাব সিদ্ধ দেহে কোন ব্যাধি হয় নাই। ইদানিং তিনি শ্রীগুরুর জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন; তাই ইচ্ছামত দেহরক্ষা করিয়া শ্রীগুরুতে লীন হইলেন।

তিনি আমার অগ্রজসদৃশ, পরম শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় গুরুভ্রাতা ছিলেন; ইহা ব্যতীত তিনি আমার অভিন্নহৃদয় দরদী বন্ধু ছিলেন; সুতরাং তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা আমি বিশেষ রূপে বিদিত ছিলাম। তাঁহার নামসিদ্ধ দেহে কোনরূপ গুণবুদ্ধি ছিল না। ব্যবহারিক হিসাবে তিনি সর্ব্ব পার্থিব কার্য্য করিতেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তের বৃত্তি ছিল না। সদা যুক্ত অবস্থায় থাকিতেন। তিনি মুক্ত পুরুষ ছিলেন, সে কারণ পরমানন্দে সাধন করিতে করিতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া আনন্দে শ্রীশ্রীগুরুপদে লীন হইয়া নিত্য লীলায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভাগবতী-তনু, দেহরক্ষার

পর কোনরূপ বিকৃত হয় নাই। দেখিলেই মনে হয় যেন শান্তিতে স্বাভাবিক ভাবে নিদ্রা যাইতেছেন। ইহাকেই বলে ইচ্ছা-মৃত্যু। ইঁহার শ্রীগুরুও এইরূপ সাধন করিতে করিতে দেহরক্ষা করেন। ইনিও শ্রীগুরুর ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীগুরুকে স্মরণ করিতে করিতে 'পরমানন্দে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র, কন্যা, সহধর্ম্মিণী, ন্নাতি, নাতিনী, বন্ধু, বান্ধব সকলেই তাঁহার পবিত্র দেহ স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কেহ কোনরূপ অশুচি মনে করেন নাই। তাঁহার গাত্রের উত্তাপ সমভাবেই ছিল। সিদ্ধ দেহ জ্যোতিপূর্ণ ছিল। বর্ষাকাল কিন্তু বৃষ্টি ছিল না। প্রকৃতি শান্ত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবাবু ভগবদ্ভক্ত, সত্যবাদী, শান্ত, প্রিয়ভাষী এবং অতি দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন, একারণ সকলে তাঁহাকে ভালবাসিত। গরাণহাটা অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই তাঁহার পবিত্র দেহ দর্শন করিতে আসেন ও যুবকগণ তাঁহাকে ফুলের মালা ও ফুলে বিভূষিত করিয়া চিত্র তুলিয়া তাঁহার পুত্রগণ সহ মধুর নাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মহাশ্মশান নিমতলা ঘাটে দেহ লইয়া আসেন। মহাত্মা গোষ্ঠবাবুর ভাগবতী-তনু অল্প সময়ের মধ্যেই ঘৃত ও চন্দনকাষ্ঠ সংযোগে ভস্মে পরিণত হয়েন। দেবতারা মহাপ্রাণকে স্বর্গে লইয়া গিয়া আনন্দে নিমগ্ন হইয়াছেন।

তিনি গুরুগত প্রাণ ছিলেন। শ্রীগুরু ছাড়া কিছুই জানিতেন না। শ্রীগুরুর কার্য্য শেষ করিয়া শ্রীগুরুপদে আশ্রয় লাভ করিয়া পরম শান্তি উপভোগ করিতেছেন—আর হৃদয়নাথের বিরহে কাতর থাকিতে হইবে না; প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নিত্যধামে শ্রীগুরুপদে অবস্থান করিতেছেন।

তিনি একজন মহা ধর্ম্মপ্রাণ, ভগবদ্ভক্ত ও ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা, মহত্ত্ব, ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত ছিল। তাঁহার গভীর ঈশ্বরানুরাগ এবং সহজ, সরল ও আড়ম্বরহীন জীবনযাপন প্রণালী সকলকেই বিশেষভাবে মুগ্ধ করিত। তিনি আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা, সৌজন্য, বদান্যতা, ক্ষমাশীলতা এবং ধীরতার জন্য, যাহারা একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আন্তরিক ভালবাসা ও ভক্তি লাভ কবিয়াছিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহার গোপন দান অসংখ্য অভাবগ্রস্ত লোকের দুঃখমোচন করিত। তিন মহাপ্রেমিক ও সমদর্শী ছিলেন, কেহ কখনও তাঁহাকে ক্রোধান্বিত হইতে দেখেন নাই। সকলকেই প্রিয় দেখিতেন। তিনি সত্যবাদী একনিষ্ঠ ভক্ত ও সাধক ছিলেন। জীবনে কখনও অসৎ কার্য্য কবেন নাই। কখনও মাংস, ডিম্ব ভক্ষণ করেন নাই, কখন কাহারও উচ্ছিষ্ট খান নাই। পরম

পবিত্র ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি সদা ব্রহ্মে স্থিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঋষি ছিলেন। তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন সেই সম্প্রদায়ের ভক্তগণ তাঁহাকে "জীয়ন্তে মরা" বলিতেন। "দেহ-বুদ্ধি বিহীন হইয়া সদাযুক্ত অবস্থায় থাকার" নাম "জীয়ন্তে মরা"।

তিনি ১৯৩৭ সালে মার্চ্চ মাসে পুরীধাম গমন করিয়া স্বর্গদ্বারে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মঠে ছিলেন। তথায় অনেক ভক্ত অবস্থান করিতেন। উক্ত মঠে শ্রীযুক্ত "শ্যামদাস বাবাজী মহারাজ" নামীয় একজন বৃদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। প্রত্যহ তাঁহাদের নামসংকীর্ত্তনাদি হইত। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী দে মহাশয়ের সহিত তাঁহারা ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেন। প্রসঙ্গ করিতে করিতে গোষ্ঠ বাবুর ভাবের উদয় হয় ও সাধন আতিশয্যে তাঁহার প্রেমোন্মাদ ভাব লক্ষণাদি দেখিয়া শ্রীশ্যামদাস ও অন্যান্য ভক্তরা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তির চক্ষে দেখেন। ক্রমশঃ তাহার এরূপ গাঢ় ভাব দেখিয়া ও স্থায়ী সঞ্চারী প্রেম দর্শন করিয়া উক্ত বাবাজী মহারাজ ও ভক্তরা তাঁহার "গোষ্ঠঠাকুর" নামকরণ করেন ও তাঁহাকে "রসের কেঁড়ে" বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। গোষ্ঠ বাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্তরা ও মহাজনেরা বড়ই কাতর হয়েন।

তিনি মহা সাধক ও প্রেমিক ছিলেন কিন্তু বাহিরে

কিছুই প্রকাশ করিতেন না। "অহং" ছিল না ও প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা না থাকায় ভাব গোপন করিতেন। মহাপুরুষের কৃপায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন কিন্তু বাহিরে ইহা প্রকাশ করিতেন না। তিনি কখনও কোন প্রার্থনা করিতেন না, ভগবানে "আত্মনিবেদন" করিয়া শান্তি উপভোগ করিতেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে সকলেই মুগ্ধ হইত। তিনি মিতভাষী ছিলেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণে বাংলা দেশে একজন স্বদেশহিতৈষী, ত্যাগী, দানী, ও সুসাহিত্যিক হারাইয়াছেন। শিশুসাহিত্য জগতে তাঁহার রচিত অনেক পুস্তক আছে। তাঁহার মুদ্রণ সম্বন্ধীয় *"প্রিন্টার্স গাইড"* পুস্তকখানি সুধীসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বাংলাভাষায় আর দ্বিতীয় নাই। বাংলাদেশে তাঁহার এই দান চিরদিন অক্ষয় কীর্ত্তিরূপে বিরাজ করিবে।

অল্পদিন হইল যুবকবৃন্দকে সহজে ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুদ্রণ কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় "ইষ্টার্ণ স্কুল অফ্ প্রিন্টিং" নামে যে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা তিনিই স্থাপন করিযাছেন।

তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী, তিন উপযুক্ত পুত্র, দুই কন্যা এবং বহু পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন।

১৩।৮।৪৬ তারিখে "হিন্দুস্থান ষ্ট্যানডার্ড" নামক সংবাদ পত্রে গোষ্ঠ বাবুর দেহরক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়, যথা ঃ—

"The death occurred on July 28 of Sj. Gosto Behari Dey, Writer and Senior Director of the Eastern Type Foundry & Oriental Printing Works, Ltd., Calcutta, at the age of 82.

Sj. Dey was a man of lofty ideals. His piety and simple way of living won the love and respect of all who knew him. His private charities were many.

He was Founder of the Eastern School of Printing, recently started in Calcutta for training young men in the printing line. The "Printers Guide" written by him in Bengali is a unique book of its kind.

He is survived by his wife, three sons, two daughters, many grand-sons, and grand-daughters."

তাঁহার অশেষ গুণ ও অধ্যবসায় ছিল। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় নন্দলাল দে মহাশয় একজন প্রবীণ ও বহুদর্শী চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার কতকগুলি ফলপ্রসূ ঔষধ ছিল। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবাবু উক্ত ঔষধগুলি প্রস্তুত করিয়া দরিদ্র এবং দুঃস্থ ব্যক্তি বিশেষকে দান করিতেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এমনকি লিখিতেও পারিতেন। বৃদ্ধ বয়সে এরূপ অধ্যবসায় প্রশংসার যোগ্য। গ্রাম্য কথা বলিতেন না। সকলকে লইয়া সৎ আলোচনা করিতেন, অবসর পাইলেই নানা সৎগ্রন্থ লিখিতেন ও প্রকাশ করিতেন। নির্জ্জন সময়ে নামরসে মজিয়া ভাবে বিভোর থাকিতেন।

তিনি প্রত্যহ বৈকালে তাঁহার নিয়মিত কার্য্য শেষ করিয়া "বিডন উদ্যানে" পরিভ্রমণ করিতে যাইতেন। তথায় তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধু ও সজ্জন ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত একস্থানে বসিয়া তাঁহার মুখনিসৃত সৎকথা শ্রবণ করিতেন ও বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীমদভাগবৎ, গীতা প্রভৃতির নিগূঢ় ব্যাখ্যা ও ভাব শ্রবণ করিয়া মোহিত হইতেন এবং অনেকে জ্ঞানলাভ করিতেন। তিনি কোন দিন উদ্যানে না আসিতে পারিলে সকলেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন ও তাঁহাকে পাইবার জন্য উৎসুক থাকিতেন। আজ তাঁহার বিহনে উদ্যান ম্রিয়মান ও তাঁহার বন্ধুরা এবং গুণমুগ্ধ সঙ্গীরা সকলেই কাতর।

কলিকাতা বণ্ডেল রোডে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু ভগবদ্‌ভক্ত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বাস করেন। তিনি কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ। তাঁহার "নবীন আশ্রমে" সন্ধ্যার পর সৎ সঙ্গ ও ভজনাদি হয়। বন্ধুবরকে দেখিবার জন্য শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বাবু মধ্যে মধ্যে আমাকে লইয়া উক্ত আশ্রমে যাইতেন। তথায় যে সব ভগবদ্‌জনেরা থাকিতেন তাঁহারা তাঁহার গভীর ভাবপূর্ণ বাণী শ্রবণে ও তাঁহার সহিত ভজনাদি করিয়া ভাবে মুগ্ধ ও বিভোর হইতেন। আজ সকলেই তাঁহার সঙ্গসুখে বঞ্চিত হইয়া বিষাদিত হইয়াছেন কিন্তু তিনি নির্গুণে অবস্থিত হইয়া গোপী-ভাবামৃত পান করিয়া সাধন অবস্থায় আনন্দধামে প্রবেশ করিয়া হৃদয়নাথের সহিত মিলিত হইয়াছেন, ইহা অনুভব করিয়া ভগবদ্‌জনেরা সকলেই মহা আনন্দিত ও ধন্য হইয়াছেন। আহা! এমন সৌভাগ্য আমার কবে হবে জানি না। মনে সদাই করি—"গুরু এবে পার কর মোর তরণীখানি।" তিনি যে কেবল সাহিত্যিক ছিলেন তাহা নহে, দার্শনিকও ছিলেন।

একদিন বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল, তাহাতে তিনি হিন্দুবিবাহে যে ঈশ্বরের গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন, যথা, "হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্মবন্ধনে গাঁথা। এই ধর্ম্মবন্ধন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মিলনে হ'য়ে থাকে। শাস্ত্রে

কথিত আছে পুরুষ ও প্রকৃতি মিলনে এই বিশ্বের সৃষ্টি। পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ প্রকৃতি নামে অভিহিত। দৃশ্যমান এই জগতে যাহা কিছু দেখা যায় সবই প্রকৃতির অন্তর্গত। পুরুষ এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। ইহ সংসারে স্ত্রী ও পুরুষ ব'লে যে ভিন্ন ভাব ধারণ করি সে ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সেই একমাত্র পুরুষ কে? উত্তরে এই কথাই বলতে হয়, তিনি মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণীর মধ্যে প্রকট নহেন, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মধ্যেই তিনি প্রকট। তাঁকে পাওয়ার কি উপায় নাই? আছে। ভক্তি, বিশ্বাস, কর্ত্তব্য-পালন ও নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারাই অচিন্তনীয় পুরুষকে পাওয়া সম্ভব হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান, স্বামীই ইষ্টদেবতা ভগবান। স্ত্রীলোকে সংসারের কর্ত্তব্যপালনে, স্বামী-সেবা, গুরুজনদিগের সেবা, বিশ্ব-মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে ভগবানের চরণে অচলা ভক্তি ও একান্ত বিশ্বাস রেখে সংসার-পথে চলতে থাকে এবং প্রেয় শ্রেয় লাভ ক'রে ইহ ও পরকালের কল্যাণ অর্জ্জন করে ও সকলের প্রিয়ভাজন হ'য়ে থাকে।" এই জ্ঞানপূর্ণ গভীর ঐশ্বরিক ভাব প্রত্যেক নরনারী গ্রহণ করিলে সংসার যে সুখের ও আনন্দের স্থান হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু সমাজে গার্হস্থ্য জীবনই স্পৃহনীয় ও পূজ্য, তদসম্বন্ধে একদা তিনি নিম্নলিখিত গভীর অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

১
২
৩
৪
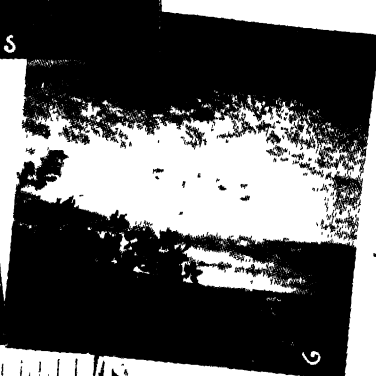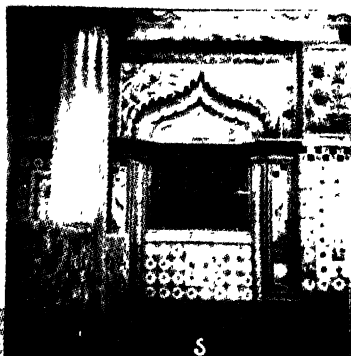
কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের
শ্রীশ্রীসতীমার সমাধি মন্দির ও ডালিমতলা

১। শ্রীশ্রীসতীমার সমাধি মন্দির, ঘোষপাড়া।

২। শ্রীশ্রীসতীমার ডালিমতলা, ঘোষপাড়া।

৩। পবিত্র হিমসাগর, ঘোষপাড়া।

৪। ফকির রামশরণ পাল মহাশয়ের সমাধি মন্দির,
ঘোষপাড়া।

"পুরুষ ও প্রকৃতি নর-নারীরূপে জগতে বিদ্যমান। নারীই নরের সঙ্গিনী। এই নর-নারী ধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ হইলে ধর্ম্মের মিলন বলে। এই ধর্ম্মময় মিলনই নর-নারীর জীবনকে ন্যায়, সত্য, ক্ষমা, দয়ায় ভূষিত করিয়া তুলে, স্বার্থান্ধ জীব এ পুণ্যময় জীবনের গুণগরিমা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। দুর্লভ মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়া যদি প্রকৃত মনুষ্যত্বই লাভ না হইল, তাহা হইলে এ জীবনধারণের সার্থকতা কি?

মনুষ্য সমাজে সাধারণতঃ দুইটি দল দেখা যায়। আবার এই দুইটি দলে নিত্যই সংঘর্ষণ ঘটিয়া থাকে। একদল অসুর-ভাবাপন্ন ও অপরটি দেবভাবাপন্ন। অসুরভাবাপন্ন দলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদিজনিত উদ্ধতভাবের পরিপুষ্টি, আর দেব-ভাবাপন্ন দলে ক্ষমা, সত্য, দয়া, ন্যায়, সরলতা প্রভৃতির কমনীয় ছবির সমাবেশের প্রাধান্য দেখা যায়। এই দেবাসুরভাব নর-নারী উভয়ের মধ্যেই দেখা যায়,—কেননা, নর ও নারী সমাজের দুইটি অঙ্গ। সুতরাং একের পুষ্টিতে অন্যের পুষ্টি, একের ক্ষীণতায় অন্যের ক্ষীণতা, এইরূপ হ্রাস-বৃদ্ধির, উন্নতি-অবনতির সদসদ্‌বৃত্তির ফলাফল দেখা যায়। বাস্তবিক যে সমাজে আসুরিক বৃত্তিগুলির ঘনসমাবেশ, সে সমাজ হেয়,—ঘৃণ্য; আর যে সমাজে দেববৃত্তির প্রকট ছবির ঔজ্জ্বল্য দেখা যায়, সে সমাজ স্পৃহনীয়

ও পূজ্য। তাই হিন্দুসমাজ গৃহে গৃহে নারীদিগকে দেবী-প্রতিমা গঠনে গড়িতে সচেষ্ট হয় ও স্বর্গীয় শান্তিবারি-সিঞ্চনস্নিগ্ধতায় গার্হস্থ্য জীবন লোভনীয় করিয়া তুলে। সরলতায় স্নেহশুশ্রূষায় প্রেমভক্তির প্রকৃত দেবীপ্রতিমা হিন্দুগৃহেই দেখা যায়।" শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়ের উল্লিখিত গভীর ভাব যদি হিন্দু সমাজে প্রত্যেক নরনারী আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করিয়া সংসার ঐরূপ ভাবে গঠন করেন, তবে এই সংসার ও সমাজ কত সুখের হয় তাহা বলা যায় না ও হিন্দু গার্হস্থ্য জীবনই যে প্রকৃত সুখের ও ধর্ম্মের স্থান তাহা সহজেই অনুমেয় হয়।

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবাবু বলিতেন—"মৃত্যুতে শোক করিতে নাই। আনন্দ হ'তেই জীব জন্মগ্রহণ করে, আনন্দকে ধ'রে জীব বাঁচিয়া থাকে, মৃত্যুর পরে আনন্দেই প্রবেশ করে।" ১৩৪৩ সালে রামতনু বসু লেনস্থ তাঁহার আত্মীয় মাননীয় পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয় পরলোক গমন করেন; উক্ত পরলোক গমনের শোকে "সান্ত্বনা" দিবার জন্য শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবাবু মৃত্যু সম্বন্ধে যে সুন্দর গভীর ভাবপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া ও মুদ্রিত করিয়া আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা দেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ উহা পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই:—

"মৃত্যু কি তা কেউ জানে না, জানবার কোন উপায়ও

নাই। মৃত্যুর ঘটনা মানুষ দেখে, কিন্তু মৃত্যুকে জানে না—কেননা, যা জীবনের বিপরীত, জীব তাহা ধারণা করিতে পারে না।

পরের মৃত্যু আমাদের মনে একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি জাগরিত করে মাত্র এবং সে অনুভূতি জীবধর্ম্ম বেশীক্ষণ প্রশ্রয় দেয় না। কিন্তু যে প্রিয়জনের নিশ্বাস নিজেরই শ্বাস বলে মনে করি, যার হৃদ্স্পন্দন নিজেরই স্পন্দন বলে বোধ করি,—মৃত্যু যখন তাকে করাল হস্তে গ্রহণ করে, তার বিস্ফারিত চক্ষু-তারকা স্থির জ্যোতিহীন হয়ে যায়; তার প্রাণবায়ুর শেষ শ্বাস-নির্গম প্রত্যক্ষ করি,—তখন কি দেখি, কি অনুভব করি? আমরা দেখি এবং অনুভব করি, একটা জীবনের অবসান হ'ল। বুঝি, যে ছিল সে আর নাই। এই পরম সত্য তখনই উপলব্ধি করি— উপলব্ধি করি আমি বেঁচে আছি। শবদেহ বুকে চেপে ধরি, আবার বুকে হাত বুলাই, কারণ বাকি যা কিছু তাহা এই দেহ। ভুলে যাই, যে গেল, সে এ দেহটা নয়, আরও কিছু। দেহের দিকে না তাকিয়ে তার আত্মার প্রয়াণ-পথ কল্পনা করিতে পারি না। জীবন এ দেহের ধর্ম্ম, জীবিতের মূর্ত্তি ঐ দেহ, ঐ মূর্ত্তির রহস্যময় প্রাণবায়ু মহা শূন্যে বিলীন হয়েছে—ইহাই আমাদের মৃত্যু সম্বন্ধে চরম জ্ঞান। যে শোক আমরা করো থাকি, তাহা সুখবোধের বিপরীত একটা দুঃখ বোধ মাত্র—নানা

যন্ত্রণার মত একটা যন্ত্রণা। মানুষ আত্মধর্ম্মী ও আত্মব্রতী, তাই যেখানে তার আত্মপ্রীতির বিঘ্ন ঘটে, সেখানেই শোক ও দুঃখ। তার জীবদ্দশায় আমরা যেরূপ আনন্দ পেতাম, যেরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতাম, সেরূপ আনন্দের, সেরূপ সুখ স্বাচ্ছন্দের মূলচ্ছেদ হয়েছে বলেই আমাদের ক্রন্দন ও শোক।

মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবতে গেলে, মনের মধ্যে একটা অন্ধকারময় শূন্যমাত্র অনুভব করি। অথচ শূন্যতার কল্পনাও জীব ধর্ম্মের বিরোধী। তাই আমাদের আর্য্য ঋষি তাঁর অখণ্ড শাশ্বত জ্ঞানের দ্বারা সেই শূন্যতাকে ভরিয়ে, অন্ধকার দূর করে বলছেন—ওরে, মৃত্যু প্রকৃত পক্ষে শোক দুঃখের কারণ নয়, মৃত্যু প্রেমের লীলা—প্রেমের খেলা। আমরা মরছি, আনন্দ থেকে আনন্দের দিকে চলেছি—আমাদেব প্রিয়জন মরছেন, প্রেম স্বরূপের প্রেমের আজ্ঞায় আনন্দ হতে আনন্দে চলেছেন, তবে আর শোক কিসের?

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দো জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

আনন্দ হতেই জীব জন্মগ্রহণ করে, আনন্দকে ধরে জীব বাঁচিয়া থাকে, মৃত্যুর পরে আনন্দেই প্রবেশ করে।

ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁম্।

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবাবু সাধনায় বসিয়া আনন্দে স্থিত হইয়া পরমানন্দে আনন্দময়ের সহিত মিলিত হইয়া উপরোক্ত মহাবাক্যের ও ভাবের সত্যতা প্রদর্শন করিলেন ও সকলে তাহা উপলব্ধি করিলেন। ইহাকেই বলে, "জপ তপ কর কি? মরতে জানলে হয়!" তিনি সত্যের সাধন করিয়া গিয়াছেন। "সত্য"ই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল।

ঈশ্বরে তাঁহার এত বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল যে তিনি সময়ে সময়ে ঈশ্বরের আদেশ বা আজ্ঞা অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করিতেন। ১৯৪২ সালে যখন কলিকাতায় বোম পড়ার আশঙ্কা হইয়াছিল তখন তিনি ৺কাশীধাম হইতে আমায় লেখেন যে—"উপস্থিত আপনি বাড়ী ছাড়া হইবেন না; বাড়ী ছাড়া হইবার প্রয়োজন নাই জানিবেন।" বাস্তবিক তাঁহার অনুভূতি সত্য হইয়াছিল। তিনি সদা ব্রহ্মে বিচরণ করিতেন কাজেই তাঁহার অনুভূতি সত্য হইত। তিনি প্রচ্ছন্নবেশী মহাঋষি ছিলেন।

আমাকে তিনি যে সকল পত্র লিখিতেন তাহা গভীর ভাবপূর্ণ, তাহার দু' একটি অংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। পাঠকগণ পড়িয়া নিশ্চয় তৃপ্তি লাভ করিবেন। তাঁহার ভাবের গান যাহা তিনি আত্মহারা অবস্থায় গাহিতেন তাহাও নিম্নে দিলাম, বুঝিবেন তিনি কত উচ্চ অঙ্গের সাধক ছিলেন:—

১। শ্রীশ্রীগুরুদেব যে সত্য পথ দেখিয়ে গিয়েছেন সে সত্য পথ ধরে থাকতে পারলে আর কোন আকাঙ্ক্ষাই থাকে না

২। অনেক ভাগ্যে "জীয়ন্তে মরা" হয়। গুরুতে আত্মহা না হলে উক্ত অবস্থা হয় না। তাঁর দয়া ছাড়া উপায় নাই।

৩। মন্ত্র, গুরু, বস্তু তিনে এক, একে তিন। এই জ্ঞ যেন সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকে।

৪। শোনা এক কথা, আর বোঝা আর এক কথ আবার বোঝা এক কথা, আর ভজা আর এক কথা। অ ভজা আর এক কথা, আর মজা আর এক কথা।

৫। "ভাবের অঙ্গ প্রেমের গঠন।" (এইরূপ ভবে ভাব-দেহ হওয়া চাই)। বলিতেন—"ভাবে ভরল তনু হর গেয়ান"—সদাই ভাবে থাকিতেন। ভাব সমাধি হইত।

৬। ভাবে ডুবে থাকরে আমার মন,
ভাবের অগাধ জলে ডুবে তলিয়ে গেলে,
হৃদকমলে দেখতে পাবি মানুষ রতন।

৭। "ভাবে ভরল তনু হরল গেয়ান,
পুরুষ প্রকৃতি হয়ে ভজ ভগবান।"

৮। "ডাকলে বঁধু পাইনে সাড়া,
না ডাকতে বড় আপনি এলে।
ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি,
ধরা কি যায়, কভু ধরা না দিলে।"

৯। "গুরু গুরু সবাই বলে, গুরু চেনা সহজ নয়,
যে চিনেছে সে মজেছে, সে কভু জীয়ন্ত নয়।"

১০। "গোপিনীদের মতন না হলে হবে না।"
(গোপী অর্থাৎ আত্মহারা অবস্থা এবং আত্মসুখে সুখী নয়, সদা গুরুসুখে সুখী তাহাকে গোপী বলে—Self-less.)

১১। Always keep the fire burning.

১২। "ভাব স্বভাবে" পরিণত করতে হবে অর্থাৎ এই কুটিল স্বভাবকে নামরূপ ভাবরসে মজে থেকে প্রেমিকে পরিণত হতে হবে। গুরুগত প্রাণ হওয়া চাই—নিজেদের পার্থিব সুখ দুঃখের দিকে একবারও দৃকপাত না করে সর্ব্বদা ভগবানে, গুরু-প্রেমে মজে থাকতে হবে—পাগল হতে হবে। তা'হলেই এই ভাব স্বভাবে পরিণত হলো।"

১৩। "পুর গৃহস্থ, চূর ফকির" অর্থাৎ বহির্ভাগে পুরো গৃহস্থালি করবে কিন্তু মনে মনে চূর্ণ ফকির হবে। ব্যবহারিক সব করবে কিন্তু মোক্ষ্য বস্তু তিনি। সেই দিকে সর্ব্বদা নজর রাখবে।

১৪। "বাহ্যে যে রূপ দেখ, সেও কিছু নয়,
অন্তরে যে রূপ দেখ, সেও হত হয়।
গোপী ভাবামৃত পানে যার লোভ হয়,
বেদ, ধর্ম্ম ত্যজি তারে সত্যেরে ভজায়।"

১৫। "সাধন সম্পন্ন আমার হবে কত দিনে,
ত্যজে দেহ হয়ে স্নেহ মগ্ন হব তব শ্রীচরণে।"

এর অর্থ—"আমার হস্ত কঠিন, এ কঠিন হস্তে হে গুরু, প্রভু! তোমার সেবা করলে পাছে তোমার অঙ্গে ব্যথা লাগে, তাই স্নেহ বা তৈল হ'য়ে তোমার শ্রীচরণে মজে থাকব। তা হ'লে তোমার দেহে কোন ব্যথা লাগবে না।"

কি গভীর ভাব, কি গভীর সাধনা। এরূপভাবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে। এরূপ সিদ্ধিলাভ করাকে গোপীভাব বলে।

১৬। "আজ সত্য, কাল মিথ্যা, বিধর্ম্ম,
আজ সত্য, কাল সত্য, সধর্ম্ম,
সত্য বল, সঙ্গে চল।"

১৭। "গুরোঃ' কৃপাহি কেবলম্।"

১৮। জয় গুরুজীর জয়, গাও গুরুজীর জয়!
শোকের হোক ক্ষয়, মৃত্যুর হোক লয়,
গাও গুরুজীব জয়!
নাহি শোক নাহি ভয়!

১৯। "মন গুরু বল, গুরু বল,
জয় গুরু, জয় গুরু বলে,
ভবসিন্ধু পারে চল।"

২০। "এতরূপ ভাব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে অর্থাৎ এই চৌদ্দ পোয়া দেহের মধ্যে ভাবের অঙ্গ প্রেমের গঠন ফোটাতে হবে, তবেই না গোপীভাব আপনি আপনি ফুটে উঠবে।" ইহা কি গভীর ভাব, কি গভীর সাধনা! শ্রীগুরু মধ্যে তাঁহার গোপীভাবের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল।

২১। দরদী দরদী বিনে প্রাণ বাঁচে না।
যেজন দরদী হয় দরদ বোঝে,
বে-দরদী ভাব জানে না॥

২২। অসাধ্য সাধন হে নাথ, এ'ত হবার নয়।
ভরসা কেবল মাত্র আপনি, তুমি দয়াময়॥

২৩। "ধর্ম্মযাজন ত' অনেকেই করে থাকেন কিন্তু কয়জন স্বধর্ম্মজনের প্রতি সুখে দুঃখে সকল বিষয়ে এক মন, এক প্রাণ হয়ে মেলামেশা করে থাকেন? আপনাতে এই ভাব পূর্ণ বিদ্যমান। ভালবাসা জিনিষটা ছেলেখেলা নয়। দুটি মিষ্ট কথা বলিলেই ভালবাসা হয় না। অন্তর হ'তে যে ভালবাসা উদ্ভূত হয় সে ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা।"

২৪। "ভবসাগর অপার। এপার ওপার হওয়া যায় না। তবে পার হবার উপায় কি নাই, আছে। ভবসাগরে যে সব জীব আছে, সেই সব জীবের মধ্যে কোন কোন জীব সদুপদেশে বা সদগ্রন্থ পাঠে কিছুক্ষণ জগৎ-সংসার ভুলে যায়, আবার পরক্ষণে ভবসাগরে পড়ে হাবুডুবু খায় ও সংসার-চিন্তায় জর্জ্জরিত হয়। এই সব জীবের মধ্যে কোন কোন জীবের গুরু বা ব্রহ্ম কৃপায় পালক ও ডানা জন্মে। সেই ডানার বলে কিছুক্ষণ শূন্য সম্ভোগ

করে। আবার ডানার বল কমে গেলে ভবসাগরে পড়ে হাবুডুবু খায়। এইরূপ অভ্যাস বা সাধন করতে করতে যখন জীব স্থির বাতাসে গিয়ে পড়ে তখন আর ভববন্ধন থাকে না, ভবসাগরে পড়ে সে হাবুডুবু খায় না। ভগবৎ প্রেমে বিভোর হয়ে কালাতিপাত করতে থাকে।"

২৫। "ঢেঁকিতে কুটবে, কুলোতে ওড়াবে, তার ভিতর থেকে হাত জোড় করে বল্‌তে হবে—

আমি তোমারি;
তোমারি, তোমারি,
সম্পদে তোমারি,
বিপদে তোমারি,
জীবনে তোমারি,
মরণে তোমারি—
শুধু তোমারি, শুধু তোমারি।"

২৬। "ভক্ত বড় শক্ত,
অতিথি রইল বসে,
গাছের ফল গাছে রইল,
বোঁটা গেল খসে।"

২৭। যা শুনেছি নির্জ্জনে বসি,
সেত কথার কথা নয়, সুধা রাশি।

২৮। কি ভয় মরণে আমার,
যদি তুমি সঙ্গে রও।
চাহিলে দেখি তোমায়,
জিজ্ঞাসিলে কথা কও॥

আরও কত মধুর বাণী তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি সমুদয় লিখিলাম না। তবে তাঁহার উদার হৃদয়ের ভাষাতে বুঝা যায় তিনি নির্লিপ্ত, নির্গুণ সাধক ছিলেন। কোন সংস্কার ছিল না। বহির্ভাগে পুরো গৃহস্থ ও কর্ম্মী ছিলেন, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদা শ্রীগুরুপদে লীন হইয়া থাকিতেন। ব্যবহারিক হিসাবে সর্ব্ব কার্য্য করিতেন, কিন্তু লক্ষ্য ছিল সেই পরম বস্তু। বলিতেন, "গুণ টানিয়া পারে যাওয়া যায় না, কিনারা দিয়া যাওয়া যায়।" অর্থাৎ দেহবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া যুক্ত অবস্থায় না থাকিলে গুরু-ব্রহ্মের অনুভূতি হয় না। সেকারণ নির্গুণ না হলে অবস্থা লাভ করা যায় না। নৌকায় পাল না দিলে পরপারে যাওয়া যায় না। গুণবুদ্ধির দ্বারা নির্গুণ বস্তু লাভ করা যায় না। তিনি মনে মনে ত্যাগী ও যোগী ছিলেন।

তাঁহার অনেক গোপন দান ছিল এবং এই দানের জন্য একটি আলাদা "ভিক্ষার ঝুলি" ছিল। তিনি তাহা হইতে গোপনে দান করিতেন, কেহ রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইত না। তাঁহার হৃদয় পরদুঃখে বড়ই কাতর হইত। তিনি কোনরূপ অনুসন্ধান না করিয়া দান করিতেন, এমনকি অনেককে মাসিক বৃত্তিও দিতেন। কেহ ঠকাইয়া লইয়াছে জানিতে পারিলে তিনি হাসিতেন। গোপনে দান করিতেন সেকারণ আমি কাহারও নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

কাঁচরাপাড়া গ্রামে প্রতি দোলের সময় শ্রীশ্রীঠাকুরবাড়ীতে বহু বৈষ্ণব ও কাঙ্গালী ভোজন হইয়া থাকে। তিনি নিয়মিতরূপে সেই সদাব্রতে উপস্থিত হইয়া, যথাসম্ভব উহাতে সাহায্য করিয়া ও ভোজন দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন, কিন্তু কাহাকেও পরিচয় দিতেন না। তাঁহার "অহং" ছিল না।

একজন ভগবদভক্ত চক্ষুপীড়ার চিকিৎসার জন্য তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি তাহাকে হাসপাতালে থাকিবার সাহায্য করেন ও চশমা কিনিয়া দেন। সেই ব্যক্তি পুনরায় তাঁহার স্বর্গারোহণের পর যশোহর হইতে আসিয়া তাঁহাকে না পাইয়া বড় দুঃখিত হন। গোষ্ঠবাবুর পুত্রেরা পরিচয় পাইয়া

পুনরায় চশমা বদল করিবার জন্য তাহাকে সাহায্য করেন। কোন দেবালয়ের সংলগ্ন একটি পুষ্করিণীতে জলের অভাব হওয়ায় যাত্রীদের জলকষ্ট দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে ও ঐ পুষ্করিণী সংস্কার করিয়া দেন। এইরূপভাবে তিনি অনেক গোপন দান করিতেন যাহা কাহারও জানিবার উপায় ছিল না।

প্রতিষ্ঠার বাসনা না থাকায় তাঁহার সৎকার্য্য সমস্তই গোপনে থাকিত। এমন কি পুত্রেরাও কেহ জানিত না। তাঁহার স্বর্গারোহণের পরদিবস এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া শোক করেন ও বলেন যে, তাহার দেশের কুঁড়ে ঘর নষ্ট হওয়ায় শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে মহাশয়ের নিকট আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করায়, তিনি বলেন যে, "কত টাকা হইলে ঘর মেরামত হবে?" তাহাতে তিনি একটী আনুমানিক খরচ বলায় তিনি তাহাই তৎক্ষণাৎ দান করেন। তিনি এই টাকা দিবার সময় তাহাকে বলিয়া দেন যে, "এই টাকার কথা আপনি কাহাকেও জানাবেন না, এমন কি ছেলেরাও যেন না জানিতে পারে।" তিনি আজ তাঁহার তিরোধানের পর ইহা প্রকাশ করিলেন।

তিনি স্বর্গারোহণ করায় কত লোক, যে তাঁহার অভাব অনুভব করিতেছেন তাহা বলিতে পারি না। তিনি ঋষি ও

যোগ-যুক্ত ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র নরেন্দ্র, উপেন্দ্র ও বীরেন্দ্র পিতৃ-গুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ও তাঁহাদের পিতৃভক্তি আদর্শস্থানীয়। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার পুত্রদের দীর্ঘজীবি ও সুখী করুন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী অতীব ভক্তিমতী ও পতিপরায়ণা। শ্রীশ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ এই পবিত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ সংসারের উপর বর্ষিত হউক, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। জয় গুরু!

শ্রীশ্রীগুরুধাম
১৫নং সিমলাইপাড়া লেন,
১লা ফাল্গুন, ১৩৫৩ সাল।
কলিকাতা।

শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়

বর্ণানুক্রমে সূচীপত্র

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	ভ্রম	শুদ্ধ
৬৪	৮	বা	না
১১২	১৬	বাড়ুয্যে	চাটুয্যে
১১৭	১	শ্রীরামপুর	মেদিনীপুর
১৩২	১২	নিস্তব্ধভাবে	ভক্তিভাবে
২১	১৫	ভাগ্যবতী	ভাগবতী
১৩৭	১৩	ঠার	ঠায়
১৩৮	৪	ফুটলে	ফুটলো
১৪৮	৫	সুধারাশি	বাদ হইবে
১৬২	১৩	শিষ্ট	বিশিষ্ট
১৬৫	৫	মঙ্গলে	অমঙ্গলে
১৮০	১১	কাঙ্গাল	বাঙ্গাল
১৮০	১৪	বলে	বান
১৯৩	৩	রাখবে	রাখবো
১৯৪	৭	ভাবিরে	ভাবিয়ে
১৯৪	৮	দেখিরে	দেখিয়ে
১৯৬	১১	দিল	গেল
১৯৯	৫	পোহাল	পোহান
১৯৯	৫	ভাব	ভাব
২০১	১	ডোর	ভোর
২০৮	৬	শিষ্যের	গুরু ভাইয়ের
২০৫	১	রাগটা	রোগটা
২০৭	৫	হ'লে	হয়ে
২৩৮	৬	ভ্রম	ভ্রমন
২৫০	৯	সমুদ্র	নিয়তি
২৫৩	৬	হইতেছে	হইয়াছে
২৫৬	৩	পাঠাইবে	পাইবে
২৮৫	৯	গীতটীর	গীতটী
৩১৪	১	সাধন	সাধনে
৩১৪	২	সময়ে এবং সর্ব্বত্র	বাদ যাবে
৩১৮	২	অধমে	অধমের
৩৪০	২	মে ধয়া	মেধয়া
৩৫৫	৫	নশ্বাস	নিশ্বাস
৩৫৫	১৮	করো	করে